

শিগ্গের প্রসারে আগনার সমৃদ্ধি

শিল্প কারখানা স্থাপন ও
চালু রাখার কাজে
শিল্প ব্যাংকের সাহায্য নিন।



প্রধান অফিস : ঢাকা

শাখা অফিস : চট্টগ্রাম, ধুলনা, বগুড়া, রাজশাহী, সিলেট ও কুমিল্লা

নজরুল স্মারক সংখ্যা।

বজ্রবৎ একাডেমী পত্রিকা

উৎসর্গ-পত্র

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জনাব আবুল কালাম
শামসুদ্দীন গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৮ খনিবার দুপুর ১২টা ৪০
মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন। (ইম্মা লিলাহে... রাজেউন।)

হাসপাতালের রোগ-শয্যা থেকেও, যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল,
একাডেমীর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। যতদূর-কাতর শয্যা
থেকেই তিনি আমাদের বার বার বলেছেন--এই বিশেষ
সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেন হাসপাতালে তাঁকেই
প্রথম কপি পাঠানো হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পত্রিকা
প্রকাশের আগেই তিনি আমাদের চিরতরে ছেড়ে গেলেন। আল্লাহ্
মরহুমকে তাঁর অপার করুণা ও অনন্ত শান্তির হাওয়ায় আশ্রয়
দান করুন।

আমরা আমাদের প্রাণের পরমতম প্রজ্ঞা ও প্রীতির আবেগ সঙ্গে
সঙ্গে নজরুল একাডেমী পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা নজরুলের
শ্রেষ্ঠতম বক্তৃতা এবং নজরুল একাডেমীর প্রাণ-স্বরূপ মরহুম আবুল
কালাম শামসুদ্দীনের পূর্ণ স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি।

তালিম হোসেন

সাধারণ সম্পাদক

১৯ই মার্চ, ১৯৭৮

ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট



পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা পাওয়া এখন খুবই সহজ।

আপনার জন্ত রয়েছে

বিবামুখ্যে সেবা • বিবামুখ্যে পরামর্শ • বিবামুখ্যে

সব ধরনের উন্নয়নমূলক উপকরণ

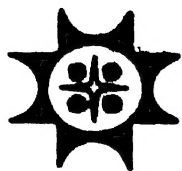
যোগাযোগ করুন :

যে কোন হাসপাতাল • যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র বা ক্লিনিক • সকল মাতৃমঙ্গল
ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র • সকল পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র • ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে কর্মরত
সকল পুরুষ বা মহিলা পরিবার পরিকল্পনার ব্যক্তি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম।

“সুন্মিত্রে গেছে শ্রান্ত হৃদয় আমার গানের বুজবুজি...”

বিস্মোহী কবির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে
কবির বিদেশী আশ্রয় প্রতি আমাদের
সম্পদ সালাম



সোনালী ব্যাংক

সেবাই আমাদের লক্ষ্য

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য
ক্রমাগত আমাদের নিজেদের
জাগিয়ে যাওয়া

সে বক্ষ্যে
সফল হোক
বজ্রবল প্রকাণ্ডের
কর্ম প্রচেষ্টা

পূবালী ব্যাংক

আগবার বিহীন বন্ধ

সভাকল এ প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা/সভাকল সুবিশিষ্ট সংস্থা

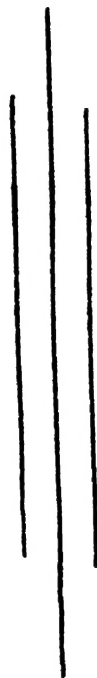
মহাকাব নজরুল ইসলামের

গবেষণায়

আত্মনিবেদিত

নজরুল একাডেমীকে

আমাদের মোবারকবাদ



বাংলাদেশ ষ্টিল ওয়াক'স লিমিটেড

নজরুল একাডেমী পত্রিকা 'নজরুল স্মারক সংখ্যা



বাংলাদেশ শিক্ষা ঋণ সংস্থা

দেশের শিক্ষায়নে নিয়োজিত

বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে

অল্পোন্নত এলাকায়

সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়

প্রধান অফিস: অগ্রণী ব্যাংক বিন্ডিং (১ম তলা)

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

শাখা অফিস:

১। ৩২, আশ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,
চট্টগ্রাম।

২। কে. ডি. এ. বিন্ডিং
আপার বনোর রোড, খুলনা।

৩। বি-৪৯০, খোবশাহ রোড,
মক্কাপুর, রাজশাহী।

৪। রোড-কুটির, দরপা মহল্লা,
সিলেট।

মহত্বপূর্ণ একাডেমী পত্রিকা/মহত্বপূর্ণ স্টাফ সংবাদ

“সাকল্যের এক বৎসর”

১৯৭৬-৭৭ সালে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয় কর্পোরেশনের পরিচালিত কারখানা সমূহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

সার, কাগজ, নিউজপ্রি-৫, রেয়ন সুতা, কৃত্তিক সোতা, সাবান, বাটারী, গুটো সাবান রবার ও প্লাস্টিকের জুতা, বেলটিং, টায়ার টিউব, দিয়ালজাইট, উষ্ম, চিনামাটির বাসন পত্র, ডিডিটি সংস্থার তৈরী সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৬-৭৭ সালে সংস্থার পরিচালিত কারখানা সমূহে ১৮৫ কোটি টাকার পণ্যপ্রযা উৎপাদিত হয় এবং ৩৫ কোটি টাকার পণ্যপ্রযা বিদেশে রফতানীর ব্যবস্থা করা হয়।

সংস্থা এই বৎসর ১৫ কোটি টাকার বেশী লাভ করে।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয় কর্পোরেশন

দেশের সেবার নিয়োজিত।

বি. সি. আই. সি ১০-১০০

মজরুল একাডেমীর সাপ্তাহিক প্রকাশনা

প্রখ্যাত কবি-সমালোচক

আবদুল হান্নান সৈয়দের

মজরুল ইসলাম : কবি/কবিতা

স্বাধীনতার অভিন্নবাহে, বিশ্লেষণের চমৎকারিত্ব, ভাবনার গভীরতায় এবং গ্রন্থ পরিকল্পনার নিপুণতায় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এটি লেখকের একটি অমর অবদান।

হার্ডকোভে কলিসম্পন্ন বীধাই, খ্যাতিমান শিল্পী অঙ্কিত চিত্রাকর্ষক প্রচ্ছদ, বক্তব্যকে মনোতে মুগ্ধিত করার শ' পৃষ্ঠার বৃহৎ কলেবর এই গ্রন্থের মূল্য : ২৫.০০ টাকা।

গণ কক্সন—

ক্রয় : ২৫ ৩৫ ৫৫
৪০ ১৬ ৬৬

কর্মীধ্যক : মজরুল একাডেমী
বেলাজাবাদ কলোনী, মসবাতার, ঢাকা।

বজ্রকল একাডেমী পত্রিকা

বি-বাসিক পত্রিকা ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ : বজ্রকল স্থাপক সংখ্যা : ১৩৮৪

সূচীপত্র

চিত্রে বজ্রকল : এ্যালবাথ

প্রবন্ধ

জাতীয় কাব্য ও কবি বজ্রকল	১	সাদেক আলী
স্বাধীনতা-কাল বজ্রকল	৩১	শাহাবুদ্দীন আহমদ
বুদ্ধ-কল্পে ঐতিহাসিক পটভূমি	৫১	এস. এন. লুৎফর রহমান
স্মৃতি-সত্য আলোকে ডি. এ. এলিফট	৬১	শিকিফর রহমান
বিশ্ব সাহিত্যে বজ্রকল উপলব্ধি	৯৩	মোহাম্মদ মোহাম্মদ আলফর
বজ্রকল-সাহিত্য সমালোচনার ধারা	১০০	শিকিফর রহমান

শ্রুতিকথা

'কলিকার' ও 'বনগীতি'	১১০	মাজেদুর রহমান খান
---------------------	-----	-------------------

সংকলন

অনুশাসক বজ্রকল	১২৪	আবদুল কালাম
আলান কবি	১৩৫	উজ্জ্বল নাথনুল হাফিজ

আলোচনা

বজ্রকলের 'বিশোধী' প্রসঙ্গে	১৩৮	মোহাম্মদ মাহমুদউল্লাহ
----------------------------	-----	-----------------------

সাহিত্যিক আলোচনা

লক্ষ্মী হুনে 'ডাউ' হুনে	১৪৯	কাজী বজ্রকল উপলব্ধি
-------------------------	-----	---------------------

অন্যান্য

সুফায়ে বহিনে চিরদিন	১৫১	কবির হাফিজ
বাজে বুল্ল বীণা বাজে বুল্ল	১৫৫	এ. এলিফট. সাইফুর রহমান
বঙ্গভাষায় পাশে আবার	১৫৬	সুহাইল বসিল

এক পরিচিতি

মজলুল জীবনী ১৬০	আবুল কালাম শামসুদ্দীন
শিশু-বর্ষসের স্বচ্ছ বর্ষণে ১৬৯	আবদুল কাদির
মজলুলের রেজারেকশান ১৮২	শাহাবুদ্দীন আহমদ
সংকলনে মজলুল ইসলাম ১৯৮	মোহাম্মদ কাসেম

শেষ জামান

বাংলাদেশে মজলুল ২০৩	আবদুল মুকীত চৌধুরী
একাডেমী সংবাদ ২১৬	তালিম হোসেন

প্রচ্ছদ : হাশেম বীন

সম্পাদক

শাহাবুদ্দীন আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
আবদুল কাদির
লুৎফর রহমান সরকার
ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মোহাম্মদ মাহকুম উল্লাহ
ডক্টর রফিকুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক

তালিম হোসেন

অতীত দিনের স্মৃতি



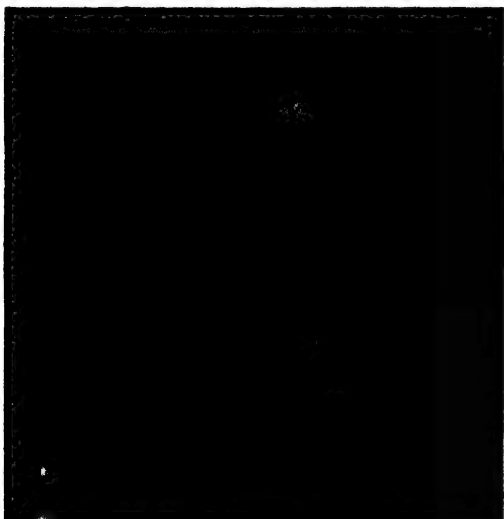
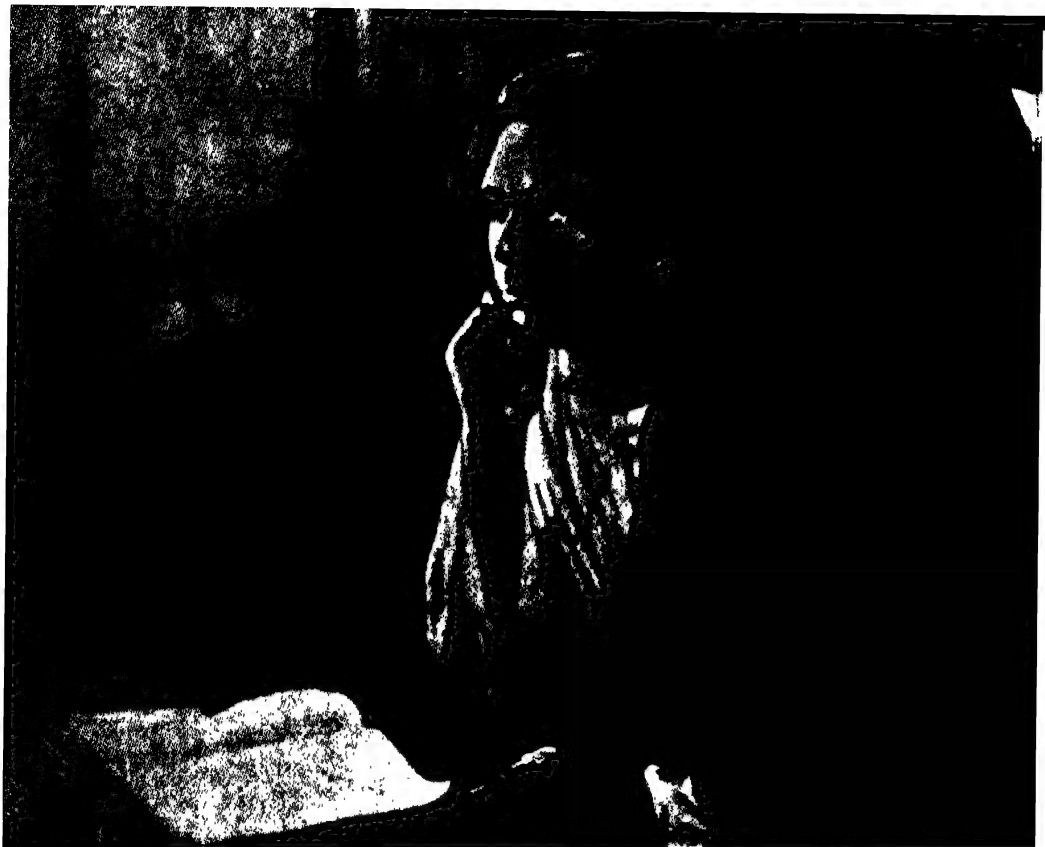
ওল ফাল্গুনঃ শুল্কশুলি আমি রতীম প্রেমের ঘাই নকল।
অনুরাগের লাল পরাব ঘোর চোখে বলে জলজল।

আজ যদি ধরিতীর খেতালে চঠাও তকিয়ে যায় নায়েথার
জলপ্রপাত, কোন ফটোগ্রাফারের ছবি থেকে আর বোঝানো
যাবে না, সেট প্রচণ্ড প্রবাহের জীবন্ত পতিবেশ কি
বিস্ময়কর ছিল।

আজ বাংলাদেশের চোলের সামনে আমাদের কবি বলে জানি,
পায়ক বলে জানি, সুবকার বলে জানি, তাঁদের জীবনের
পতি ও ধারা থেকে বোঝা যাবে না, কবি নজরুল ইসলাম
কি ছিল?

প্রচণ্ড বন্যার মত, লেলিহান অগ্নিশিখার মত, পরাধীন
জাতির তিমির ঘন অন্ধকারে, তাঁতির ভাষাবিধাতা
নজরুলকে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ভাঁটে পড়ে পাঠিয়েছিলেন।

নৃপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য



উপরের ছবিটি কবির পঞ্চম পান রচনাকালের।
কবির বয়স বর্ষন ২৬।

যদি শিকের ছবিটি কৃষ্ণপদ থেকে কদম্বাভার প্রভা-
বর্তনের পরবর্তীকালের—কবির বয়স বর্ষন ৩২।

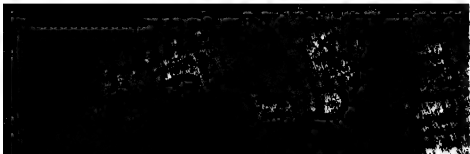
আজকাল পড়েন কবির কবিতা
যেখানে কবির মন টুটে যায়,
সে দান জনে স্নেহ-সিঁদুরের
কবির অঁকি হলেবদন ॥

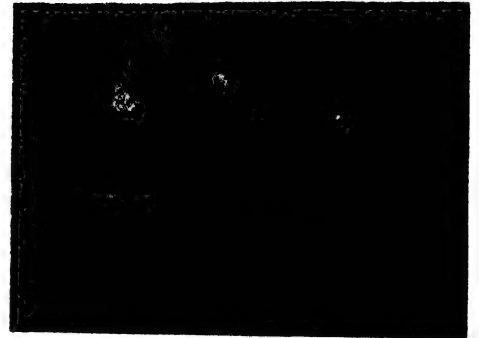
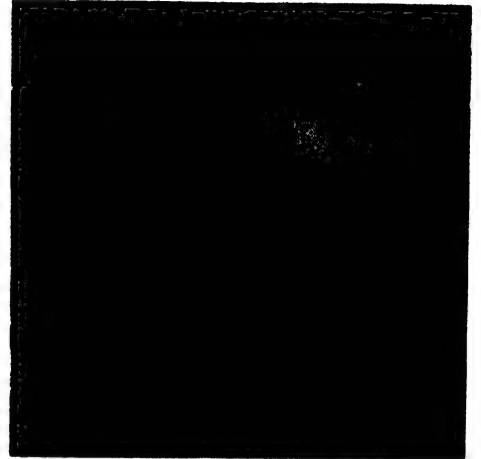
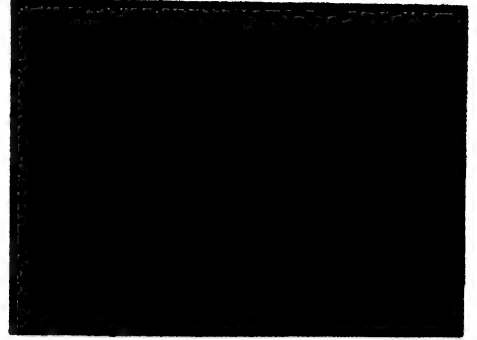




উপরের বাম দিকের ছবিটি কবির ২৫ বছর বয়সের। যে কায়ানটির পায়ে কবি হেলান দিয়ে বাঁকিয়ে আছেন সেটি ঝাঁকুড়ার অবাধত বিকুপুৰের মলবাসী কানান।
উপরের ডান দিকের ছবিটি সৈনিকের পোশাক পরিহিত ২১ বছরের নজরুলসেব। ৪৯ নং বাঙালী পল্টন ভেঙে বেঙমার পথ কবি তখন করাচী থেকে কলকাতার দ্বা প্রত্যাবর্তন করেছেন। মর ১৩২৭ সালের চৈত্র মাস।
বাঁ দিকের ছবিটি পছল ঘটনার পূর্বে বাসিমগ্ন নজরুলসেব। কবি তখন বাস করছিলেন কুড়নগরে।
ডান দিকের পুটার বাম দিকের ছবিগুলি কবির চট্টগ্রাম সময়ের কয়েক দিনের স্মৃতি। কবিকে বেকা মার কখনও নরবেশের হত কখনোই আবার কখনও আরবীবেশ হত নিরস্ত্রাপ পরিহিত। ডান দিকের উপরের ছবিটি কবির উত্তর বৌবনের। বাঁচের ছবিটি বৌবনের গোবুদি-মাপুর।

জান নিরস্ত্রাপ মেলান হাতের ডানী মকী পড়ে হুনে
জানার মনে মিঠা পানির জলর কমে নকত-নুনে।
কুতী ওঠে জানার কবি মনে জলর উত-জলর।





বাম দিকের ছবিটি ভিশ্যাক কবি লক্ষ্যকরে। কবি ভবেন দিয়ারসোন হাক হাই কুনের দ্বারা।
 ডান দিকের উপরের ছবিটি সেই লক্ষ্যকরে, শিও লক্ষ্যকরে বেখানে কবিদের কল্পিতেন। এখানে থেকে কবি
 মিত্র প্রাথমিক পাশ করেন। মাঝবামের ছবিটি চুক্তিয়ার দ্বারা কবিদের দ্বারা। এটি হস্ত কবি-কীর্তনের
 আধ্যাত্মিক চেতনার উপর দ্বিত। দীর্ঘের ছবিটি পৌরসুদ্ব, পুস্তকপাঠের সময়করে। প্রবীণের লক্ষ্যকরে এইখানে।



এ আলোক চিত্রটিও কবির যৌবনের গৌরব-আগেণুয়। ১৯৪০ সালে কবি যখন মাত্র ৪২ তম বিদ্যাও আলোক চিত্রশিল্পী পরিষদ পোখারী এটি ক্যামেরায় ধরে রাখেন।

উপরে কবিৰ
 জীবনগতিনী
 আশালতা সেনগুপ্তা
 ওৱকে প্ৰবীণা ।
 গীচে ৩২ নং কলেজ স্কুলীচেন
 সেই বিখ্যাত বাকী, 'বতীৰ
 মুসলমান সাহিত্য নথি'ৰ
 অফিস ছিল বাৰ হোতালিৰ ।
 এৰ ডান দিক্ৰে ছাৰাযৰ
 কক্ষটিতে ১৩২৭ দালৈৰ চৈত্র
 মাসে কোজ খেকে কিয়ে কবি
 মুক্তকৰ আৱনতেন সকে
 বাস কৰন্তেন ।





জন্মী থেকে কখনওবে এসেব কবি শ্রী প্রবীণা ও পাণ্ডুরী গিরিবালা দেখীতে সিয়ে। সেখানে জন্মগ্রহণ কলন
পুত্র বুলবুল। জন্মিতে নজরুলের বন্ধনপুত্র বিভূ বুলবুল। যামে উপভিত্তি গিরিবালা দেখী জামে উপভিত্তি প্রবীণা।
যামে বজ্রবালা বুলবুলের পরিচর্যাকারিনী সেবিকা। পঞ্চায়েত পুত্র কবির কখনওবেব বানদার 'হেস কটেক'।

ସୋମ-ବନ୍ଧ

ମଞ୍ଜୁ - ବନ୍ଧ

କେ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ନାମେ ଏକ କାନ୍ଦ ।
 କେ କାନ୍ଦେ ତା ଶୁଣି ବୁଝି ଶାନ୍ତ ॥
 କେ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ମିଶ୍ର-ନାମ ।
 କେ ଓହ୍ଲାଇ ଶାନ୍ତ ମହା ନାମ କାନ୍ଦ ॥
 ଅଛି ମୁଁ ମହା କେ କ୍ଷମା ନାମ ।
 ଧରି ମୁଁ କାନ୍ଦେ ନାମେ ବୁଝି କାନ୍ଦ ॥
 ଓକିଲ ମୁଁ ମହା ନାମେ ମେ ମହାମାତ୍ର ।
 କାନ୍ଦେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ମେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ॥
 କି, ତାହା କେ କାନ୍ଦେ ଅଛି ବୁଝି କାନ୍ଦ ।
 କିନ୍ତୁ ମେ ମହା ବିକିଲ ବୁଝି କାନ୍ଦ ॥

ଏକାକି କାନ୍ଦେ ଆମିଲ କେ ମେ କାନ୍ଦ ।
 କେ ମୁଁ ମହା କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ॥
 କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ କେ ମୁଁ ମହା-କାନ୍ଦ ।
 ଏକାକି କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ॥

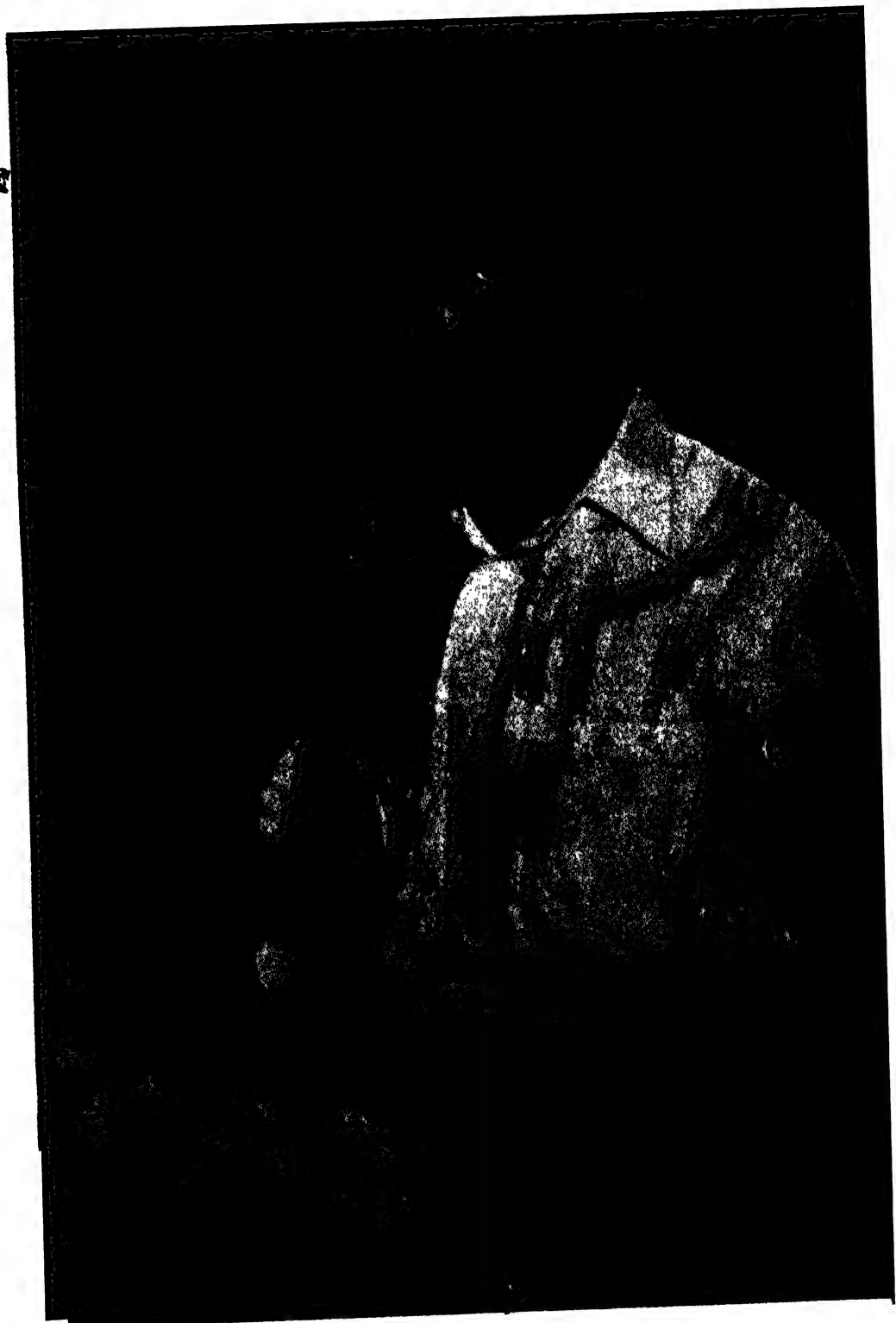
କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ।
 ଏକାକି କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ।
 କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ।
 ଏକାକି କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ।
 କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ।
 ଏକାକି କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦ ॥

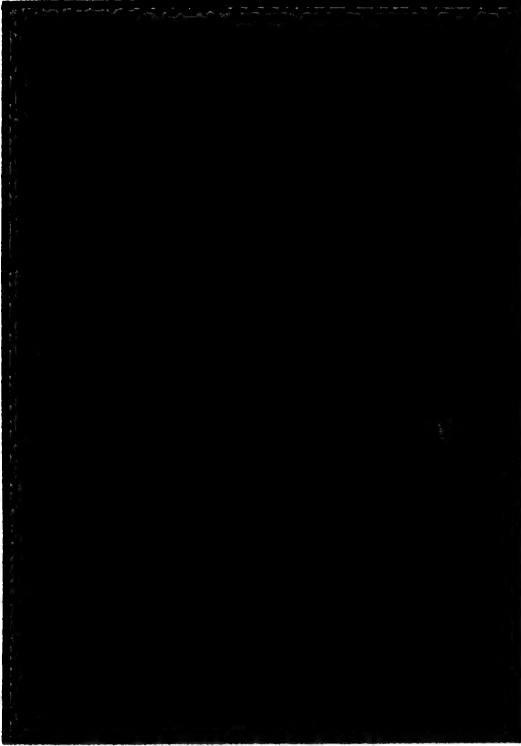
କାନ୍ଦେ
 ୨୫.୨୨୫

କାନ୍ଦେ
 ୨୫.୨୨୫

କବି-ବନ୍ଧିତ ମୁଁ କି କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ । କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ।







১৯১৯ সালের জুলাই মাসে
কল ইতিহাসে যেতিয়া
পরিচালক হুসীদ হায়েব
হনগ্রামে যেতিয়া বাসভবনে
কবি এ ছবিটি তোলা হয়।
চাকার তোলা কবির এটি
শেষ ছবি। যাব দিক থেকে
জনাব জামান, টি. এইচ
চৌধুরী (মাকখানে) ও ডি.
পণ্ডিত।



নীচের ছবিতে বামদিকে
উপরিষ্ট অধ্যাপক হুমত
সরকার, ডানদিকে নজরুল।
মাকখানে গুজরান হাবিবুল্লাহ
বাহার।

কবি অহম্মদ হায়েব পড়েন ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে।
১৯৪৩ সালে কবিকে ইউরোপে পাঠান হয়। ভারতের
পূর্বাংশে ছবিটি কবির লণ্ডন অবস্থান কালে জুন মাসে
সালে অকসেসে তোলা।





সঙ্গে কাব একা থাকি। শ্রী প্রবীণাও সঙ্গে নিয়েছিলেন। কবির দু'খা খাওয়া প্রবীণার নিম্নলিখিত পাকাভাঙের হয়। কবি সাধারণত চিকিৎসা করেন কিন্তু কোন কল হয়নি। অল্প কবি রুগী শ্রীর শিরে এমনি ক'রে ব'সে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়েছেন। উপরের ছবিটি করুণ সেই মৃত্যুর আলোক চিত্র।

বীচে : বামে কবির ৩য় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং ডানে কবির পুত্র কাজী অনিচ্ছ ইসলাম।







'নিহের জন্য নিহের' বিপুলী সাহিত্যিকতা নজরুল-সাহিত্যকে অবহেলায় দৃষ্টি হারভেন। নজরুল বিস্মৃত হ'য়ে পড়েন পশ্চিম বঙ্গে। ১৯৬২-র চীন ভারতের যুদ্ধের সময় প্রচোজন হ'ল নজরুলের। অল্প নজরুলকে হবীত্র-সমনে এনে শ্রুজর্পিত করা হ'ল। উপরেই বাসের ছবিটি সেই অবিস্মরণীয় সময়ের। জানে যোগ-নবায় প্রবীণ।

বাসের ছবিটি কলিকাতাভূমিসার। ১৯২৮ সালে কবি বরন চাকার আসের ভবন এই বিপুলী বহিষ্যার সংবে কবির পরিচয় হয়। এ'র বিলাত ফাত্রা উপরকে কবি রচনা করেন "জাতিমে পাকম কি যো সাত ভাই চন্দা জায়ে" সাক্ষর কায়।





ঢাকায় বঙ্গবন্ধু

১৯৩৯ সালে মুখ্য বাঙালানীম শেখরাবের মত ঢাকার এনেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। পাকিস্তানের পূর্বাংশ পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী প্রিয় ভবিকে ঢাকার শেখার উজ্জ্বল পোষণ ভবনেও সে পৌঁছানো ভাবের হয়নি। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হ'লে ভবির বাংলাদেশে আসার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৭২-এর ১০ই মে বাংলাদেশ সরকার ভবিকে ঢাকার নিরে এনেল। উপরের ভবিতে ভবির ঢাকা আগমন উপলক্ষে বিমান বন্দরে সর্বশ্রদ্ধা জাপনের জন্য বিশাল জনসমাগমের স্রা। ভান পানের চব্বিটিও ঐ সময়ের।







ভূতপুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰ
মুজিবৰ বহুমান কবিৰ মান-
মৰীচ বাসভবনে কবিকে
কেৰেতে মান। ভূমিটি বে-
গমৰেব।



কবিৰ জন্মদিনেৰ এককি মান-
শিত বৃহত। তান নিকেৰ
ভূমিতে কবিৰ নই পুত্ৰবৰ
উমা কাৰী ও কল্যাণী
কাৰীকে তেবা হাঙে।



উপরের ছবিতে নিউপলে রাজান হচ্ছে লাস্টপোস্টের
কল্প ছবি।

নীচে ইস্ট বেঙ্গল বেজিয়েন্টস এক পুষ্টিম সৈনিক শ্রুতির
নির্দেশন বহুপল অবনতিত করছেন 'বেজিয়েন্টস কালার',
প্রদর্শন করছেন পার্স অব অনার।



পরিচয়না, সম্পাদনা ও চিত্র-পরিচিতি : পাহাবুতীন আহমদ
অবনতি : হাশেম খান

আমোক্তচিত্রশিল্পী :
মহম্মদ হানিফুল্লাহ, খানসার, শ্রীপতিবল গোহাটী, মোহাম্মদ
মাক্কা, কামালজাহান, মানির আলী খান (মামুন) এবং
অন্যান্য।

কবিতা ছবি সৈনিক সংবাদ, বৈদিক বাংলা ও বাংলা
একাত্তরীর এবং কবির পঞ্চম খান দুটির চিত্রশিল্প
অন্য সাহিত্যিক রচনায় পানের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



বঙ্গবন্ধু প্রকাশিত পত্রিকা

বিমাসিক পত্রিকা : ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম সংখ্যা : গ্রীষ্ম-বর্ষ : ১৩৮৪

জাতীয় কাব্য ও কবি বঙ্গভূমি সাংস্কৃতিক আলোচনা

[এক]

জাতীয় ভাষা বা বাঙালিদের লিখিত হলেনই জাতির সাহিত্য হয় না। অথবা একটা ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে একই ভাষার লিখিত মানা যখন গ্রন্থের সংগ্রহই কোন জাতির জাতীয় সাহিত্য নয়। যে সাহিত্যের মধ্যে জাতির মন এবং চরিত্র বুগে বুগে তর-উদ্‌ঘাটিত হয়, তাকেই জাতীয় সাহিত্য খসা যায়। সুগভীর এবং সুগভীর পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশমান অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ এই সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যেক বুগের জাতীয় মানস এবং চরিত্রের উন্মোচন ঘটে—তা যতই বিভিন্ন ও বিভিন্ন হোক না কেন। অর্থাৎ, কোন জাতির বিশেষ বুগের বুগ-প্রতিনিধি সাহিত্যিকদের মানস-জগৎ যত বিভিন্ন হোক, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে একই জাতীয়তাবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাঁদের মধ্যে এমন একটা সামান্য সৌন্দর্য্য থাকে, যা তাঁদের মননে এবং চিত্তনে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য রক্ষা করে। কেননা, তাঁদের প্রাণকর্ষ বা প্রাণবৈশিষ্ট্য একটা অবিস্মৃত উৎসকে থেকে উপজাত। এই জাতীয়তাবৈশিষ্ট্য তাঁদের বুগ-মানস সাহিত্যিকদের মধ্যেও জাতি সত্তার প্রতিফলন ঘটায় এবং জাতির মন ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে। এমনভাবে বুগে বুগে জাতীয় সাহিত্যে জাতি সত্তার স্পষ্টায়ণ বাবা ক্রমবিস্তৃত হয় এবং এই স্পষ্টায়ণ বীর সাহিত্যিকের যত বেশি, সেই সাহিত্যিকের তত বেশি 'জাতীয়'।

জাতির প্রাণবৈশিষ্ট্য নিয়েই আমরা প্রত্যেকটা জাতিকে চিনতে পারি। আর, এই চেনার কাজ কোন জাতির জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। আমরা যখন গ্রীক সাহিত্য,

ইংরেজী সাহিত্য অথবা কলাসী সাহিত্যের কথা বলি, তখন গ্রীক, ইংরেজ বা কলাসী জাতির বন ও চরিত্র, প্রতিভা ও প্রাণ, জীবন ও জীবনধারণের কথাই বলি। একটা জাতিকে সম্পূর্ণভাবে চেনা তার ইতিহাস দিয়ে হয় না। কেমনা ইতিহাসে থাকে তার বাহ্যিকের স্রোত, তার বহির্জীবনের ধরন-ধারণ এবং তার ব্যক্তির কৃতকর্মতা বা ব্যর্থতার কাহিনী। কিন্তু তার মানসিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য, অন্তর্জীবনের রহস্য, ভাবাবেগ-পট্টি পঙ্ক্তি এবং বুদ্ধি বা আত্মিক জীবনের কথা তার সাহিত্যের মধ্যে থেকেই জানতে হয়। অন্য জাতির থেকে কোন একটা জাতির জীবনমূর্তির পার্থক্য ধরা পড়ে তাদের সাহিত্যের তুলনামূলক অনুশীলনে। এসবই, অর্থাৎ একটা জাতির জাতীয় সাহিত্যে আমরা বিশেষ যা-কিছু পাই, তা তার প্রাণ ধর্ম বা প্রাণ-বৈশিষ্ট্যের জন্যই পাই।

বাঙালী-প্রাণেরও নিচর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা নিঃসন্দেহে বাঙালীকে অন্য জাতির থেকে আলাদা করেছে এবং তার প্রাণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে যদি আমরা তাকে সঠিকভাবে চিনতে চাই, তবে তার জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই তা করতে হবে। তার জীবনবোধ নিচরই অন্য জাতির জীবন-বোধের থেকে কিছু না কিছু পৃথক এবং তার অবশ্যই একটা ভিন্ন জাতিসত্তা আছে। বাঙালীর এই জীবনবোধ এবং জাতিসত্তা যুগে যুগে তার জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে বিস্তৃত, বার এক অভিনব প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে।

ইংরেজ আমলে বাঙালী নতুন করে তার জাতিসত্তা লাভের সাধনা শুরু করেছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি তার মনে এই বাসনার উদ্রেক করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকেই এর সূত্রপাত হয়। কর্মে এবং চিন্তায় এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রারম্ভে গাড়ার দিক থেকে। সাহিত্যে, শিল্পে, রাজনীতিতে, সমাজকর্মে, ধর্মানুশীলনে এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চায় বাঙালীর নিজস্ব সত্তার উদ্বোধন, প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা ক্রমবর্ধমান তীব্রতা লাভ করেছিল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৎকালীন বাঙালী বনীবীড়ের নানা অবদান এর জঙ্ঘলামান স্বাক্ষর। বাঙালী-সত্তার প্রতিষ্ঠা-পর্বের শেষ পর্বারে কবি নজরুলের প্রাণে এই সত্তাবোধ স্বতীগ্রু উন্মাদনার স্বাক্ষর হতে থাকে। যে বোধ স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, নবসুধন, মশাররফ হোসেন, গিরীশ বোষ, ইসরাইল হোসেন, পরশুচন্দ্র, বিজ্ঞানলাল, কারকোবাদ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক যুগ-প্রতিনিধি সাহিত্যিক বনীবীড়ের মধ্যে, তারই চরম এবং চূড়ান্ত অনুরণন পোনা গিরিজিল নজরুলের অশূর কাব্যস্বাক্ষরে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন বাঙালী এবং ভারতীয় সকল দেশকবী, সমাজসেবী, চিন্তানরক এবং জ্ঞান-তপস্বীর বাসনা নজরুলের সুরে মূর্ত হয়। দেশ এবং জাতিকে নিয়ে বাঙালী, তথা ভারতীয়ের যুগ নজরুল কাব্যে যথার্থ বাণীবৃত্তি লাভ করে। যুগবাসনা, যুগমানস এবং যুগচরিত্রের কাব্যিক রূপায়ণ একমাত্র নজরুল ইসলামের রচনাতেই পূর্ণতা নিয়ে কুটে ওঠে। এসব কারণে নজরুল কাব্যে যথার্থ জাতীয় কাব্য হিসাবে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

ব্যক্তিগত পক্ষে, সাহিত্য হচ্ছে যুগের কর্ম এবং ভাবধারণ বহুবুধী প্রকাশের একটা দিকবর্তী। এ সম্পর্কে হাডুসনের একটা কথা প্রমিধানযোগ্য:

Literature is only one of the many channels in which the energy of an age discharges itself; in its political movements, religious thought, philosophical

speculation, art, we have the same energy overflowing into other forms of expression.

জাই সাহিত্য যুগের ডাবকা। এবং অনুভূতির স্পর্শে সজীবিত, বাস্তবায়িত এবং জীবনমানুগ হয়ে ওঠে। জাতীয় সাহিত্যের যেমন একটি জাতিগত চারিত্র্য থাকে, তেমনই থাকে যুগচারিত্র্য—সেকথা প্রবন্ধের প্রস্তাবনাতে বলেছি। যুগজীবনের বহিঃপ্রকাশ মানা কিছুই নয়। নিজেই ঘটে, আর তাঁর প্রতিফলন হয় জাতীয় সাহিত্যে। কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁর যুগ এবং জাতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না—তাঁর ভাবচিন্তা বড়ই বহুবর্ণী বা সর্বত্রগামী হোক না কেন। গোটের বস্তু অনুসারে প্রতিটি মানুষ তাঁর দেশের শুধু নয়, তাঁর যুগেরও নাগরিক। সুতরাং প্রতিভাবান লেখকদের প্রকাশভঙ্গী যার যা-ই হোক, সবকালের প্রবান ভাবস্রোত বা জাতির স্বভাবস্বকর্তৃ জীবন বাসনা তাঁদের রচনার মধ্যে প্রবাহিত হতে বাধ্য। এইভাবেই তাঁদের সাহিত্য জাতির জীবন-সম্পদনের সঙ্গে স্পন্দিত হয়ে, তাঁর জাতীয় সঙ্গে যুক্ত হয়ে সজীব, সত্য ও চিরন্তন জাতীয় সাহিত্যের শ্রেণী ভুক্ত হয়। এই কারণে কোন সাহিত্যিককে যুগের সাহিত্যিক বলে নিশ্চয় করা সাহিত্য সম্পর্কে যুগতাই পরিচায়ক। এতে করে তথাকথিত চিরন্তনবাদী বা কলা-কৈবল্যবাদীদের বাস্তবানুগ অহমিকাই শুধু চরিতার্থ হয়, আর কিছু নয়।

জাতীয় সভ্যবোধের পরিপূর্ণ এবং সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল নজরুল কাব্যে। তাঁর এই বোধ এমন একটি বস্তু, যা জাতীয় জীবনের সার্বিক ধ্যান-ধারণা থেকে উদ্ভূত—শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, কিংবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক এর একমাত্র প্রকাশক নয়। তাই নজরুল কাব্যে বাঙালী জাতির একটি সর্বাঙ্গীন শাশ্বত বৃত্তি রচিত হয়েছে দেখা যায়। বাঙালীর চরিত্র, হৃদয়, মন এবং মনীষার এমন একটি সমন্বিত রূপ তাঁর কাব্যে কুটে উঠেছে, যাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক রূপের ফলস্রুতি বলা সম্ভব নয়। তৎকালীন কোন বাঙালী সাহিত্যিকের রচনার জাতির এমন চিরন্তন মানস-বৃত্তি আরো দেখতে পাই না। তাই নজরুল-রচনাসমগ্রকে কেউ যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেরণা-সম্মুত একটি অস্থায়ী সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করেন, তবে তিনি নিজের সাহিত্যিক দৃষ্টিহীনতাকে আবৃত করতে পারবেন না। নজরুলের মানসলোকে বাঙালীর যে দীপ্ত আলোবা চিত্রিত ছিল, তারই এক রূপকান্ত বহিবর রূপ অংকনের লক্ষ্যে দিকে তাঁর সাহিত্য সংকেন্দ্রিত। নজরুল-কাব্যে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, আত্মবিশ্বাস, আত্মত্যাগ, উন্মাদনা, তেজ, বীর্য, প্রেম, উপারত্ন ইত্যাদি তাঁর মানসমুখ শাশ্বত বাঙালীর উজ্জ্বল ও বিচিত্রবর্ণ অঙ্গসজ্জা। এই অঙ্গসজ্জা নিয়ে, নজরুল-কাব্যে চিরন্তন বাঙালীর রূপকল্পনা যে শ্রীক ও শাবিত পৌরুষ-বৃত্তিতে দেখা দিয়েছে, তাতে অবশ্য দেশকাল-নিরপেক্ষ একটি সর্বজনীনতার রঙ আছে। এই রঙ সহজেই বিরাড়ি আঁপাতে পারে—বলে হতে পারে, এই রঙ বিশেষ থেকে আঁসানী, এই মানুষ বৃত্তি ‘কেন্ বিবেচী নাইরা’ কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই মানুষের গারে কোন বিবেচী সাজ নেই, এর বর্ণ কাঁসার পায়-শক্তিপত দ্বিত্বকান্ত বর্ণ, এর শালগ্রাম পেনীগুলি আর অলমাসু-স্পর্শে সজীব-স্বতান। তাঁর সর্বজনীন রূপের মধ্যেও এগুলি দৃষ্টি এড়ায় না। এটাই বাঙালীর চিরন্তন রূপ—এই রূপেই সে বিশ্বমোহন, বিশ্বজনীন।

কিন্তু নজরুল-কাব্যে এই বাঙালীর কান্দা এবং বরষীর মানস-বৃত্তি রচিত হলেও তাঁর মানস-চেতন বা চরিত্ররূপের কোন একটি বিকরাৎ এতে প্রাধান্য পায় নি—সামগ্রিকভাবেই জা পূর্ণ

রূপায়ণ লাভ করেছে। তাঁর মন, অর্থাৎ তাঁর ধ্যান-ধারণা, কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ ও চিন্তা যেমন নিরংকুশভাবে কুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর চরিত্র সকল পূর্বলজ-কলি-বক্ষমজ সহ-কারেই রূপায়িত হয়েছে। এবং এভাবেই বাঙালী তাঁর স্ব-স্বরূপে পূর্ণায়ত ও পূর্ণায় বৃত্তি লাভ করেছে—যার মধ্যে তাঁর চিরন্তন মানস বৃত্তিই সবচেয়ে দৃষ্টব্য। বাঙালীর মন এবং চরিত্রের যথার্থ প্রতিবিম্বনে নজরুল কাব্যে জাই বাঁটি জাতীর কাব্যের স্বর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি। প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা স্মরণীয়। তৎকালে স্বাধীনতা-কামনার একটি বোঙ্গসুত্রে তিনি বহুজাতিক ভারতের নানা জাতি, প্রবণতা, সংস্কার, আচার ও অভ্যাসের একটি সংহত বহুবর্ণ জাতীর বৃত্তি অংকন করতে পারেন নি। তাই তাঁর চিন্তার এই ভারতীয় জাতির যে বৃহত্তর পশ্চাৎগত প্রসারিত হয়েছিল, তাঁর ওপরেই তিনি বাঙালীর চিরন্তন রূপচিত্রটি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অথও ভারতীয় জাতীয়তার ময় খণ্ডিত বাঙালী জাতীয়তাই অনু নিয়েছে। তাঁর বীণার স্বংকার, বাঁপীর সুর ছিল সমস্ত ভারতবাসীর জন্য, কিন্তু তা শুধুতে পেরেছে শুধু বাঙালী। তাঁর ওংকার, তাঁর কাশ্যাস্বনি নদ-নদী-অরণ্য-পরিবৃত্ত বিশাল ভারতের বুসর কাছারে প্রতিধ্বত হয়ে এই বাংলারই সবুজ কুটীরে প্রতিধ্বনির বহনিনাদ জাগিয়ে তুলেছে। বাঙালী তাঁর নিজের কণ্ঠে নিজের সুর শুনে, নিজের চোখে নিজের রূপ দেখে উচ্চকিত, উবেল, উন্মত্ত হয়েছে। এইভাবেই নজরুল-কাব্য বাঙালীর আত্ম-সুকুর, আত্ম-স্বর্ধন হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাঙালীর এই নিজস্ব সভাবোধ, শাস্তৃত বাংলা এবং চিরন্তন বাঙালীর রূপ-কল্পনা—এসবের প্রেরণা নজরুল পেরেছিলেন সমসাময়িক যুগ-প্রতিনিধিদের নিকট থেকে। অবশ্য পাশ্চাত্য জীবনচেতনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি, জা মর। তবনকার যুগচিন্তার পাশ্চাত্য অনুপ্রাণনা অবশ্যই বিশেষভাবে গণ্য। এই যুগচিন্তার যে যুগচরিত্র তখন গড়ে উঠেছিল, তা-ই সেকালের সকল মনীষীকে এক গোষ্ঠিতুল্য করেছিল—তাদের সকল মত ও পথের পার্থক্যকে অতিক্রম করে একই বাসনা বা লক্ষ্যের ঐক্যে তাঁরা বিভূত; অর্থাৎ কবি শেলীর কথার বলা যার যে, তাঁদের ছিল, "a general resemblance under which their specific distinctions are arranged." কিন্তু তাদের সবাইকে অতিক্রম করে নজরুল তাঁর মতনায় বাঙালীকে স্ব-সত্যের সর্বাঙ্গিক উজ্জ্বল ও পূর্ণায় বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একারণে নজরুল-কাব্যকে বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য বলে আখ্যায়িত করতে হবে।

জাতীর সাহিত্যে বা কাব্যে একটা জাতির যুগযুগ-পঠিত চারিত্রাধারা উন্মোচিত হয়। তবু তাই মর, একটা বিশেষ যুগের পরিবর্তিত জাতীর প্রাণ-বৈশিষ্ট্যও এতে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। এজন্য জাতীর কাব্য বা সাহিত্য দিয়েই আমরা কোন জাতির চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য এবং গৌরবকে উপলব্ধি করি। মানবজাতির আর্থিক এবং মানসিক অবদানের জাতিতে কোন বিশেষ জাতির কতখানি অবদান রয়েছে, তা জাতির জাতীয় সাহিত্যই দেখিয়ে দেয়। জাতীয় সাহিত্য জাতির মানস সুকুর এবং জাতির প্রাণপ্রবীণের উজ্জ্বলতম শিখা। এটা সম্পূর্ণ ঐকমিক বস্তু এবং জাতির সভাকার স্বকীর সম্পদ। অন্য কোন জাতির নিকট থেকে এগ নিয়ে অথবা তাঁর প্রাণবহি থেকে আদৌক নিয়ে এর উজ্জ্বলতাকে বাঁধানো কর না। তা করতে গেলে এর উজ্জ্বলতা ম্লান এবং সভা কীর্ণ হয়েই পড়ে। এক মনর-করানী আকোশলজার আকালনীতে ইংরেজীর প্রাণ-প্রবীণটি প্রায় জিনিত হয়ে পড়েছিল। সেটা মজেরো পতকের

দ্বিতীয় পদ্য থেকে আরম্ভ করে আঠারো শতকের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কবীরা সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি বা উল্লেখ ছাড়া ইংরেজী সাহিত্য বুঝবার উপায় ছিল না। সেই স্বকর জার্মান সাহিত্য-ও কবীরা সাহিত্যের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, যার হাত থেকে ইংলণ্ড জার্মানীকে রক্ষা করেছিল আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ফলে জার্মান প্রতিভা আরম্ভ হয়ে স্বকীর এবং সভ্যতার জাতীয় সাহিত্যের স্বকীতে আবার অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, আবারের উদ্গিত শতকের যুগ-ডাবনার পাণ্ডা অনুপ্রাণনা ছিল। এই অনুপ্রাণনা সেযুগের অন্যান্য যুগ-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অথবা গোজানুজি পাণ্ডা-সংস্পর্শে মজফল ইসলামের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এই বহিঃসংযোগেই তাঁর প্রাণবহি জ্বলে উঠেছিল এবং তাঁর বক্তব্য নানা রাগিণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু এই রাগিণীগুলি কোথাও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নি—ভাদের আলাপে-বিতারে বিজাতীয় কিছু নেই, অনুকরণীয়ক অথবা অনস্বৃত হব্ব কিছু নেই। তাই দেখি, মজফল-কাব্যের আলোচনার রূপো-ডলটোর-ইউটরান িতোতই প্রকাশ্য। বিভিন্ন দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি ইতিহাসের কাল-বাবধানেও অনেক সময় অনুরূপ প্রকৃতি লাভ করে। এই অনুরূপ অথবা সেই সব দেশের যুগ-প্রতিনিধিদের চিন্তা এবং কর্মেও কুটে ওঠে সাধনা, প্রকাশ্য এসে যায় সমান্তরাল অভিযুক্তি। এই অভিযুক্তিকে প্রভাব বলে মনে করা যায় না। কবির কাব্যানুভূতির sincerity যদি থাকে—যদি তা জাতির বা কবির জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি বা অভিজ্ঞতা থেকে উপভাভ হয়, কাব্যের অনুভূতি যদি সত্যের অনুভূতি হয়, তবে তা প্রভাবের অপবাদে কলংকিত হতে পারে না করনো। প্রভাব বলতে যা বুঝার, মজফল-কাব্যে তার অনুেষণ সমালোচনার বেকারত্ব নামে অভিহিত হবার যোগ্য। মজফল-কাব্যের কোথাও sincerity-র এতটুকুও অভাব নাই—বিব্রোহ-ভাবাত্মক, বিপ্লবাত্মক, প্রেমভক্তি-মূলক এবং প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার, গানে বা গল্পে। অনুকরণ অনুভূতির জড়তার জড়িত, আত্মপত ও জাতিগত ভাবাবেগের দোলার-লোলার চকন, অস্বিরচিত্ত কবির মানসলোকের গোপন কল্পের অপভ্রমের কুট-জান বিস্তারের অবকাশ ছিল না এতটুকু—কবির জীবন, বাস্তব পরিবেশ এবং কাব্য-সাধনার সম্মিলিত ইতিহাস একধারই সাক্ষ্য দেয়।

মজফল-কাব্যে জাতিসত্তার রূপাধে এবং জাতির বিশেষ প্রাণধর্মের অভিযুক্তিতে মেকির সেই—কেননা, জাতির বৃহত্তর এবং যুগ-লালিত জীবনচেতনা থেকেই তা উদ্ভূত। আবার, এই জীবনচেতনা কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মজাজী—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বাস্তব জীবন-পরিবেশ এবং আত্মপ্রবৃত্তি থেকেই কবি এই জীবনচেতনা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর জীবন কর্মেও কোন কীকি নাই। সুতরাং নিছক তত্ত্ব হয়ে বা একটা পোশাকী ঢাকচিকা নিয়ে তা কাব্যে রূপান্তরিত হয় নাই। তাঁর প্রাণাবেগের আবার উচ্চলতা এবং উন্মাদনা সহজ জীবন সত্যেরই গুহ-নিরঞ্জন বহিঃপ্রকাশ। তাঁর গল্প এবং সবল প্রকাশ-ভঙ্গীতে তাই তিরিক ও বর্ণালী বর্ণিতাল বিকীর্ণ হয় নাই। কিন্তু জাতি করে কাব্যসত্যের প্রকাশ নিছক হয় নাই—বহুত্ব বহুত্ব এবং জ্ঞাপর্ষ, বহুত্ব সঙ্গে আবারের সম্পর্ক এবং স্বাধ অবলীলার অনির্বচনীয়রূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে—বৃহত্তর জীবনসত্য বহুত্বের কাব্যসত্যে ব্যক্তিহ হয়েছ।

কবির কাব্যে বা কাব্যরূপ লাভ করে, তাঁর গদ্য রচনার, বক্তৃতার বা আলোচনার অনেক সময়ই তাঁর জাত্মিক পরিচয় কুটে ওঠে। এজন্য কাব্য আলোচনার পরিপূরক হিসাবে প্রথমে কোন

কবির গদ্য রচনার অনুশীলন প্রয়োজন, অথবা কাব্য এবং গদ্য রচনার সুগুণ আন্দোলনের প্রয়োজন। নজরুল ইসলামের গদ্য রচনাগুলির বিশেষত্ব: প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয় রচনাগুলির মধ্যে তাঁর জীবন-চেতনা শুদ্ধরূপ লাভ করেছে এবং তাঁর জীবনদর্শন-রূপেই প্রতিভাভূত হইছে। বাঙালী জাতি সত্যের বোধ এবং বাঙালীর প্রাণ-বৈশিষ্ট্য এক বলিষ্ঠ, সুস্পষ্ট এবং অনন্য সাধারণ প্রকাশভঙ্গী লাভ করেছে এগুলির মধ্যে। সুতরাং প্রথমতঃ কবির প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলি এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর কাব্য-পরিচয়টির উদ্দিষ্ট লাতই ব্যাখ্যাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য। অবশ্য কবির উপন্যাস এবং নাটক শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যেও তাঁর উল্লিখিত জীবনদর্শন বা জাতিসত্তার বোধ নিল্পরূপ লাভ করেছে। কিন্তু সে আন্দোলন যে এর আরম্ভাধীন নয়, তা প্রবন্ধের শিরোনামে সুস্পষ্টভাৱেই সূচিত।

[দুই]

কবির জাতিসত্তার অনুভূতিকে আরও গভীর্ণগতিকভাবে জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদ বলে অনেক সময়ই উল্লেখ করি। কিন্তু, রাজনীতি-শাস্ত্রে যাকে জাতীয়তা বা nationality বলে, নজরুলের জাতীয়তার চেতনা তাঁর চেয়ে ব্যাপকতর ছিল এবং তা জাতীয়তার মূল করেকটি উপাদানের মধ্যেই সীমিত নয়। তাঁর এই অনুভূতির সঙ্গে বিশ্রিত আছে ঐতিহ্যপ্রীতি, সংস্কারবোধ, সুগুণচেতনা, ধর্মজ্ঞান, ভাবাবেগ, বিশ্বানুভূতি, ন্যায়নীতি-চিন্তা এবং ঐক্যবোধ। এসবের সম্মিলিত চেতনাবোধ তাঁর জাতিসত্তার চেতনারূপে কাব্যের আবেগবিশিষ্ট বাণীরূপ লাভ করেছে। ফলে এর আবেদন জাতীয়তার শর্তগুলি সম্পর্কে ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি—এর আবেদন সম্পূর্ণ আত্মিক ও চিরন্তন হয়ে কুটে উঠেছে এবং তা একটি দুর্ভয় ও দুর্বল অনুভূতিরূপে প্রতিভাভূত হয়েছে। রাজনীতিবিদ যোদ্ধা জাতীয়তা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তা নজরুল-কাব্যের জাতীয়তার অনুভূতি সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যোদ্ধা জাতীয়তাকে বলেছেন :

it is a union of hearts, once made, never unmade—it is a spiritual conception, unconquerable, indestructible.

হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে, আত্মিক ঐক্য বা একাত্মতার জাতীয়তার বন্ধন সূচু হই, অবরতা লাভ করে। নজরুল-কাব্যে জাতীয় চেতনার উদ্ভূত, আত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ, জাতিকে স্বাধীনতার তোরণে পৌছিয়ে দেবার সূচু প্রত্যয় বোধিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, জাতীয় চেতনা মূলতঃ একটা আত্মিক চেতনা—সকল, রাজনীতিবিদ্বৎ স্বতন্ত্রপক্ষে একথাটা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, যদিও তাঁরা সবাই যোদ্ধার কথার সবগুলি মানেন না। রাজনীতিবিদ্বৎ ল্যান্স্‌কি-ও বলেছেন,

ultimately, that is, the purity of that corporate soul we call a nation is only maintained when the forces of the spirit are the masters of its life. It is only debased when it lends itself to other forms of power, and debasement is always easier than elevation.

জাতির জীবনে আবার আবিপত্য যতকণ থাকে, ততকণ তার জাতিবৈর অধিকর বা অধঃপাত ঘটে না। আর, সাহিত্য বা নিষ্পেষ বাধাবেই আবার আবিপত্য জাতির জীবনে সর্বাধিক বিস্তারিত এক দৃষ্টি হতে পারে। অপরপক্ষে, জাতিসত্তার বোধ একটা শিরিচুয়াল ব্যাপার বনেই তা কাব্যিক প্রেরণা হয়ে দেখা দেয় এবং চরৎকার কাব্যিক অভিব্যক্তি লাভ করে। তাই কাব্যশাস্ত্রে এটা বেশপ্রবণ বা জাতিপ্রীতি নামে একটা সঙ্কারী ডাব হিসাবে স্থান লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, নজরুল-কাব্যে এর আশ্চর্য সার্থকভাৱণ্ডিত অভিব্যক্তি ও স্বাধীনহুতি দেখতে পাওয়া যায়।

নজরুলের জাতীয় চেতনা বা জাতিসত্তার অনুভূতি যেমন রাজনীতি-শাস্ত্রের সংজ্ঞাব্যিক জাতীয়তাবাদ নীতিভুক্ত নয়, তেমনি তা একটি বৃহৎ পটভূমিতে স্থাপিত। বাঙালী জাতির সত্তাবোধ যদিও তাঁর কবিরচনাসে প্রবণ হয়ে অংকিত ছিল, কিন্তু তাকে সর্বভারতীয় জাতিসত্তার পটভূমিতে স্থাপন করেছে তিনি দেখেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি বাঙালী জাতীয়তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অঙ্গীভূত করে দেখেছেন, অথচ তাঁর চিন্তা অনুভূতি-ডাব-আবেগ উয়েল হয়ে উঠেছে এবং প্রেরণা লাভ করেছে বাঁচি বাঙালী জাতিসত্তার অনুভূতি থেকে। তিনি জানতেন, স্বাধীনতা, শুধু বাঙালীর জন্য পৃথকভাবে আসবে না—সবত্র ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এতনা প্রকাশ্যতঃ এবং প্রায়শঃ তাঁকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারক এবং বাহক বনেই বনে হবে। কলমে নজরুল যে জাতির বৃত্তি কাহনা করেছিলেন, তা ছিল অথও ভারতীয় জাতি। গান্ধীজী এই অথও জাতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলে তাঁকে কবি আত্মরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর মতো তিনিও ভারতে এক অথও মহাজাতির স্বপ্ন দেখতেন :

আমরাই ভারতে আবার অথও জাতি পড়িয়া তুলিব। যে দক্ষকণীল বৃদ্ধ এতটুকু ‘হু’ করিবে, তাহার পর্ণান বরিয়া এই বৃত্তির দিনে বাচির করিয়া লাও। যে আবাদের পথে ঝাঁড়াইবে, তাহার চুটি টিপিয়া বরিয়া কেল। (ছুৎসর্গ)।

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবাসীর শোকসুশোর মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তা বোধের উপলব্ধিতে তিনি উয়েল হয়েছেন :

হিন্দু-মুসলমান—মাড়োয়ারী—বাঙালী—হিন্দুস্থানী কোন ভেদাভেদ ছিল না, কোন আভিচারি ছিল না,—তখন শুধু মনে হইতেছিল, আজ এই মহাপগননভলে ঝাঁড়াটমা আমরা একই বাধার বাধিত খেলনাভুর মনিষায়া, দুটি পুহকারা ছোটভাই”। (লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেলনাভুর কলিকাতার মূণা)।

নজরুল ছিলেন বৃহত্তর অর্থে জাতীয়তাবাদী, বক্তিত বাঙালী জাতীয়তাবাদ কথা তিনি পৃথক ভাবে চিন্তা করেন নাই এবং তিনি সকল ভারতীয়ের মধ্যে একা কাহনা করেছিলেন—এগুলি সবই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু কবির বৃহত্তর জাতীয় চেতনার মধ্যে বাঙালী জাতীয়তাবোধের বীজমহাটি সকলময়ই জাতীয় এবং সোচ্চার ছিল। কখনেকণে তা বিবুৎ বসকের মতো তীব্র-মুগ্ধি হুড়িরে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বাসনা একটি চিব-মানিত অনুভূতিমূলে কবির প্রাণে প্রেরণার ঊৎসব অবারিত করেছিল। বাঙালীকে আগাতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

ওরে আমার ভারতের সেরা, আঙন খেলার সোনার বাঙলা। কোথার কোন্ অগ্নিসিঁদুর ওরে তোর বুকের অগ্নিসিঁদু নিভুত নিম্পল হয়ে পড়ল? কোন্ অঙ্গস-করা কণ্ঠস্বর দেখতোর বঁশীর হয়ে হয়ে তোর উত্তার অগ্নিতরঙ্গমালা তুচ্ছ নিখর হয়ে পড়ল? (আমি সৈনিক)।

শেষবছর কারাবৃত্তিতে উল্লসিত হয়ে তিনি বাঙালীর মৃত কংকালে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন :

সেবেছ কি ভীষণ ধূমকুণ্ডলী উঠেছে বাঙলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে। বল ঝুবি, 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জন, বাঙলার বাসু, বাঙলার কল পুণ্য হটক, পুণ্য হটক পুণ্য হটক, হে ভগবান।' এস ঝুবি, উচ্চারণ কর শব্দ-সাধনার মর। এই শব্দের মাঝে শিব জাগাতে হবে। পারবে?—তবে এস।" (বাগত)।

শাশুত বাংলা এবং চিরন্তন বাঙালীর জন্য কবি-প্রাণের গোপন কল্পে যে একটি কোবল অনুভূতি সঘর-লানিত কুসুম-গন্ধ ছড়াতে, তার পরিচয় আছে 'জাগরণী' শীর্ষক রচনাটিতে। এখানে 'বকুল'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি বলেছেন :

তুমি যেখানে কোট, সেই পল্লীতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাঙলা—বাঙালীর আসল প্রাণ। আমাদের এই শাশুত বাঙালীর স্রষ্টা, বুকে-ডরা অনল প্রাণ জাগিয়ে তোল তোমার জাগরণের সোনার কাঠি দিয়ে।

কবির এই শাশুত বাঙালী আঘাতে-আঘাতে জেগে-ওঠা আত্মপ্রবুদ্ধ বাঙালী। এই বাঙালী বিদ্রোহী, বিপ্লবী, ক্ষত্র বাঙালী। মৃত্যুর মাঝে সে উদ্বুদ্ধ। সৌন্দর্যের নর, বীভৎসতার দীক্ষার সে দীক্ষিত। সে প্রেম-কল্পণার উপাসক নর—ভিক্ততা, দাহনজ্বালা আর কর্কশ কাঠিন্যের উপাসক। জীবনের গৌরবে, বৌবনের শক্তিরসে সে মগ্ন উচ্ছ্বল। তাই কবি কোবল মেহমায়া দিয়ে, নিভেজ শুষ্কতা দিয়ে প্রাণহীন, তত্ত্বাবিষ্ট, আত্মবিভোল জাতিকে বাঁচিয়ে তুলতে চান নি—তাকে প্রলয়-নিজার আহ্বানে, মৃত্যুপথে ধাক্কার-ধাক্কার তেলে দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছেন। তার জন্য তিনি চান বুদ্ধ-দেহি মর—এই বোধনময়ে অগ্রত বীর বাঙালীই ছিল তাঁর শাশুত বাঙালী।

মজল্লের জাতিসত্তার অনুভূতি বা জাতীয় চেতনা শুধুমাত্র বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তায় পটভূমিতেই স্থাপিত হয় নি, বিশ্বাত্মতা বা মহামানবতার মিলন তীর্থে তার সংকীর্ণতা যপনোদিত হয়েছে। মহামানবতার মহাজাগরণে বিশ্বাসী কবি মনে করেন, আজ নবযুগের নবসৃষ্টির শুভ মুহূর্ত সমাগত। এখন বিশ্বে উৎপীড়িত জনগণের মুক্তির পর্ব। বিশ্বমানবের মুক্তিকামী কবিঃ দৃষ্টিতে তাই :

—একই দুঃখে দুঃখী জনগণ দেশ, জাতি, সমাজের বহির্বর্জন তুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই বাধার ব্যধিত, নিপীড়িত সত্য মানবাচ্চা। (নবযুগ)।

কবির জাতীয় চেতনা এইভাবে আত্মজাতিক চেতনা বা বিশ্বমানবের অনুভূতিতে সর্বজনীন ও সর্বকালিক রূপলাভ করেছে। এই বিশ্বাত্মতার অনুভূতি থেকেই কবি শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। তিনি ডাবলোকবিহারী আত্মপর্যায়ী মানবতার পূজারী ছিলেন না—সত্যিকার গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা এবং শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দিয়েই তিনি মানবতার মুক্তি চেয়ে-ছিলেন। এই আত্মরিক অনুভূতির জন্য তিনি সকল রকম শোষণের হাত থেকে মেহনতী মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। 'ধর্মঘট' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই 'পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের' জন্য তাঁর বেদনাবোধ চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে কল্যাণবির কৃশদেহ সন্মুখে তিনি বলেছেন :

কোম্পানী জে জরাজেবই সৌন্দর্যে বক বক টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ বক্তব্যবাদের
স্বাভা, আচার প্রকৃতির নিকে জুনেও চাইবেন না। এই কুনিমিত্তের চেহারা নিকে জাকাইয়া
কেহ কখনো চিনিতে পারিলেন না যে, ইহারা মানুষ কি প্রেতলোক-কেন্দ্রা বীভৎস নরক-কাল।

বুদ্ধ বানবজর পুকারী কবির জাতীর চেতনা এইভাবে বিশ্বাসবজা ও সর্বমানবিকতার বজলম্পর্শে
পরিভ্রম হইয়াছে এবং উহার সন্নিহিত লাভ করেছে।

নরকল জাতির জন্ম রাজনৈতিক বুদ্ধি বা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। সেবুগে ভারতের বুদ্ধিদের
যে করজম বনীযী জাতির স্বাধীনতা ও বুদ্ধির জন্ম নিজের নিজের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন,
নরকল তাঁদের অন্যতম। তীন্দ্র ও দুর্ভাগ্যের জাতীর চেতনা থেকেই তিনি এই সংগ্রামের প্রেরণা ও
পটভূমি করেছিলেন। কান্য জাতীরজাকে বাস্তবায়িত করতে তখনই ইংরেজের দারপাশ থেকে
বুদ্ধি লাভ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাই তাঁর সাহিত্যে স্বাধীনতার বাণী
দৃষ্ট ও উল্লসিত সুরে শ্বনিড-প্রতিশ্বসিত হইয়াছে প্রায় সর্বত্র।

অবশ্য এই স্বাধীনতার চেহারা সম্বন্ধে কবির নিজস্ব ধারণা ছিল সুস্পষ্ট এবং সহজ। বরাজ
বা স্বাধীনতার সত্তা যেমন স্বাধীন বাসস্থান যথোপযুক্ত স্বাধীনতা দেয়। আছে সীমিত স্বাধীনতা
কবির তা কান্য ছিল না। পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম ছিল তাঁর লক্ষ্য।
স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র, জাতীয় সরকার ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের মৌল শর্তগুলি যে তাঁর মানসপটে
প্রাণ হয়ে অঙ্কিত ছিল, তাঁর সুস্পষ্ট অভিযুক্তি ঘটেছে এই কথাগুলিতে :

সর্বপ্রথম 'ধুমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

বরাজ-চরাজ বুদ্ধিমা, কেননা, ওকথাটার মনে এক এক বদারখী এক এক বকর করে থাকেন।
ভারতবর্ষের এক পরমাপু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দারিত্র, সম্পূর্ণ
স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। (ধুমকেতুর পথ)।

তিনি জাতির পূর্ণবুদ্ধির জন্ম যেমন শর্তবদ্ধ সীমিত স্বাধীনতা চান নি, তেমনি এতদ্ব্যপারে
বিদেশী সরকারের নিকটে আবেদন-নিবেদনের পক্ষপাতিও ছিলেন না। কাতর-কাকুতির দ্বারা
বা কলা-কৌশলের পরোক্ষ পটভূমিতে স্বাধীনতা লাভ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। একারণেই তিনি
ববীন্দ্রনাথ অথবা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, যদিও তাঁদের বাসনার সঙ্গে তাঁর
বাসনার কোন পার্থক্য ছিল না। স্বাধীনতার বাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের
মাধ্যমেই তিনি দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন—বিদেশীর দ্বারা দান হিলাবে স্বাধীনতা চান নি।
কেননা, তাহলে তাঁদের কাছে থাকতে হবে কৃতজ্ঞ এবং তাঁদের প্রজ্ঞা বা ইচ্ছাকে অতিক্রম করাও
হবে না সম্ভব। জাতিকে আপন বীর্বে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে; এর জন্য বক্তৃতা, বৃত্তা,
শব্দ বা বিপর্যয়ে কাতর হলে চলবে না। কেননা এইভাবে অর্জিত স্বাধীনতাই সত্যকায় স্বাধীনতা
—এই ছিল তাঁর মত।

তাঁর এই মতের সঙ্গে তৎকালীন বনীযীদের মতের মিল হয় নি। গান্ধীজী, অরবিন্দ এবং ববীন্দ্রনাথের
রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের পার্থক্য এবং তাঁর চিন্তাধারার স্বাভাব্য সম্পর্কে ইচ্ছিত
মতে গিয়ে তিনি বলেছেন।

আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশী বুঝবার ডান করে কেন কারুর শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীই হউ হোক, আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই হউ হোক কিংবা ঐতিহ্যেরই হউ হোক। আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সত্যি পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর আদর্শ ঠিক ততটুকু মানব। তাঁদের বাণীর আশ্রয় যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না। (দুইকেতুর পথ)।

কিন্তু এই উক্তিকে অনেক একটা ভাবপ্রবণ কবির অর্ধহীন অসমিকার চর্চা বা অকারণ দল্লোক্তি বলে মনে করেছেন এবং তাঁর ন্যায্য মূল্য দেন নাই। সেখানে অনেকেরই সত্য্য সত্য্য অর্জন বা সুবিধা আদায়ের জন্য গান্ধী, অরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের অঙ্ক ডঙ্ক করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব সত্য্যবোধ ছিল না, অঙ্ক অনুকরণেই তাঁরা নিঃশেষ হয়ে গেছেন। মজলুম তাঁদের পথে যাননি—তাই তাঁকে অনেক ব্যক্তি এবং উল্লেখ্য আশ্রয় সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিজ বীর্যে স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সফল হলে হয়তো স্বাধীনতা আজ এত দূর্বল বলে মনে হতো না। হয়তো বৃটিশের দরদার দান এই স্বাধীনতার সঙ্গে তা উপহাসদেপে এক দীর্ঘস্বামী, অভিলাষ হয়ে যুগে যুগে নানা রাজ-মৈত্রিক বিপর্যয়ের বন্যা বয়ে দিত না, এর অক্ষুণ্ণপ্রসারী বিধিক্রমের লক্ষ লক্ষ প্রাণ অর্জরিত হতো না।

জাতির সেবা, দেশের কাজ, নিঃস্বার্থ কর্ম ও ত্যাগের দ্বারা যে দেশের বা জাতির কল্যাণ হয়, তা তিনি মানতেন, কিন্তু সংগ্রাম, রক্ত আর বিপ্লব ছাড়া যে সত্য্যকর মুক্তি আসতে পারে না, সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্থির নিশ্চিত। পরোক্ষ পন্থীদের পথে যথার্থ স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না—তাই তাদের অভিভাবানুতা, সংগ্রামভীকৃততা এবং কাপুরুষতাকে তিনিও প্রত্যাখ্যাত করেছেন ব্যক্তি ও বিক্রপের কণায়। গান্ধীর অহিংসা-নীতি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটা নির্ভীক কৌশলমাত্র। এতে স্বাধীনতা আসতে পারে কিন্তু তা স্বাধীন, যথার্থ এবং গৌরবান্বিত স্বাধীনতা নয়। অহিংসবাদীদের এই নির্ভীক স্বাধীনতা কার্যনাকে কবি তীব্রভাবে কণাখাও করেছেন এইসব শ্রেয়বাক্যে :

মানীশ্রুতায় আদি শোধ ঐ অহিংসা-বোন নাকি-নাকি,
খাঁড়ায় কেটে কহ্মা ধিনাশ নপুংসকের প্রেরের ফাঁকি
হান্ডরখার, আনুয়া সমর, অরর হবার মর শেখা,
মানীশ্রুতায় কহ্মা পুরুষ, রক্ত দেমা, রক্ত দেখী।

(আনন্দময়ীর আগমনে)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে জাতীয় মুক্তির লিপারী ছিল না, এর বিশ্বজনীনতা যে ভারতবাসী বা বাঙালীর পরাক্ষমতা পুংখল-মোচনে অক্ষম, নিম্নোক্ত শ্রেয়গুলিতে তা নিম্পুণ শৈল্পিক অভিযুক্তি লাভ করেছে :

রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ লিগতরে,
সে কর শুধু পপলো না যা অঙ্ক কারার বহু ঘরে।
গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকার বোড়া,
মর্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে যারছে কোঁড়া।

(২)

ব্যতিক্রম পক্ষে, জাতির স্বাভাবিক বৃত্তির ব্যাপারে নবকল তৎকালীন বনীবীনের বাবা প্রভাবিত হন নি, বসিও তাঁদের দ্বাৰা নিজেই তিনি জাতীয়তার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। পূৰ্বে বসেছি, তাঁদের আকর্ষণের সঙ্গে তাঁর মৌল আকর্ষণের পার্থক্য ছিল না, কিন্তু তিনি নিজ অভ্যন্তর সত্যবোধের জৰায় পরিচালিত হয়েছেন। তিনি দেশের মানুষ এবং তাদের জীবনকে স্বাভাবিক কৃত্রিম কৃত্রিম জোঁতে অথবা উপহৃত্যের দৃষ্টিপাতে দেখেন নি—বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি নিয়েই দেখেছিলেন এবং দেশ ও জাতিকে আপন করে পেরেছিলেন। এই আপন করে পাওয়াতেই তাঁর দ্বারা বাঁটি জাতিসত্তার বোধ জেগে উঠেছিল, আর এই সত্যবোধই তাঁকে বিরোধিতা সত্যবোধ। বাঁটি জাতীয় চেতনাব্যাপ্ত এই সত্যবোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিদ্রোহী বহুসংগঠনকে জাতিকে সংঘবদ্ধ করতে, বুলাবান স্বাধীনতাকে আপন শক্তিতে বিনেশীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে। জই জাতীবন তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, বিদ্রোহী হয়েছেন, বৃত্তির পান পেরেছেন, স্বাভাবিক কয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, সাহিত্যের সাধনা করেছেন।

আপন বীর্যে স্বাধীনতাকে জয় করার পক্ষপাতী ছিলেন বলে তিনি বিপ্লবী বীরের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং জাতিকে বিপ্লবের বৃত্তিময় দান করেছিলেন। প্রথমতঃ বিদ্রোহের দ্বাৰাওই তিনি এই বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছিলেন, এইজন্য প্রথমতঃ তাঁকে আমরা বিদ্রোহীৰূপে দেখতে পাই। পূৰ্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি এই বিদ্রোহকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট :

“পূৰ্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, নকল-কিছু নিরস্ত-চলুন, বাঁধন-শৃংখল, বান-নিষেধের বিচ্ছিন্ন। (বুরকেতুর পথ)।

বিদ্রোহী হিসাবে কবির ব্রত ছিল যেমন কঠোর ভেদনি অনবনীয়। তিনি তাঁর বিদ্রোহী-বৃত্তির স্বরূপ অংকন করেছেন এইভাবে :

আর্জের অশ্রুসোচন আমার নয়, আমার স্বপ্নদুর্ঘ। আরি প্রলয়ের, আরি প্রেমের নই। আরি ক্ষতের, আরি কক্ষণের নই। আরি সেবার নই, আরি বুজের। আরি সেবক নই, আরি সৈনিক।আমি সুলার নই, আমি বীভৎস। আরি বুক নিতে পারি না, আরি আঘাত করি। আরি নজলের নয়, আমি বৃত্তাব। আরি হাসির নয়, আমি অভিশাপের। (আমি সৈনিক)

কবির এই বিদ্রোহী-রূপ অস্বীকার, অপূৰ্ণ। ‘তীব্র জাতীয় চেতনা এবং জাতিসত্তার বাস্তবায়নের অদ্বা-আকর্ষণই তাঁকে এই স্বষ্টিকাজ বিদ্রোহী বৃত্তি দান করেছিল।

স্বাধীনতার জন্য নবকল বিদ্রোহ বা বিপ্লবকে অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এর কই কে দেখে এবং কারা এই বস্তু বৃত্তি আনবে? তিনি স্বয়ং বিদ্রোহীৰূপে স্বাধীনতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর, যাবা এই বহুসংগঠন বৃত্তিময়, তথা তাঁর কাব্যে বসিত প্রত্যয় এবং বহুসংগঠন চিত্রণে কাব্যরূপ লাভ করেছে। কবি জানতেন, তাঁর পথ বক্তা-সংকুল, বক্ত-শিঙল, কণ্টকময় জই এপথে বৃত্তি আনতে উৎসর্গ চাই বীরবান, ডাঙ্গী ও বিপ্লবী আদ্য। যাবা দেশের বীর সন্তান সকল স্বপ্ন-স্বাভাব্যকে অস্ত্রান বৃখে বিনশ্রম দিয়ে যাবা দুঃখের তপস্যার জীবন উৎসর্গ করবে, জীবনের বিবেক সত্তর দিয়ে অস্ত্রাচারী শাসক ও জয় শাসনকে করবে বিনশ্রম, জইই আনবে বিপ্লব,

করবে দেশ স্বাধীন, পঠন করবে জাতি। যারা রক্তচক্ষু কাশানিক, শব্দ ও রক্তের সাধনা যাদের, শুনিবাদের মধ্যে কাঁপীর রক্ত কণ্ঠে নিয়ে যারা দীপকণ্ঠ, উরাই দেশ ও জাতির বুদ্ধিজাত্য, পরিজাত্য। এরাই দেশবাত্তকার যোগ্য সন্তান। শিব বা কল্যাণকে আগাতে যৌবনের দক্ষ বহিমান প্রয়োজন। ছিপ্ৰবস্ত্র পূজার বলি হতে হবে যাদের এই সন্তানদেরই—তবেই আবার আত্মপূজার মধ্যে পুষ্পের হাসি কুঁচবে বৃত্তার মাঝে আগবে জীবন, দ্য-হত্যার মধ্যে বেজে উঠবে মঙ্গল শব্দবলি। এদের মধ্যেই রয়েছে কবির চিরন্তন বাঙালী—চিরকালের বাঙালীর নিকটে যারা পূজারী, নবনা। দেশবাত্তকার ধূপকাঠে আত্মবলিানে উষ্ম, তরুণ বিপ্লবী শক্তির অধিকারী এই শাস্ত্র বাঙালী না আগনে কবির আশা পূর্ণ হবে না—দেশ স্বাধীন হবে না। তাই এদের আগানোই ছিল কবির প্রধান ব্রত। কিন্তু লালিত মধুর স্বরে আহ্বান করলে এরা আগবে না কর্বনো—কঠিন আঘাত যেনে, ধূপকাঠি নিষ্প্রাণতাকে চূর্ণ করে আগাতে হবে এদের। পরাধীনতা, অপমান আর লাঞ্ছনার যারা অশ্রুকে শুষ্ক বিজার দেয়, যারা আত্মবিশ্বাস ও আত্মপজিহীন, তাদের ডীন আঘাতে, কবির বহুবার আগিয়ে তোলবার জন্য কবি রক্ত-দেহতাকে আহ্বান করছেন:

কৌখান আঘাতের দেবতা। আঘাত কর, আঘাত কর তাদের, যারা চোখের সাধনে যাদের অপমান, দেখে শুধু ক্রন্দন করে, প্রতিকারের পক্ষ অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে কিণ্ট হয়ে ওঠে না। অবমানিত হয়ে যাদের চোখে অগ্নিস্ফুল্ক নির্দত্ত না হয়ে অশ্রুজল নির্দত্ত হয়, তাদের আঘাত কর, আঘাত কর, হে আঘাতের দেবতা। (রক্ত-মঙ্গল)

কবি 'ভুবুড়ী বাঁপীর তাক' নিয়ে এই আহত কাল-কেউটেদের বিবর থেকে ধেরিয়ে আগতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের বিশ্ব-নিশ্বাসে যরণ-ছোবনে বিশ্ব অর্জরিত হোক—তবেই বিধাতা তাঁর জুল সংশোধন করে বিশ্বকে আবার নতুন করে গড়বেন—আগবে বুদ্ধি, স্বাধীনতা। বুদ্ধিকারী কবি এইভাবে বুদ্ধ-বিশ্বের অন্ধনে জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর 'ভাঙার গানের' অন্তরালে আছে জাতীর বুদ্ধি-চেতনার অকুণ্ঠ উৎসর্গ। 'মুদিনের খাত্রী' এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বুদ্ধিসাধনারই গদ্যময় সাহিত্যরূপ।

নজফুল ছিলেন সত্যাকার বিপ্লবী যেনে প্রাণে বিপ্লবী। পুরাতনকে ভেঙে তার বুক নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। 'অগ্নিবাণ'র লাহনজ্বালা 'বিষের বাঁশী'র বিষতান এই কারণেই, 'ধূমকেতু'র স্বংস নিশান উড়িয়ে এই কারণেই তিনি নিরোহী হয়েছিলেন। এগুলি তাঁর সৌধীনতা বা একটা ধোঁয়ালা নর, অথবা জোর করে বাঙলা সাহিত্যে একটা চরক-নাগাসো ডাবধারার স্রষ্টাও নর তা। তিনি পোশাকী বিপ্লবী ছিলেন না। জাতির যুগেধরা কাঁপ অবহট্টাকে বঙ্গবাদের চোখে দেখতে পেরেছিলেন তিনি এবং তাঁর স্বংসোন্মুখ গনিত জীবনব্যবহার করিকু-তাকে মর্মেবর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যেনপ্রাণে এর স্বংস কামনা করেছিলেন এবং এই ভগ্নস্থূপের ওপরে নতুন জাতিস্তার বুনরাধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কবির চোখে এক নব্য-বিত্ত নবীন জাতির উজ্জ্বল মহিমা দ্বির কোটির্ভাষা বিকীর্ণ করেছিল। জাতিস্তার এই জয়য নামক-বুদ্ধিকে তিনি এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠাত্বনির ওপরে স্থাপন করতে চেয়েছেন:

এদেশের মাড়ীতে-মাড়ীতে অস্বিকতার বে পচন রয়েছে, জাতে এর একেবারে স্বংস না হলে নতুন জাতি গড়ে উঠবে না। বার জিতি পড়ে গেছে, তাকে একবার উপড়ে

কেলে নতুন করে ভিত্তি না পাঁথরে তাঁর ওপর ইমারত বড়বার বাঁড়া করা যাবে, ভেঁটবাই জ প'ড়ে যাবে। (আবার পথ)।

কবি নজরুলের এই নির্ভেজাল, অত্যাশ্চর্য আতি-চেতনার মধ্যে হীনমন্য ডাকবিত 'ভক্ত-লোক'দের বিশেষ স্থান ছিল না। কৃত্রিম পন্থে মানুষটাই আঁতি নয়। যারা দেশের বাটর সঙ্গে সংলগ্ন, দেশের বৃহত্তর জীবন প্রবাহের মধ্যে যাদের জীবন নিত্য-সংশ্লিষ্ট, সেই ডাকবিত 'ছোটলোক'দের বাক দিয়ে আঁতির কল্পনা করা যায় না। এদের সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং উপেক্ষা-ভাবের জন্যই আমরা আজো এক শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী আঁতিতে পরিণত হতে পারি নাই। কিন্তু এরাই আঁতি—এদের সত্যিকার মানুষের স্বর্গাশা দিতে হবে, এদের সুস্থ শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে এবং এদের বুদ্ধির জন্য সংগ্রাম করতে হবে। কবির ডাকবার :

দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সবটাই তো আঁতি। আর সে-দেশকে, সে-আঁতিকে যদি দেশের, আঁতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। জোমাদের এই আঁতিজাত্য গবিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভয় সম্প্রদায় দ্বারা (যাহাদের অধিকাংশই দেশের, আঁতির প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা নাই) বন্ধে কর কি দেশ উদ্ধার হইবে, আঁতি-গঠন হইবে? (উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন)।

এই উপেক্ষিত বিনূল জনশক্তিকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না করতে পারলে যেমন আঁতি-গঠন সম্ভব নয়, তেমনি এদের উত্থানেই বুদ্ধি সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই বুদ্ধির জন্য তিনি সকল শ্রেণীর মানুষ—স্বক-শ্রমিক, বুটে-বন্দুর, ছাত্র-সৈনিক, নারী-পুরুষকে বিপুলবেশ পথে আহ্বান করেছেন। সমগ্র আঁতির বুদ্ধির মধ্যেই তিনি সত্য বা কল্যাণকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই সত্যকে প্রব ধরে নিজের পথ স্ঠি করে গিরেছিলেন : "দেশের পক্ষে বা মঙ্গলকর বা সত্য, তবু তাই লক্ষ্য ক'রে এই আঁতের বাঁড়া গুলিয়ে পথে বাহির হলাম।" (আবার পথ)। গাভীরা জনতাকে হাবলী হতে, অস্বপ্নজিতে ও অস্বনির্ভরতার উদ্ভূত হতে প্রেরণা দিতেন বলে তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। 'আবার পথ' প্রবন্ধে তাঁর পরিচয় আছে। এসব থেকে বুঝা যায়, নজরুলের আঁতি-চেতনার সংকীর্ণতার কোন স্থান ছিল না এবং তাঁর মানবজাতিবোধও কল্পলোকের বস্তু ছিল না। আঁতিকে কেন্দ্র করেই তাঁর মানন-চেতনার জা স্থান লাভ করেছিল। আঁতির বুদ্ধি-বস্তুেই তাঁর মানবজাতিবোধ উপসারিত হয়েছে।

এতকণের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বুগ-জীবনের নতুন পটভূমিতে আঁতিসত্তার তীব্র অনুভূতি, প্রবল স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অনন্য সাধনা—নজরুল-মানসিকতার এগুলি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। নজরুল ইমার বেগুণে সাহিত্য-সাধনার শ্রুতী হন, সে বুকের বুগমানসে ঐগুলি ব্যাপক আলোড়নের স্ঠি করেছিল এবং আঁতি আসন্ন বুদ্ধি-প্রতীকার অবীর বৃহুর্ত বাপন করছিল—একথা ঐতিহাসিক সত্য। বুগজীবন ও বুগমানসের নির্বৃত্ত এবং নিপুণ প্রতিবিম্বনে তাই নজরুল সাহিত্যে অনন্য সাধনার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নজরুলমানস বুগচিত্তের চিহ্নিত পথেই পরিক্রমণ আরম্ভ করে এবং বুগজীবী স্বভাববলে কাটিকণ্ড লক্ষ্যে উপনীত হয়। সেবুকের আঁতির বন ও মানসিকতা, প্রাণধর্ম এবং জীবনকর্মন নজরুল-সাহিত্যে এইভাবেই সার্বক জগায়ণ লাভ করেছিল; বার জন্য জ শ্রেষ্ঠ জাতীর সাহিত্যের স্বর্গাশা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বেদন আধুনিক জীবনচেতনা, পরবর্ত্তে বেদন সবাত্ম-চেতনা, নজরনে তেমনি জাতীর চেতনা তাঁদের সাহিত্যকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অবরন্থ লান করেছে। কিন্তু নজরনের কাব্য তাঁদের মধ্যে শুধু রূপারপেই—জাতিসত্তা, জাতির মন ও চরিত্রকে রূপায়িত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁকে এই মন এবং চরিত্র অনেকাংশে গঠন করতে হয়েছে, জাতিসত্তার নতুন যুক্তি রচনা করতে হয়েছে। জাতিকে যুক্তির পথে প্রেরণা দিতে হয়েছে, জাতীয়তার মধ্যে দীক্ষা দিতে হয়েছে, শক্তির সাধনার উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে। যুগের মূল বাসনাকে তাঁকে কাব্যে এবং জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়েছে। এসব কারণে নিম্পীর তুমার সাধনা, নিমিষ্ট একাগ্রতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নিম্পকে ছানিয়ে নিম্পীই আমাদের কাছে দীপ্ত হয়ে কুটে উঠেছেন—নিম্পের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারেননি তিনি। তাই কবি নজরনের মধ্যে ব্যক্তি-নজরন, বিদ্রোহী নজরন, দেশপ্রেমিক নজরন, বীর নজরন অত্যন্ত প্রকট। কবি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে শুধু আত্মপ্রকাশই করেন নাই, আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবেই বরা দিয়েছেন, দৃঢ় আনন্দনে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। এইজন্যই তিনি এত জনপ্রিয়, এত আমাদের কাছেই মানুষ।

প্রত্যেক যুগের যুগ-নিরাকর শক্তি যুগের পুরুষদের প্রতিভার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। নজরন-প্রতিভার মধ্যে যে যুগ-নিরাকর শক্তি নিহিত ছিল, যুগচরিত্র নির্মাণে এবং তার সংস্কারে তা মিরোজিত হয়েছিল—বন্যা, তা তাঁর কাব্য বা সাহিত্যের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। সেকালের যুগচরিত্রে একদিকে বেদন শৌর্য, স্বাধীনতা-শূভা, বিপ্লবী চেতনা এবং গণ-জাতিক বোধ ছিল, তেমনি আবার হীনমন্যতা, কাশ্মরতা, অমানবিকতা, আত্মসম্মানবোধের অভাব, অমৈত্র্য এবং গোঁড়ামিও ছিল প্রচুর। নজরন জাতীয় চরিত্রের উন্মিষিত দুর্বলতা এবং জটিলতা বিচারিত করে একটি স্বয়ং সবেল, বলিষ্ঠ, নির্ভীক, সংস্কারযুক্ত ও দেশপ্রেমিক জাতীয় চরিত্রে গঠনের প্রত্য গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজে তাঁর কবি-শক্তির চেয়ে আত্ম-শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল বেশি। তাই আত্ম-শক্তিতে বরীমান তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রই আমাদের কাছে বেশি প্রোচ্ছল। এই আত্ম-শক্তির প্রবল প্রভাবে জাতির মন ও চরিত্র নির্মাণে নজরন-কাব্য সর্বাধিক সার্থকতার পক্ষিত্ব দিয়েছেন। একারণে নজরন-কাব্য জাতির দিকটে চিরন্তন প্রেরণার উৎস এবং এই প্রেরণা সেযুগে জাতিকে অনেক দুর্ভাষা বাধা ভয় করার শক্তিও লান করেছিল। তাই, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্য হিসাবে নজরন-কাব্যের মূল্য অপরিমিত।

যুগ-নিরাকর শক্তি কবির লেখনীকে আশ্রয় কবে মানাক্ষে প্রকাশিত করেছে। জাতির চরিত্রে গঠন বা পুনর্গঠনের জন্য তাঁর লেখনীর কণাখাত তার মধ্যে অন্যতম। এইভাবে তিনি আত্মবিশ্বাস জাতিকে আত্মবর্ধনা ও আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন করে জোঁদবার চোঁদা করেছেন। গোলাবী বা দাগ-বসোবৃত্তিকে তিনি মৃণা করেছেন এবং উল্লসিত করেছেন। শিকড় সম্প্রদায় এবং চাকুরীজীবীদের হীনমন্যতার ভিত্তি ব্যাধিত করেছেন। স্বাধীনচিত্ততা এবং আত্মসম্মানবোধকে তিনি জাতীয়তার শর্ত বলেই প্রায় মনে কবতেন এবং বা-কিছু এতনিকে বর্ষ করে তার সিন্ধা করেছেন। তাঁর ভাষার :

আমরা আজ ভারতে এক অর্থও জাতি পড়িয়া তুলিতে চলিতেছি, আর আজো যদি

আমাদের আত্মসম্মান না জাগে,—আজো যদি আমরা আত্মবিশ্বাসে ভর্য করিয়া নিজে

মদুধ্য ও পুরুষকরের কোয়ে বাধা উঠু করিয়া বিশ্বের মুক্ত পথে চলিতে না পারি,

তবে আমাদের জাতি-পঠন জে শূরের কথা, বৃজ-বেশের অন্যে একথা ভাবিলে মাথা
টোকা লাগাইয়া বলিয়া দিবে যে, আছে মাথা উঠু করে চলতে পথো। (বাঙালীর
বাক্যমালা)।

জাতীর বিশেষত্বকে নজরুল জাতীয়তায় একটি বড় অঙ্গ বলে মনে করেছেন। অন্যকে
অনুকরণে যে মনুষ্যের হারাতে হয়, বিজাতীয়তা যে জাতীয়তায় পরিণতী, তা তিনি সুস্পষ্টভাবে
বাত্ত করেছেন :

বিজাতীয় অনুকরণে আমরা কবেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া কেনিতেছি।
অবিকার্য বলেই আমাদের এই অঙ্গ অনুকরণ হাস্যাম্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া
হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ডালোবিলকে ডালো বলিয়া মানিয়া লওয়ার আদ্য, নিজের
শক্তি ও জাতীয় সভ্যকে নেহারিয়া খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব
হারানো মনুষ্যের সমস্ত অবমাননা। (সত্য নিকা)।

আমাদের জাতীয় অনুভূতিতে কোন প্রকার আঘাতও তিনি সচা করেন নি। এদেশবাসীর
প্রতি ইংরেজের যুগা এবং উপেক্ষার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহাঙ্গার করেছেন। ভারতীয়দের মনুষ্যত্বকে
স্বীকার করতে ইংরেজরা যে কুণ্ঠিত, ইংরেজের এই স্বর্বরোচিত স্বভাবকে কবি তীগ্রজভাবে
তীব্রভাৱে করেছেন। এগুলিকে তিনি আমাদের জাতীয় চেতনায় প্রতি আঘাত ও অবমাননা বলে
মনে করেছেন।

ধর্ম এদেশবাসীর চরিত্র এবং মনের একটি মিশ্রাঙ্গ-শক্তি। নজরুল-প্রতিভা তাই ধর্ম সম্পর্কে
উদাসীন বা নিষিকার থাকতে পারে নি। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য এবং শক্তি দিয়ে তিনি
যুগজীবনকে সম্বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, যুগচরিত্র এবং যুগমানসকে পরিমার্জিত ও সুস্থ করতে
চেষ্টা করেছিলেন। নজরুলের মধ্যে যুগ-নিয়ামক শক্তির এ এক অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। ধর্ম বা
ধর্মের বাহিরের কাঠামোটাকে তিনি জাতীয়তায় অঙ্গ বলে স্বীকার করেন নি। যে মানবধর্ম
বা মানবতা ধর্মের স্বরূপসত্য, তাইকেই তিনি জাতীয়তায় পণ্ড বলে মনে করেছিলেন। যে কোন ধর্মের
পণ্ডীর ভেতরে থেকেও মানুষ্য এই মানবতার মধ্যে উৎসাহ হয়ে এক জাতিতে সংহত হতে পারে।
তিনি বলেন :

হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাপ্রগলভদের সীমাহারা
যুক্তির মাঝে পাড়াইয়া—মানব!—তোমার কণ্ঠে গেই সৃষ্টির আদির বাণী কুণ্ডে দেখি।
বল দেখি, 'আবার মানুষ্য ধর্ম'। দেখিবে, জনপিকে সার্বভৌমিক সাক্ষ্য আকুল স্পন্দন
কাঁপিয়া উঠিতেছে। (চুঁংবার্গ)

ধর্ম কখনো সভ্যতার মানবধর্মের বিরোধী হতে পারে না। কিন্তু একে যারা স্বাধীনসিদ্ধির
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তাইরাই একে মানবতার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তিনি
ছিলেন এই ধর্মীর স্বাধীন এবং পৌনঃপুনিক সম্পূর্ণ বিরোধী। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর এই উদার পরা
নির্দেশিত হয়েই 'ধর্মকেতু' পত্রিকার লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্যের মধ্যে :

‘ধুমকেতু’ কোন সাম্প্রদায়িক কান্না নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় কর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা কাঁকি কোথানে তা দেখিয়ে দিবে এর পলন-বুজ করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে বেঝানে প্রাণের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য হিংসার দুশমনীর ডাব আনে না। বার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ধ্বংস করতে পারে না। (আবার পথ)।

এই উদার মানবধর্ম বা মানবতাবাদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে নজরুল হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছেদ এবং হানাহানিকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ধর্মের মূল শিকাকে উপেক্ষা করে ধর্মের নামে উন্মত্ততা, মূখংসতা এবং কাওজাদহীনতাকে তিনি ধ্বংস করেছেন। ধর্ম যদি মানুষকে পুণ্য শিকা দেয়, মানবধর্মকে বিসর্জন দিয়ে বাহিরের আচার-বিচারই যদি তার কাছে বড় হয়, তবে তা প্রকারান্তরে অধর্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। সত্যাকার জাতীয় চেতনা বা জাতীয়তাবোধ থেকেই এই উদার মানবধর্মের অনুভূতি কবির মনে জেগে উঠেছিল। তিনি এটা সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদবীড়িই এতদিন ধরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উদ্দেশ্য সফল করেছে, এদেশের মানুষকে স্মৃতি একজাতির বুনিরাদে বাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ বৃত্তি-সংগ্রামে জরী হতে দেয় নি। তাই, শুধু, ধর্ম, গোষ্ঠি বা শ্রেণীগত সংকীর্ণতাকে অভিক্রম করে বৃহত্তর এবং মহত্তর মানবধর্মে দীক্ষিত হতে পারলেই এদেশে এক মহাজাতির সৃষ্টি সম্ভব। বুদ্ধ মানবতার উদার তীর্থে হিন্দু মুসলমানের মিলিত একটি অখণ্ড জাতিসত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং তখনই তারা চির-স্বাধীনতার লক্ষ্য উপনীত হবে—এই ছিল কবির বিশ্বাস। তাই হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, ধর্মীয় মৌড়াবি এবং মানবতাবোধের অভাবকে তিনি জাতীয়তার বিরোধী বলে মনে করতেন এবং এগুলির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীও ছিল সংগ্রামবুধর।

এই মহামানবতার উপলব্ধি কবির প্রকৃতিসিদ্ধ এবং কবিপ্রাণের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। মানুষের জন্ম প্রাণন্তরা দরদ এবং তার আবেগবর প্রকাশ অনেকগুলোই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। কবিসুলভ সরলতা, মানবপ্রীতি এবং বিশ্ববোধ তাঁর কাব্যে অমলোচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কবির মানবপ্রীতি এবং জাতিপ্রীতি একই অনুভূতি সত্তা—অবিভাজ্য, অচ্ছেদ্য। জাতিকে ভালোবেসেই তিনি সর্বমানুষকে ভালোবাসতে লিখেছিলেন। নানা ধর্মের ও শ্রেণীর মানুষে গঠিত তাঁর জাতির প্রতি উদার প্রেমই তাঁকে মহামানবতার পূজারী মানবপ্রেমিক কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ বর্ধা দান করেছিল। তাঁর ‘রক্তবকন’ গ্রন্থের ‘বদ্রি ও বসজিৎ’ এবং ‘হিন্দু-মুসলমান’ শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটিতে একঘাঙলির মাঝারি বুঝে পাওয়া যায়। সত্যাকার জাতীয় চেতনার পরিপন্থী বলে নজরুল ধর্মের ভগ্নাবিকে সহ্য করতে পারেন নি। জীবনে এবং ধর্মে ভগ্নাবি, কৃত্রিমতা এবং কুটিলতা এদেশের জীবনকে কতখানি পঙ্কু করে ফেলেছে, তার নির্বৃত্ত চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। কেননা তিনি থেকেতে পেরেছিলেন:

-----সারা দেশটা ডরা আর এক বিরাট উন্মাদলীলা, শুধু বজিচ্ছল্লের প্রকাশ আর
জীবের ক্রন্দন। বেঝানে বড় বোকানপাট, ধন-সংসার, শাক-সবজি, সকলের মাঝে এর
বিরাট ভগ্নাবি, ধর্মের নামে কাঁকিরাতি। (আজ চাই কি)।

তাই প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবানের নাম বুঝে এনে যারা শরভামের ডাখে জীবন পূর্ণ করে কেবল কপটভাব, প্রতারণা, পুণ্য নৌকিকভাব বহন করছে, বিবাহের বিশ্বাসলী বহুনিষ্ঠুর আঘাত তাদের অহংকারকে চূর্ণ, গিয়েপবিত্র করে না? এ অমায়ের পাশবলীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে? (ঐ)।

এইভাবে তৎকালীন যুগজীবনের ক্রোড় বিকৃত রূপ তাঁর রচনার নির্ভুতভাবে কুটে উঠেছে। জীবনের এই বিখ্যা, পাপ এবং পঙ্কিলতাকে পুড়িয়ে-গুড়িয়ে স্তব-সবল, নিষ্কলুষ জীবন গড়ে তুলতে হবে—তাই প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর বিদ্রোহের, বিপ্লবের। তাই তিনি চাষীর রূপকে বলেছিলেন:

ওগো আমার ওস্তাদ চাষী, তুমি ভোমার সাধের জমিতে শোনার কল কলার আকাঙ্ক্ষা বসি করে থাক, তা'হলে ভোমার গেমানে আকর্ষণ কণ্টক দুইকীটের বাসা পুখে রাখলে চলবে না। সব সাক করতে হবে। সব জমি গুড়িয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে জে কনবে তাতে পরিপূর্ণ নবজীবনের পরিপুষ্ট কল। (ঐ)।

তাঁর এই রূপক-স্ট্রীর মধ্যে যে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ইচ্ছিত স্বনিষ্ঠ চায়ছে, তা নিছক রাজনীতি-চিন্তার কল নয়। তিনি একটি বুদ্ধ, উন্নত, বলিষ্ঠ, কৃৎজারবৃত্ত, ত্যাগপ্রবৃত্ত জাতীয় জীবন কাহনা করেছিলেন। এই জীবনের পরিপটী বা-কিছু, তাঁর বিচ্ছিন্নে ছিল তাঁর বিদ্রোহ—তথ্যবাহ্য বাজ্রোহ তা নয়। এই বিদ্রোহ, তথা বিপ্লবের মাধ্যমেই তিনি জাতিকে তাঁর স্বকীয় সত্য স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করতেন।

নজরুলের লেখনী জাতীয় চরিত্রের লোমগুণ উদ্ঘাটনে যেমন তৎপর ছিল, তেমনি তাকে সত্যকার জাতীয় চেতনার তিস্তির ওপরে স্বপ্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম ছিল। উপর ধর্মবোধ, স্বকীয় জাতীয় বিশেষত্ব, নিষ্কলুষ স্প্রেপ্রন, বলিষ্ঠ স্বাধীনচিত্ততা এবং তাঁর আত্মবিশ্বাসজ্ঞানে সবুজ একটি উন্নত জাতীয় চরিত্রের গঠনে তাঁর কবিকমতা নিয়োজিত ছিল। এইভাবেই তাঁর যুগের প্রতিভার যুগ-নিরাকর শক্তির অভিব্যক্তি ঘটে। তাই, যুগবাস ও যুগচরিত্রের রূপায়ণেই শুধু নয়, যুগের বন ও চরিত্র নির্মাণে তাঁর সাহিত্য সর্বাধিক শক্তির পরিচর দিয়েছে। শাস্ত্রিত বাঙালীর চরিত্র-মানসে বিংশ শতকের এই সংযোজন নজরুল-কাব্যের মাধ্যমে যতটা সম্ভব ও সার্থক হয়েছে, অন্য আর কিছুতে তা নয়। বাঙালীর প্রতিভা ও জীবন ধর্মের এক বিশেষ বিংশ শতকীয় বহিঃপ্রকাশ শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করেছে নজরুল কাব্যে। তাই, বাঙালীর জাতীয় কাব্যের আধুনিক পর্বে নজরুল কাব্য উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্মকর রত্নে লীপাবান।

[তিস্ত]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বায়ে স্বাধীনতার জন্য যে উন্মাদনা এবং পরাধীনতার জন্য বিক্ষোভ, নজরুল-কাব্যে জ্বলন্ত একটি শৈল্পিক বাণীর প্রকাশ। আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন-পরমায়ের প্রধান দিক, বা তৎকালীন চিন্তানায়ক, ডাবলী, জাতীয়তাবাদী, স্প্রেপ্রনিক,

বিশুবী ও কবীদের প্রাণ আলোড়িত ও বখিত করেছিল, তাইই প্ৰাচ্য অতিব্যক্তিগে নজরুল-কাব্য পরিপূর্ণ। স্বভাৱঃ উপবহাদেশের জীবনধাৰার সঙ্গে গভীৰভাবে সম্পৃক্ত হৱে নজরুল কাব্য ইতিহাসের একটি স্বাৰী ও মূল্যবান সম্পদ। সেই যুগের ইতিহাস ও পৰিপ্রেক্ষিত তাঁৰ আশ্চৰ্য পানিত ও দীপ্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিল। তাঁৰ স্বাধীনচিত্ততা, নিষ্ঠাকতা, বন্ধিত্ব, ত্যাগ ও সংগ্ৰামী চৰিত্ৰ তাঁৰ কাব্যকে এখন এক বীৰবৃদ্ধ বৈশিষ্ট্য দান করেছে, যা তাঁৰতীৰ অন্য কোন কবিত্ব কাব্যে অনুপস্থিত। তাঁৰ ‘বিত্ৰোহী’ কবিতাৰ দুবিনীত উচ্চতা, উজ্জ্বল উন্মাদনা এবং বিস্ময় আঘাত অগ্নিশাৰী বিচ্ছুরণ তৎকালীন পৰিবেশ-সৃষ্টি তাঁৰ অনন্য ব্যক্তিত্বই বহিঃপ্রকাশ। ‘বিত্ৰোহী’ কবিতাৰ কবিত্ব আত্মপলঙ্ক বা অহংবোধ কোন আধ্যাত্মিক জীবনমৰ্শন, কিংবা বোধি বা নিষ্ক কবিত্বচেতনা কি?—বরং তা বহিৰিশ্বের পট-প্ৰেক্ষিতে কবিত্ব জাতীয় অনুভূতি বা যুগচেতনাই প্ৰতিফলিত। জাতিৰ পৰাধীনতাৰ অসহনীয় বেদনা, তাঁৰ চিত্ৰ-বন্দীশাৰী তীব্ৰ কোভ কবিত্ব বোধে অপৰিসীম আত্মপলঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল। এই শক্তিবলে পৰাধীন বিশ্বকে বিংবস্ত করে নতুন স্বাধীন জগৎ গড়ার জন্যই কবিত্ব এত বিকোভ এবং উন্মত্ততা, প্ৰচণ্ডতা। তিনি যখন বলেন:

বহাবিশ্বের মহাকাশ ফাটি’
চত্ৰ-দুৰ্ঘ-গ্ৰহ-ভাৱা ছাতি’
তুলোক-মূলোক-গোলোক তেদিয়া
খোদাৰ আসন আৰণ ছেদিয়া
উত্তিরাছি চিত্ৰ-বিশ্বাৰ আনি বিশ্ব-বিধাত্ৰীৰ।

তখন একথা মনে করা যায় না যে, নিছক তত্ত্বজ্ঞানীৰ মতো তিনি সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ‘আত্মানা’ বিদ্ধি’ প্ৰচাৰ করছেন। তাঁৰ এই আত্ম-আগতি, অহংপ্ৰচাৰ একাৰণেই, —‘আনি উপাতি’ কেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টিৰ মহানন্দে’। একাৰণেই কবিত্ব এই আত্মপলঙ্কিতে প্ৰোক্ষুল ব্যক্তিত্বের এখন অত্যুজ্জ্বল বিদ্যা-বিকাশ, অথবা তা ‘খোদালী বিধিৰ বন্ধ ভিন্’ করার জমাই—যে খোদালী বিধি তাঁৰ জাতি এবং দেশের নলাটে চিত্ৰ-পৰাধীনতাৰ অনপনের কলংক লেপন করেছে।

প্ৰাণধৰ্মের দিক থেকে নজরুল একজন শাক্ত কবি। মানবতা, তথা জাতিৰ মুক্তিৰ জন্য শক্তিব সাধনাকেই তিনি অৰোৰ বলে মনে করেছিলেন। শক্তিব দ্বাৰাই পৰাধীনতাৰ শৃংখল মোচন করতে হবে, বিদেশী শাসকদের নিকটে অনুঘাত বিক্ৰয়ের দ্বাৰা অথবা কল্পণ কাকুতিৰ দ্বাৰা নৱ। এইজন্য তাঁৰতবাসীৰ বা বাঙালীৰ ভাগ্য বিপৰ্যয়ের প্ৰতিকার করতে গিয়ে তিনি এই শক্তিব দ্বাৰা পৰাধীন বিশ্বের রূপ পৰিবৰ্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই মহাকল্পনার জপাৰণে মহা-প্ৰলয়ের প্ৰয়োজন এবং এমন একটি বিত্ৰোহী চৰিত্ৰের সাধনাই তা সম্ভব, যে সকল যুগের উচ্চত ও দুবিনীত মানবশক্তিব পুজীভূত বহিঃপ্রকাশ। জাই হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের সকল শক্তি-কল্পনাকে কবি তাঁৰ বিত্ৰোহী-মুতি রচনার ব্যবহার করেছেন। ‘বিত্ৰোহী’ এবং ‘দুৰ্ঘকটু’ কবিতাৰ তিনি এই চৰিত্ৰ কল্পনার আশ্চৰ্য সকলজ্ঞৰ পৰিচয় দিয়েছেন। তাঁৰ বিত্ৰোহী বিশ্বিত্ৰোহী—বিধাতাৰ ঋণখেয়ালে যে বিশ্ব দুৰ্ঘলের পক্ষ, অবহেলিত-অবহানিত্তে অমৰ্শন জপাৰণ, সেই বিশ্বের বিক্ৰমই তাঁৰ বিত্ৰোহ। স্বভাৱঃ বিশ্বচেতনাই মহত্ত্ব অনুপ্ৰেৰণাই তাঁৰ বিত্ৰোহী-

হৃদয়ের পরিকল্পনা ওতপ্রোত—ভুবুঝাৰ বাজটৈনতিক চেতনা এৰ বুলে নহ। এইজন্য বিদ্রোহী
বৃষ্টিৰ বজা বিনুৰায়েৰ অকল বীত দিহে হিঁড়তে চায়, নবলহীৰ বহানলৈ অধীন বিনুকে উৎপাটিত কৰে
কেলতে চায়, বিনুভেৰণে বানৰ-বিছৰকেউন উড়িয়ে দিতে চায়। তাই বিদ্রোহী বহে,—

আৰি জানি জানি এই গুটীৰ কীৰ্তি, সৰ্ব্ব ই চাভুৰী

বিৰি ও নিৰবে লাৰি মেৰে ঠুকি বিৰাতাৰ বুক হাতুড়ি।

আৰি জানি জানি এই ভূৰো ইশ্বৰ দিহে বা হৰনি হৰে তা'ও।

তাই বিনুৰ আৰি, বিদ্রোহ কৰি, নেচে নেচে নিই পৌকে তও।

(ধুবকেতু : অগ্নি-বীণা)

এই পক্ষিৰ সাধনা কৰি হিন্দু বা ইসলাম ধৰ্মৰ বহো ঘেৰানে যতটুকু ভাগ, বীৰব, শৌৰ্য,
মানবজা, সাবোৰ সন্ধান পেৰেছেন, তাকেই কাধোৰ ঝংকাৰে অভিনব ঔজ্জ্বল্য দান কৰেছেন।
তিনি কল্প-সেবতায় পক্ষিৰয় এবং সংস্কারলীলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, শ্বেতবসনা অগ্নিপূৰ্ণাকে পক্ষিঅপিবী,
বজাৰবাবিৰী—কল্পে আৰাচন কৰেছেন। সন্ধানের বক্ত পান কৰে বক্ত-পিপাসা নিবৃত্তিৰ জন্য
তিনি কল্পাণী মহানাত্যকে আশ্বাস কৰেছেন :

অনেক পাঁঠা বোৰ খেৰেছিল, নাকলী তোর যাবনি কুণা ;

আৰ পাখাবী, এবাৰ নিৰি আপন ছেনেৰ বক্তমুণা।

দুৰ্ভনসেৰ বলি দিহে তীক্ষ্ণ এ হীন পক্তি পূজা

দুৰ কৰে সে, বলু মা, ছেনেৰ বক্ত মাগে মা বশভূজা

(যানলহীৰ আগমনে)

এই হিন্দুজা চাবুঙাৰ বহো তিনি দেশবাত্ৰিকার প্রতীক বুজে পেৰেছিলেন, তাই বুললহান হৰেও
তাকে মা বলে তাকতে তাঁৰ এতটুকু বিধাবোধ হয় নি। দেশ-বাত্ৰিকার আগরণে এবং তাঁৰ সন্ধানসেৰ
অভিবলিদানেই আসবে বৃহত্তৰ কল্যাণ, বুক্তি বা স্বাধীনতা—এইভাবে তিনি হিন্দুধৰ্মৰ ইতিহাসকে
কাৰেৰ উপাখান হিচাবে ব্যবহার কৰেছেন। ঠিক তেননি বুলনিৰ ইতিহাসও তাঁৰ কাৰো
পক্ষিৰ প্রতীকে ব্যবহৃত হৰেছে। ইধেৰ কোৰবানীকে তিনি পক্ষিৰ আগরণ বলে চিহ্নিত কৰেছেন।
তাই কনেন : "ওৰে হত্যা নহ আৰ 'সত্য-প্রহ' পক্ষিৰ উষোৰন।" (কোৰবানী : অগ্নিবীণা)।
কবির দৃষ্টিতে বিনি 'বহমান' ; তিনিই 'কল্প'। পক্ষিৰ সাধনাতেই বৰেতে বুক্তি। কেননা, অমলী
হাৰেৰা থিৰ পুত্ৰকে বলিৰ পবিত্ৰ বসন পরিধান কৰিয়ে এবং ইগ্ৰাহীৰ পুত্ৰকে কোৰবানী দিহেই
সত্য এবং বুক্তি লাভ কৰেছিলেন। কবির ধারণা—"সত্য বুক্তি স্বাধীনতা সেবে এই-সে বুল
বোচব।" (ঐ)। এই ভাগ, এই আশ্বাস, এ-ও পক্ষিৰই সাধনা। বোহব্বৰ কবির চোৰে
সেই ভাগ ও বীৰবোৰ প্রতীক, তাই বহোছেন :

কিহে এলো আৰ সেই বোহব্বৰ কাহিনা,

ভাগ চাই, বলিবা কল্পন চাই না।

(বোহব্বৰ : অগ্নি-বীণা)

মোহনরতনের আত্মপর্ষ্য তুলে ধরে কবি মুসলমানকে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন—
ঐতিহ্যের পথে তাকে ডাক দিয়েছেন—যে পথ আগের, পৌরষের, স্বাধীনতার সংগ্রামের অর্থাৎ
এককথার, শক্তির। যেমন:

জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দারী হাঁক
শহীদদের দিনে সব নালে লাল হয়ে বাক্।
নওশার সাজ নাও খুন-বচা আস্তীন,
সমধান লুটতে রে লাশ এই বাসু দিন।

(ঐ—২)

কিন্তু মুসলমান এখানে একটি উপলক্ষস্বরূপ—তিনি গোটা জাতিকেই এই শক্তিস্বরূপ উদ্বুদ্ধ করেছেন।
সংগ্রাম এবং স্বতন্ত্রতাবোধের কথা দিয়েই পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে আবার স্বাধীনতার ভয়-পতাকা
উড়ান করতে হবে। এই পথ শক্তির পথ এবং এই পথেই আসবে জাতীয় জীবনের বৃদ্ধি।
উল্লিখিত ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে তিনি শুধু কাবোব উপাশন করেন নি, হিন্দু
এবং মুসলমানকে নিজ নিজ ধর্মের ঐতিহ্য থেকে শক্তি আহরণ করে এক শক্তিশালী, স্বাধীন
ও অখণ্ড জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছেন। ধর্মকে তিনি জাতীয়তার অপরিহার্য অঙ্গ
বলে স্বীকার না করলেও ধর্মের মূল বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু-মুসলমান সকল সংকীর্ণতার
উর্ধ্বে বৃহত্তর এক-জাতীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে, এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং এই অর্থেই
তিনি ধর্মকে তাঁর কাবোব দ্বান দান করেছেন। এই কারণেই উভয় ধর্মের ঐতিহ্য তাঁকে কাব্য-
প্রেরণা দান করেছিল। এই ধর্মীয় বোধ এবং ঐতিহ্যচেতনা তাঁর কবিধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ
ছিল বলেই তাঁর বৃহত্তর ভাবানুভূতির অনুঘটক হয়ে কাবোব এক নতুন আত্মপর্ষ্য লাভ করেছে।

জাতি বলতে নজরুল বিশেষ ধর্মীয় গভীর মর্যাদা সীমিত কোন সম্প্রদায়কে কিংবা নির্দিষ্ট
আচার-বিচারের দ্বারা সংকীর্ণ কোন গোষ্ঠিকে বোঝে করতেন না। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি মনে-
প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক মহাজাতিকে তিনি এক-জাতীয়তার
সূত্রে আবদ্ধ করার প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তখনো জাতীয়তাবোধ এদেশের মাটিতে বৃহৎ বনস্পতি-
রূপে পূর্ণ-বিকশিত হয় নাই। তার নবোদ্ভিন্ত স্বকর্মার স্বকল্পনটি যেন মুক্ত বাতাস ও শ্রিত
রৌদ্রকিরণের জন্য বাক্য শীর্ণ উড়ান কবেছিল। তার বিশেষ পরিচর্যাই ছিল তখন প্রধান কাজ।
এই কাজে তখন যেসব বন্যবী নিজেদের বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, নজরুল ছিলেন
তাঁদের অন্যতম। কোন ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে সংস্কৃতি-জীবনচর্চা-সহমর্মিতার ঐক্যবদ্ধ,
স্বাধীন ও সার্বভৌমরূপে কোন জাতি বসবাস করতে চাওয়াটাই তার জাতীয়তাবোধের মূল
পরিচয় এবং এই আকাঙ্ক্ষা তীব্র, অদম্য এবং সংগ্রামমুখী না হওয়া পর্যন্ত তার লক্ষ্য দূরপরাহত।
সেযুগে রাজনৈতিক নেতৃগণ, সমাজকর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতা সাফল্যের সঙ্গে এই লক্ষ্যের
দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, কিন্তু কাবোব, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার নজরুল জাতীয়তাবোধের স্বাক্ষর
যতটা ক্ষমতাবোধ এবং সংবেদনশীল কবে তুলেছিলেন, এতটা আর কোন ভাবেই সম্ভব হয় নাই।
বিশেষতঃ বাঙালীকে তিনি এই মতে বতখানি উজ্জীবিত, সজ্জিত ও সংগ্রামী করতে পেরেছিলেন
তার কোন তুলনা নেই। জাতীয়তাবোধ এমন একটি বস্তু, যা সম্পূর্ণরূপে ভাবের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত;

জা বড়টা শিবিড়ুয়ান, ভড়টা কিজিক্যান নয়। সুভাং রাজনৈতিক কর্বকাণ্ডের জাতীয়তাবোধ স্থানিষ্ঠিত ও স্বাধিতাবে রূপ পেতে বতখানি বেশ পার, সাহিত্যে তা নয়। কেননা, রাজনীতির আবেদন মানুষের কর্বকলাপের নিকটে, আর, সাহিত্যের আবেদন মানুষের আচার, প্রাণে, হৃদয়ে। এই কারণে শুধু নজরুলের দ্বারা নয়, সেকালের প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিক-নিপুণ দ্বারা জাতীয়তাবোধ বড়টা বাঙালী-প্রাণে দৃঢ়রূপ হতে পেরেছিল, অন্যান্য ভারতীয়দের প্রাণে তা পারে নি। তাই আশো এই উপন্যাসে বাঙালীই একটি স্বতন্ত্র জাতি, যাকে সত্যিকার অর্থে জাতীয়-তাবাদী বলা যেতে পারে। এর মূলে বাঙালীর উন্নততর সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের অবদানই যে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সেকালে ভারতীয় অপর কোন কবি তাঁর কবিকর্ষের ডেউর দিয়ে জাতীয়তাবোধকে এতটা জাগ্রত ও সকল করে ডুলতে পারেন নি। এমিক থেকে নজরুল নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ। 'বিষের বাঁশী' কাব্যেই তাঁর জাতীয়তাবোধের সর্বাধিক পরিষ্কৃত হয়েছে। এই কাব্যে তিনি জ্বালাময়ী, উদ্গাদনাময়ী বাণীতে জাতির প্রাণে তীব্র প্রেরণা এবং অকুণ্ঠ শক্তির সঞ্চার করেছেন, জাতিকে প্রচণ্ড আকর্ষণে নিয়ে চলেছেন—যেখানে তার জন্য রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, বৃত্তি ও প্রগতি। এখানে তাঁর ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর অব্যবহিত উদ্ভূত মিলিত আবেদনটি সংহত ও পরিপক্ব, কিন্তু আবেদন সূচায় তাঁর উচ্চ এবং স্বাধীন, অকুণ্ঠ শক্তির নিবিড়তায় স্পর্শকতার এবং অস্বাধীনতা। যেমন:

‘বাঁশী বাঁকা হীন অপমান’। হাঁকবে যে বীর তরুণ,—

শিরদাঁড়া বার শক্ত তাজা, রক্ত যাচার অফণ,
সভা-বৃত্তি, স্বাধীন জীবন নক্ষা শুধু মামের,
বোমার হাচায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
সেপের পারে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সভা-বৃত্তি স্বাধীন জীবন নক্ষা শুধু মামের।

(সেবক : বিষের বাঁশী)।

কবির এই সংহত অথচ উদ্ভীষ্ট ভাষা শীঘ্র-শাপিত বহুদীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছে, যখন তা অত্যাচারী শাসক-শক্তির ওপরে বড় গোলাভরূপে হয়েছে উন্নত। কঠিন প্রত্যাঘাতের দ্বারা শাসক-শক্তিকে পরাজিত ও বিভ্রান্তিত করবার দৃঢ় সংকল্প ধ্বনিত হয়েছে সেই ভাষার :

মুখনিলা সে জনবীর বাধা বাজিয়া এ ক্ষীণ বৃকে
অগ্নি হয়ে বা জ্বলেছিল মুন, বিষ উঠেছিল মূখে,
মুখ ন-হানা অত্যাচারীর বৃকে নাজপাখী সম
পড়িয়া অহায়ে হিঁড়িতে চেয়েছি চিংসা-নবরে মম,— (উৎসর্গ : ৫)।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কবি সেনোজ্ঞারের কঠিন শ্রুত গ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য তাঁকে জীবনের সকল সুখশান্তি বিলম্বন দিয়ে, অহ-প্রেরণা স্বকৃত্যের চিকিত্সা করে তিক্ত দুঃখের পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। জীবনের এক কাব্যের দুঃখ-সামাগর কবি জাতীয় জীবনের

এক জাতিসভার সভাপতির বটানোষ প্রসঙ্গী ছিলেন। 'বিষের বীণীক' ভূমিকা কবিতাটিতে কবি তাঁর কাজের জীবনের এই দৃষ্টি-কঠিন ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট সংকেত দান করেছেন :

ভোর ভরে নর শীতল হারা, পাখ-তরুর প্রেম-আগার,
তুই যে ঘরের পাতি-শত্রু, কত শিবের চণ্ড মার।
প্রেম-ঘের ভোর হারাব যে যে

কপাই-কঠিন তুই পাবাণ।

আরো চির-ভিত্ত প্রাণ।

জাতীয় কাব্য হিসাবে নজরুল-কাব্যে জাতীয়তাবোধের শুধু উদ্বোধন, আঙ্গন, বিকাশ বা পূর্বজ্ঞ সাধন হয় না, এই কাব্যের সুরে কবি জাতির প্রাণে সুউচ্চ আশা, উদ্দীপনা, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছেন। কিন্তু তা শুধু কাব্যের কলাকৌশলে বা বোহিনী বারাতোই সম্ভব হয় নি, তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃসহ দৃষ্টির তপস্যা। জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে এই তপস্যার শক্তি দিয়েছিল। তাই সংগ্রামের কণ্টকিত পথে নেবে তিনি এতটুকু নিরাশ বা দ্বিধাবিহীন হন নি, তাঁর মধ্যে অপিকের জন্যও এতটুকু ক্রোধ বা বিরক্তি জাগে নি। প্রাণের অনির্বাণ দীপালোকে তিনি জাতিকে লোকের দিকে পরিচালিত করেছেন, অভয়-ময়ে, বিজয়-ময়ে তার মধ্যে দুর্বর আশাকে সতীব্রিত রেখেছেন। তাঁর এই আশাবাদের সুর শ্বনিত হয়েছে 'বিষের বীণী'র 'বোধন', 'অভয়-ময়', 'আত্মশক্তি', 'জাগৃহী', 'বন্দী-বন্দনা', 'বন্দনা গান', 'বুদ্ধি-সেবকের গান', 'শিকল-পরার গান' ইত্যাদি কবিতায়। তিনি কল্পনার মেবেছেন, যেন সুরাস্রয়ের বুকে — বিপ্লব-বিপ্লব-রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে অস্তর-শক্তির পরাজয় এবং ক্ষেত্র-শক্তির জয় হয়েছে, বিরাট ধ্বংসের বুকে নবসৃষ্টি জেগে উঠেছে। সেনাবাহিনীর যশচান্দ্রাভাসে আত্ম-প্রকাশকে এবং বিজয়ের পরে তাঁর কল্যাণী রূপকে তিনি 'বন্দে মাতরম্' বলে বন্দনা করেছেন। 'জাগৃহী' কবিতাটিতে কবির আশাবাদ এইভাবে অপরূপ রূপ-কল্পনার বৃত্ত হয়েছে।

কবি নজরুলের কল্পনার নবীন বাঙালী জাতিসভার, একটি মৌলিক ও স্পষ্ট রূপ প্রতিষ্ঠাতা ছিল। এইরূপ সম্পূর্ণ অভিনব এবং অনন্যকল্পিত। এই জাতিসভা রাজনৈতিক কূটকৌশলজাত নয়—এদেশে গণজাগরণের উন্নয়ন ধ্বংসাত্মক প্রসঙ্গ-সম্মত। যথার্থ বিপ্লবের সঙ্গে তিনি ভাই চেয়েছিলেন। তিনি 'construction after destruction' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই পথেই যে জাতির সভ্যতার কল্যাণপ্রসূ ও স্থায়ী বুদ্ধি সম্ভব, তা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। জাতির এই প্রসঙ্গ-সম্মত নবসত্তা লাভের মানসিক প্রস্তুতি হিসাবেই তিনি জাতিকে এই বাউ-ময় দিয়েছিলেন :

ধ্বংস দেখে ডর কেন ভোর ?—প্রসঙ্গ নুতন স্বপ্নন বেদন।

আগছে নবীন—জীবন হারা অত্মপরে করতে ছেদন।

ভাই সে এমন কেশে বেণে

প্রসঙ্গ ব'য়েও আগছে হেলে—কবুং হেলে।

ছেড়ে অস্তর পড়তে জামে যে চির-স্বপ্নন।

জোঁয়া সব জরখনী কর ।

ঐ ভাঙা-গড়া বেলা যে তার কিসের ভবে ডর ?

বধূরা প্রবীণ তুলে ধর ।

কাল উষ্মত্বের বেগে এবার ঐ আসে স্মরণ ।

(প্রলয়োন্নয়ন : অগ্নি-বীণা)

বিপ্লবের বধো নিঃসে জাতির নবজন্ম সম্পর্কে কবির সুগভীর অনুভূতি উন্মিষিত ভাবে নিপুণ অভিযান্ত্রিক লাভ করেছে। অত্যাচারী পাশব শাসক-শক্তিকে ধ্বংস করে স্বাধীন জাতির প্রলয়োন্মিত নবসত্তাকে কবি অবলোকন করেছেন সিংহবাছিনী মহিষমর্দিনী মহামাভার অশুপূর্ণ বৃত্তির আগমনীতে। 'আগমনী' কবিতার সুখা-স্বপ্নের বৃদ্ধের বধো এই প্রলয়ের জলকল্পনা জলকাসুরে চিত্রিত হয়েছে। বনুযাঘের মহিষার ডাবর নতুন জাতির নব-উদ্যান যেন মহামাভার বধাত্ম-বাণীতে ঘোষিত হয়েছে এইভাবে :

নাই দামব
নাই অনুর—
চাই নে সুর,
চাই বাগব ।

নজরুল জাতিকে জাতীয়তাবোধে উৎসাহ, স্বাধীনতার যত্নে উজ্জীবিভ, লক্ষ্যমাত্রের আশার উদ্বীপিত এবং সংগ্রামে অভয়-ব্রত দান করেছেন। জাতীর জীবনের ক্রম-গুণি দুর্বলতাকে অপরিসীম করে, চির-পুষ্টিত জড়তা ও ক্রীষকের পাষণ্ডতার বিগলিত করে তিনি কাব্যের সুরে উগীরখের বজ্র জাতীর জীবনকে সকলতার মহাতীর্থে আকর্ষণ করেছেন। এইভাবে জাতীর জীবনের অক্ষর সজীবন-উৎস হয়ে নজরুলকাব্য জাতির অরুণা সম্পদ হিসাবে পরিগণিত।

নজরুল-কাব্যে যুগজীবনের সবস্যা, সংকট, অক্ষমতা ও বাসিন্যের চিত্র নানা রাসে স্পষ্টকট। এগুলি তাঁর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা করেছিল, কেননা সেগুলি জাতীর জীবনকে করেছিল পঙ্ক, নিম্নপ্রাণ ও অর্ধহীন। তাই, তাঁর কবিশক্তির বীৰ্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে যুগ-জীবনের এইসব ক্রম-চিত্রায়ণে এবং তাঁর অপরিস্রবণে। নজরুল-কাব্যের এই যুগচিত্রণ একদিক থেকে তাকে বাঁচি জাতীর কাব্যের চরিত্র দান করেছে। তিনি সর্বল ও স্পষ্ট ছন্দে উচ্চারণ করেছিলেন :

(আজ) ভারত-ভাষা-বিজ্ঞানের বৃহৎ গুরু-সাক্ষ্য-পাঠ্যপত্র,
আর্ডমিনাসে হাঁকিছে নকীব,—কে করে যুগকিল আনন্দ জয় ?
বন্দিত আজ বন্দীত আমি,
নিজিত ভীত সত্তা, বহু রক্ত বাসীত আশ্রয় বাণী,
সচ্ছ-বহনে কবীর কীট, গভীর আচ্ছ-অন্ধকার ।
হাঁকিছে নকীব,—যে মহাভার, চূর্ণ কর ও এ তত্তাপার ॥

(তুর্ক-মিনাস : বিবেক বাণী)

তৎকালীন জাতীয় চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি অংকনে কবির^১ বাস্তব ও সত্য দৃষ্টি উজ্জ্বলতা
আমরা লক্ষ্য করি, যখন কবি বলেন :

হাস্যের এ স্বাভাৱিতা
ভিক্ষুরের এ লজ্জাবৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও বুদ্ধি-গরব।

* *

যুগান্তে ভীষ্ম নীচতা দৈব
প্রের দে ভোমার ন্যায়ের সৈন্য,
শূর্য্যনিভের চুটীতে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।

* *

নিরীষ এ ভেজ-সূর্যে
দীপ্ত করছে বহি-বীর্ষে,
শৌর্য, বৈর্য, মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব।

(উদ্বোধন: বিশ্বের বাঁশী)

যুগ-জীবনের এই সব গ্রামি এবং জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে উপেক্ষা করেই
তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃগণ স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক
স্বাধীনতার যে জাতির স্বাধীন কল্যাণ বা সাধিক সমৃদ্ধি আনতে পারে না, তাঁরা সেক্ষা বুঝেন
নি। কিন্তু নজরুল এইসব দুর্বলতা-মুক্ত একটি বীর্যবান, সংগ্রামশিদ্ধ, আত্মনির্ভর জাতিকে বৈশ্ববিক
ও গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতার তোরণে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভিক্ষুরের ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা,
হীনবীর্যের অক্ষম বুদ্ধি লালসাকে তিনি অবজ্ঞা করেছেন—প্রচণ্ড আহবে অজিত স্বাধীনতা-এনই
ছিল তাঁর কাব্য। নজরুলের কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে তাঁকে সম্মানবাদী বা উচ্ছ্বল
বিরোধী বলে সত্য বক্তব্য করা সম্ভব হয় না।

পূর্বে বলেছি, জাতীয় চরিত্রের অংকনই নজরুলের একমাত্র কাজ ছিল না; তাঁর প্রধান
কাজ ছিল তাঁর গঠন। তাই সকল দুর্বলতা মোচন করে তিনি তাতে শক্তি সঞ্চারের মত উচ্চারণ
করেছেন। কবি বলে তিনি এই দুর্বলতার প্রতিষেধক খুঁজে পেয়েছিলেন—আত্মসম্মতিকে নিয়ে
সবস্ত ভগ্নানি, কলী-কিকির ও রাজনৈতিক জুয়াখেলার অভিজ্ঞানাকে ভেঙে চূর্ণ করতে চেয়ে-
ছিলেন। সবস্ত কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ও লজ্জাতাকে পলাঘাত করেছিলেন। এবং অতঃপর সত্য,
ন্যায় ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে। তৎকালীন, রাজ-
নৈতিক চিন্তাধারার পরোক্ষ বা স্বল্পমতি তাঁর এই পথ থেকে তাঁকে একচলনও বিচলিত করতে
পারে নি। তিনি উগ্র্যব আকাঙ্ক্ষার সেই মহাবিপ্লবীর আগমন প্রত্যাশা করেছেন, যে এই
জ্ঞানানখান চূর্ণ করে আনবে তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত 'সত্যবুদ্ধি'। তাই বলেন :

নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ নাড়ায়?—

শিকলগুলো বিকল করে পারের উলার নাড়ায়,—

বজ্রহাতে জিপ্সোর ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?

নাছাউ-পথের আত্ম-বান্ধব নেই কিরে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ বেধের বাঁচা ?

(সেবক : বিশ্বের বাণী)

অবশ্য মজলুম বুদ্ধির সকল সত্য প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বহাভা পান্ডীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর সর্ব্বথ মিল না থাকলেও তাঁর হৃদয়লব্ধে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। তাঁর 'চরকা'-কে তিনি হিন্দু-মুসলমানের 'বিলম্ব-সূত্র-ডোর' বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মজলুমের জাতীয় জীবন চেতনা অন্যান্যদের থেকে পৃথক ছিল না, বুদ্ধির লক্ষ্য ছিল সকলের সঙ্গে এক। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপারে কূটকৌশলকে তিনি পছন্দ করেনি। কেননা, তাঁর বিশ্বাস ছিল সত্য, ন্যায় এবং আত্মপক্ষের বলে জাতি অবশ্যই এবং অচিরেই স্বাধীনতা অর্জন করবে। এসব কারণে 'স্বরাজ'-কে তিনি সর্ব্বদা জানাতে পারেননি। এর প্রতি তাঁর কোন আশা ছিল না। স্বরাজ-কারীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল এই রকম :

কর্তা হবার সব সবারই, স্বরাজ-স্বরাজ ছল কেবল
কাঁকা ঘেঁষের কুসু-বস্তুর, বুধ সরল আর বন গরল

এবং

বুকের ভিতর ছপাই-নপাই, বুখে বলিগ রাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে ভোদের ক্রোড়ে হচ্ছে দরাজ তাই
'ভারত হবে ভারতবাসী'-র—এই কথাটাও বলতে ভর।
সেই বুড়োদের বলিগ নেত্রা—তাদের কথার চলতে দর।

(বিদ্রোহীর বাণী : বিশ্বের বাণী)

৩য় স্বরাজ-প্রচেষ্টার উত্তাপ ছাড়াও ধর্মের উত্তাপ বা উত্তাপ, শাস্ত্রের অমূল্যত্ব, হিন্দু-মুসল-মানে ভেদভেদ, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ, প্রভু-প্রোথগ, অত্যাচার-অবিচার, শাসন-ত্যাগন ইত্যাদি—বা-কিছু জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় জীবনের পরিপন্থী, মজলুম তার উপরে ছিলেন ঝড়ুগহস্থ। 'বিশ্বের বাণী' এবং 'ভাঙার গানের' কবিতাগুলিতে তাঁর এই সংসার-কাবলা তীব্রতা লাভ করেছিল। সেখানে নবজাগ্রত জাতির আশ্রয়ে এবং আশ্র-প্রতিষ্ঠা সাধনাকে অনেক স্বার্থান্বেষী চক্র বা ব্যক্তি নিজেদের সুবিধার বিনিয়োগ করার কূটকৌশল প্রয়োগ করেছিল। কবি মজলুম তাদের এই কূট চক্রান্তকে গোচ্যর কণ্ঠে প্রকাশ করেন এবং তাদের বিরক্তিকর হন। সত্যাকার ক্রোধপ্রেরিত কবি ছিলেন বলে তাঁর সরল ও বলিষ্ঠ উক্তিগুলিতে জাতির মূল আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়েছিল সঠিকভাবে। উপদেশের ফলে যে কথাগুলি তিনি জাতিকে তুলিয়েছেন, তাতে তাঁর এবং বুকের বাসনাই সুপরিষ্কৃত হয়েছে। সত্য, ন্যায় ও কল্যাণকে গ্রহণ করে, মানবতার ধর্মে নীকিত হয়ে নিরকলুষ কর্ম ও কর্তব্য সংগ্রামের রহা নিয়ে, আপন বীর্যে অস্তিত্ব স্বাধীনতাই তাঁর কাব্য ছিল। এই সংগ্রামে জাতি যে নিশ্চিত জরী হবে, তাতে তাঁর বিশ্বাসই সন্দেহ ছিল না। তাই বলেছেন :

সভা যদি হয় প্রমত্ত হোক,
কর্ম যদি না হয় ছল,
ধর্ম-মুখে না হয় জল,
সভার জয় হবেই হবে,
আজ নয় কাল বিলবে কল,
আজ নয় কাল বিলবে কল।

(সভাসভ : বিশ্বের বাণী)

বুগের মানসিকতা এবং যুগচরিত্র সংকলন নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির তুলনা নেই। জাতির মানসিক হীনতা এবং জাতীয় চরিত্রের নাগা দুর্বলতা কবিকে বিমূঢ় করে তুলেছিল। তিনি ব্যক্ত বিকল্প এবং কঠোর তিরস্কারের দ্বারা এগুলি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। কেননা, এসবের থেকে মুক্তি না পেলে সভ্যতার মুক্তি সম্ভবপরায়িত বনেই তিনি মনে করতেন। পরাধীন জাতি সকল মানসিক ও চারিত্রিক শক্তি হারিয়ে আজ হীনতা হীনতার অভয় গলায়ে নিপতিত—তার মুক্তিচিন্তা কবিকে ব্যাধা ব্যাকুল করে তুলেছিল। কবির একটা কথা থেকে জাতির তৎকালীন দুর্বলতার করুণ চরমতা আমরা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করতে পারি:

আজ লানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোনার
লাখি খায় আর চাঁচায় শুণু, 'লোহাই' হজুর, মলাব মলাব'।

(আনন্দময়ীর আগমনে)

কিন্তু কবি নিরস্ত বা নিরাশ হননি। তিনি দেশের সংগ্রামী সৈনিক, নিঃস্বার্থ কবী এবং নিষ্ঠীক তরুণদের উৎসাহ-উদ্বীপনা দান করেছেন। তিনি জাতির জন্য আসন্ন মুক্তির বিজয়গাথা রচনা করেছেন, তার আত্মশক্তির উদ্বোধন করেছেন এবং তাঁকে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রেরণা দিয়েছেন। কবির পথ ছিল সুচিহ্নিত, প্রাচ—জাতির জন্য অপরিণীত বনবোঝ তাঁর এই নিজস্ব পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে দেয় নি। পরাধীন, লাহিত ও নিষ্পেষিত জাতির জন্য তাঁর প্রাণের সর্বাঙ্গিক বেনাবোঝ তাঁকে বিদ্রোহীর খাড়া তুলে দুর্গম পথে দুঃস্বা সাধনায় স্রুতি করেছিল। কবির জাতিসত্তার অনুভূতি ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক এবং সংস্কারভাত বটে, কিন্তু এই অনুভূতি তাঁর জীবিতা তাঁকে উদ্ভাস্ত করে তুলেছিল—তাঁকে শিরচিহ্নে কাব্যলোকের জন্য প্রেম ও সৌন্দর্যের মধু আহরণ করতে দেয় নি। তাই নিজের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাব্যকথিত চিরন্তন কাব্যানিলের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি। বুগের লবীকে উপেক্ষা করে এবং জাতির বিবর্তনের উপশব্দ না করে তিনি বৃহত্তর জন্ম ও শক্তি পান নি। তাই নিখিয়ার তিনি বলতে পেরেছেন:

পরোয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি বুগের হজুর কেটে গেলে।
সাঁঝার উপরে অনিচ্ছেন বধি, রবেছে সোনার নত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খাঁদ তেত্রিশ কোটি বুকের গ্রাস,
বেন লেখা হয় আবার বক্তৃতাখার জন্মের সর্বনাশ।

(আবার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা)

জাতির জন্য। এই আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং স্বদেশীয় বৈশিষ্ট্যের সত্যিকারভাবে তাঁর কাব্যকে
 বাঁচি জাতীয় কাব্যের স্বর্বাঙ্গকে ভূষিত করেছে। এই বৈশিষ্ট্যের কবির স্বভাবের মধুকোষকে বিক-
 কোষে পরিণত করেছিল এবং তার উৎসাহের তাঁর সকল কবিকর্মেই আনুভূতিকভাবে লক্ষ্যিত হয়ে-
 ছিল। তাই তাঁর জাতীয় চেতনাবলুল সকল কবিতার তীব্র কর্ণধারী স্বভাব মধো ককণ হাম্বিলী
 বৃন্দা, উন্মুক্ত অরণ্যের স্বরভঙ্গি স্বরভঙ্গি হাহাকাধ্বনি বেজে উঠেছে। স্বরভঙ্গির এই উপ-
 টীকনাম বিবরণ্যই তাঁর কাব্যপ্রবাহে অসংখ্য উন্মুক্ত স্বাক্ষর জাগিয়ে তুলেছে। এই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ,
 এর সৌন্দর্য উৎসের সন্ধান আমরা পাই তাঁর 'সার্বভৌম' ও 'সর্বস্ব' কবিতাগুলিতে। কবি দেখতে
 পেরেছিলেন তাঁর চারদিকে অসংখ্য, গরীব, নিপীড়িত, পতিত, শোষিত মানুষের ভীড়। অথচ
 এরাই তাঁর জাতি—এদের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য ওজস্বী, এদের স্বভাবের সঙ্গে তাঁর স্বভাব
 একই খাতে প্রবাহিত। তাই এই 'স্বদেশীয়' মূল্যবোধ অসংখ্য সত্যের আনন্দ-বৈশিষ্ট্য অনুভূতির
 সঙ্গে কবির অনুভূতির কোন পার্থক্য ছিল না। তাদের আশা, স্বপ্ন, স্বাধীনতা ও আনন্দের সঙ্গে কবির
 কোন বিচ্ছেদ ছিল না কেননা কবিও এদেরই একজন। জাতির সঙ্গে এই একাত্ম একাত্মবোধ
 নজরুলের জাতিচেতনার স্বাক্ষর। তাঁর এই চেতনার মধো জাতি কোন কৃত্রিমতা, পদনুগতিকতা
 অ অপ্রাকৃত কিছু নেই। অনুভূতি ও প্রেরণার এই অকৃত্রিম, অভিজ্ঞানরূপ এবং স্বতঃস্ফূর্ত বচি-
 প্রকাশ তাঁর জাতীয় ভাবধারার কবিতাগুলিকে যথার্থ কাব্যগুণে বহিত করেছে—সত্যিকার কাব্য-
 সত্য ও মহত্ব বহিমানিত করেছে। স্বাধীনতার দ্বারা সীমিত, রাজনীতি এগুলির বৈশিষ্ট্য কাব্য
 স্বভাব এবং নিম্নগুণে কোন কবির মানস প্রবেশ করতে পারেনি। এইভাবেই এগুলি
 স্বদেশীয়তার তুচ্ছতাকে অসংখ্য-ভাবের অভিজ্ঞান করে শাপ্ত বচনের গৌরবান্বিত।

জাতির অন্য কবির তীব্র ও স্বদেশীয় বৈশিষ্ট্যের তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে তীব্রতার ও পাবিত কাব্য
 তুলেছিল, কিন্তু কর্ণ বা নীরস করে নাই। জাতির স্বভাবের অন্য দ্বারা দ্বারা তাঁদের প্রতি
 প্রচণ্ড কোষ এবং শাসনোত্তরী শাসনবাহক ও তাঁর স্বাক্ষরকে স্বরূপ করে তুলেছিল। কবিতার
 একটি চরণে কবি আ স্বদেশীয়তা বাক্য করেছেন: "জুজু-বোম্বেরে কল্ল বাগীর কৌপার প্রাণে কল্ল
 কলী।" (পথের দিগা: কবি-মনসা)। তাই দেখা যায়, কবি কখন কখন এবং ক্রমাগতভাবে
 কবিতার পদনুগতিক নির্বাক পথ ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি আঘাত চানতে শুরু করেছেন। কবির
 প্রাণের কথা তাই সোজাসুজি দেখানো মূখে আত্মপ্রকাশ করেছে—অসংখ্য কবি-
 আশ্রয়ে তা চিরাচরিত কাব্যকবিতা লাভের প্রকাশী হয় নাই। কিন্তু কবিজগৎ স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম
 অভিজ্ঞানরূপ তাঁর স্বাক্ষর অনির্বচনীয়তার স্বাক্ষর অসংখ্য-উত্তীর্ণ, কবিতাগুলির নিম্নত্ব রসে তার
 চিরকালীন সত্যবতার চির-স্বাধীন। কবির "ভাঙার গান" কাব্যের 'ভাঙার গান,' 'স্বদেশীয়
 স্বদেশীয়,' 'স্বদেশীয়-গান,' "বিশ্বের স্বাক্ষর" কাব্যের 'স্বদেশীয়,' 'স্বদেশীয়-গান' এবং
 "অগ্নি-বীণা" কাব্যের 'স্বদেশীয়তার স্বদেশীয়' ও আরো অনেক কবিতার এই স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যগুণ
 কর্ণ হতে কটে উঠেছে।

স্বদেশীয়: উল্লেখযোগ্য যে, সত্যিকার স্বাক্ষর চিরস্বদেশীয়, তাঁরা কবি নজরুলকে 'স্বদেশীয় কবি'
 বা 'স্বদেশীয় কবি' বলে স্বাক্ষর দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে নজরুলের যে জনপ্রিয়তা আজ আর
 নেই, কেননা সে জনতাও আজ আর নেই। এখন নজরুল উত্তীর্ণ রাসে তাঁরা স্বাক্ষর করেন
 কিন্তু স্বদেশীয় জনতা স্বদেশীয় জাতি কবির নিকট থেকে যে স্বাক্ষর, স্বাধীনতা ও প্রগতির স্বাক্ষর

লাভ করেছিল—যা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আত্মপ্রবৃত্ত করেছিল, সংগ্রামী চেতনা দিয়েছিল—
সে আতি কিশোরী থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয়েছে, না আত্মাঙ্গের মধ্যে আছে বেঁচে আছে
আতি হানের দ্বারা গীর্জিত বটে, কিন্তু কালের দ্বারা নয়। জাতীর চেতনাসম্পদ আতির প্রাণের
স্বাধীনতা, কল্যাণ আর সংগ্রামের স্বর কোনদিন বিলীন হয়ে যায় না। যতদিন সে জাতীরত্নের
শ্রদ্ধা করবে, আত্মসম্মতি টিকে থাকবে, ততদিন তা চির-প্রেরণার উৎস হয়ে রইবে জগৎ কাছে।
যুগে যুগে সেখান থেকে সে আত্মশক্তি সংগ্রহ করবে, সত্যবোধ আহরণ করবে এবং নিজস্ব জাতীর
সম্মান বহিরাবিস্তৃত হবার সাধনার লিপ্ত থাকবে। কোন জাতীরত্নাবাদী বাঙালীর কাছে নজরুলের
এই কথাগুলি কোনদিন পুরাতন হতে পারে না :

তুই নির্ভর করু আপনার পর,
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধরু
ওরে, যে যায় যাক সে, তুই শুধু বল 'আবার হয়নি নয়।'
বল 'আমি আছি,' আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-নূরুজ।
বল নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল সাঁতে: সাঁতে:, জয় সত্যের জয়।-----

(অভয়-বহ্নি: বিশেষ বাঁনী)

এগুলি কোন দর্শন বা উদ্ভুক্তি নয়—নজরুলের মতে বাট্ট নিয়ে যে সমস্ট্রী, ব্যক্তি নিয়ে যে জাতি,
সেই ব্যক্তি বা জাতির মর্মে আশা, শক্তি এবং আত্মবোধের সন্ধানমাত্র। প্রেমবোধ যেমন চিরন্তন,
এই আত্মবোধও ব্যক্তি বা জাতির মনে তেমনি চিরন্তন—এটাকে চাড়লে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, জাতির
জাতির থাকে না, যেমন প্রেম চাড়লে থাকেনা মনুষ্য। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আবার
এসব ক্ষেত্রে দেখতে পাই, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ভাবনোক্তের মধ্যে নয়।

পৃথিবীতে মনুষ্যের রূপান্তর-পরিবর্তন বটে, অনেক প্রয়োজন করিয়ে দায়, আবার নতুন প্রয়োজন
আসে, কিন্তু সত্য আর ন্যায়ের প্রয়োজন কুমার না। সত্য আছে বলেই বিখ্যাও আছে, বিখ্যা
সঙ্গে সংগ্রাম আছে। নজরুল সেই বিখ্যার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন সত্যের জন্য, সত্যকে
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এর মধ্যে চিরন্তনের আছে কিনা, এটা চির মানবের মনোপত্ত বসনা
কি না, তার মূল্যবানুভূতি কি না, মনে হয় তা প্রশ্নের অতীত। নজরুল বলেছিলেন:

এস বিদ্রোহী বিখ্যা-সূচন আত্মশক্তি-বৃদ্ধ বীর।
আনো উল্লস সত্য-স্বপ্ন, বিজয়ী স্বপ্নক ন্যায়-অসির।

(আত্মশক্তি: বিশেষ বাঁনী)

নজরুলের এই সত্যবোধ জাতীর সত্যবোধ থেকেই উপজাত। তাঁর বাঙালী বা ভারতবাসীকে
সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি তাকে চিরন্তন বৃত্তি নিতে চেয়ে-
ছিলেন। তাই তাকে আত্ম, আত্মনির্ভরশীল এবং সত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কবির এই বাঙালী জাতির সত্যবোধ ভারতীয় জাতি-চেতনার এবং আনো প্রসারিত হতে
বিশ্বচেতনার পরিণত হয়েছে। একন্যায় আবার বাঙালী বিদ্রোহীর বিশ্বজনীন বা চিরন্তন স্বপ্নের

পরিচয় পাই ‘বিরোধী’ কবিজীব। কিন্তু এই বিরোধী যে মূলতঃ বাঙালী, তা চিনতে বা বুঝতে তুল হর না, যখন অকিরাসের বাঁশী শ্যামের হাতের বাঁশরী হয়ে দেখা দেয়, যখন সে ‘শ্রাবণ-পুষ্পন বন্যা’ হয়ে আসে, যখন সে যৌবনভীতু পরীবারার আঁচর কাঁচনির মোহিনী সারার আকর্ষণ করে। এইভাবে কবি এই রূপের রূপকে বাঙালী জাতিসত্তাকে স্বাধীন বিশ্ব-জাতিসত্তার অংশ হিসাবে, বাঙালীর জীবনকে বিশ্বজীবনের একটি বিশেষ দিক বলে উপলব্ধি করেছেন।

শাপুত বাঙালীর সঙ্গে শাপুত বাংলার রূপকল্পনাও কবির জাতিসত্তার অনুভূতি থেকে উপজাত। এই রূপকল্পনার দেশবাত্তকার আনন্দবরী, কল্যাণবরী রূপের পরিচয় আছে। কিন্তু বৃষ্ণ ও জাতির প্রয়োজনে কবি তাঁর রক্তাশী, অশিব-নাশিনী মূর্তিরই আবাহন করেছেন। পৃথিবীর মানব-শক্তি, জ্ঞানের অত্যাচার, নিরীহের কাশুক্ষতা, তওর ইউনুসতা এবং স্বাধিপত্যের নীচতা চূর্ণ করতে—জাতিসত্তার পাপমুক্ত, কলুষহীন, নির্বল মূর্তি রচনা করতে দেশবাত্তার চতী উন্মাদিনী শক্তি-মূর্তির প্রয়োজন বঙ্গলক্ষ্মী, শুভ্রবঙ্গনা দেশবাত্তার কল্যাণী রূপের পূজারী কবি তাই সজ্ঞাধর ধারিণী মানব-মননীকেই তাঁর প্রাণের উপচার ‘বলে বাড়র’-রয়ে নৈবেদ্য দিয়েছেন। বিশ্ব-নশিতা, জগৎ-ভারিণী ভারতবাত্তার বিশ্বমোহিনী রাজরাণী রূপকে কবি যেন কবি-কল্পনার প্রত্যক্ষ করেছেন। এই উদারহৃদয় ভাষতলক্ষ্মীর অংকে কত বিভিন্ন জাতি বৃগে বৃগে আশ্রয় লাভ করেছে—তিনি নিজেকে নিঃস্ব করে, ত্যাগ-তিতিকা-মুণ্ডের দাহনে দগ্ধ হয়ে তাঁর সন্তানদের পালন করেছেন। আজ এই তপস্বিনী দেশ-জননীর সংসারলীলার হিংসা-রেষ-অকলাপ দূর হয়ে আবার পুণ্যের জ্যোতিতে, সূর্যের আনন্দে পৃথিবী পূর্ণ হবে। আদি জ্ঞানের পাদপীঠ এই পবিত্র ভূর্ধে মানবের চির-কল্যাণ, চির-শান্তি নিহিত। কবি এটভাবে গৌরবপীঠ ইতিহাসের আভরণে দেশ-জননীর শাপুত রূপ-বৈভব অংকন করেছেন।

কবির জাতিসত্তার উৎসভূমি ভাষতলক্ষ্মীর পাশে তাঁর চির-মাগরের চির প্রিয় স্ত্রাবরী বঙ্গজননী অবলান করছেন। বৃকে তাঁর অংগা অমৃত নিদ্রাশী নন্দনরী, শিরে বেঘ-চিকুর, চরণে সাগর-শিত্তিনী। তিনি কাল-বৈশাখীতে উন্মাদা, প্রলয়ংকরী মৃত্যুতা, বর্ধার কল্যামা কলসী, পরতে হাস্যমরী, হেবতে লাগাবিলাসিনী, বগন্তে আবরণ-অভিভা ‘কুল-বধূ’। কবি এই বিশ্ববিরোধিনী শাপুত সুলরী বজ্রবাত্তার প্রপত্তি গেয়েছেন :

নবঃ নবঃ নবো
চির বনোরবঃ

বাঙলা দেশ বর
চির বধূর।

*

*

*

এই দেশের বাটি
যে বস যে স্ত্রা
এই বারের বৃকে
যুগাব এই বৃকে

জল ও কুলে কলে,
নাহি তুমুলে,
যেসে খেলে স্ত্রা
সপ্তাত্তর।

(‘বঙ্গেনী গান’ : বঙ্গনীতি)

কবি বাংলা ভাষার এই শাখাজিনী রূপে বৃদ্ধ, তাই তিনি বলেন:

আবার শাবলা বরণ বাঙলা ভাষার

রূপ দেখে যা, আয়ত্তে আর।

গিরি দরী বনে বাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।

(৬৭নং গান: স্মরণ-সাকী)

কবির চোখে এই শাবল-বরণী দেশবাসী কখনো উলসিনী বৈরাগিনী, কখনো গ্রামপথ-বিহারিণী ভীকু বানিকা, কখনো বড়ের সঙ্গে তাওবনুতো উল্লাসী, কখনো বনের মধ্যে সাপ-বাঁক-জালুক নিয়ে জীড়ায়তা। হরিৎ শস্যে তাঁর অঁচল দোলে, ঝিমিতে নুপুর বাজে, সন্ধ্যাতারার টিপ্ জুলে, ভাটিয়ালী বাউল হয়ে গজার শূণ্যনে কান্নায় তাঁর বুক ভেসে যায়। ‘কীর্ত্তন-সাগর-কন্যা’ এই দেশবাসী তাঁর সন্তানদের চিরকাল ক্ষীর-সর দিয়ে, নবীন ধানের মজরী দিয়ে, পাত্রভরা সুধা দিয়ে পালন করেছেন।

কবি নজরুলের কাব্যে এমনি করে শাপুত বাঙলা ও বাঙালী, বাঙালীর যুগমানস ও যুগচরিত্র, তাঁর ধ্যান-কল্পনা-স্বপ্ন-আশা, তাঁর জীবন ও জীবনদর্শন, তাঁর প্রাণ ও প্রতিভার স্বাক্ষর সর্বাধিক ঔজ্জ্বল্যে ও কাব্যরূপে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত। বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের আধুনিক পর্বে নজরুল কাব্যে তাই সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করেছে। বাঙালীর নিজস্ব সম্পদরূপে নজরুল-কাব্য শাপুত মহিমা ও গৌরবে ভাস্বর, অবিনশ্বর।

সমালোচক নজরুল

শাহাবুদ্দীন আহমদ

নজরুল ইসলামের অপরূপ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য। সেখানে যে প্রতিভার সংগে আবেদের পরিচয় হয় তিনি একাধারে কবি, চিন্তাবিদ বনীযী, রাজনীতিক, সমাজ-সংস্কারক, আন্তি সংগঠক, সংস্কৃতি-নির্ধাত্তা এবং সর্বোপরি আত্মসচেতন তীক্ষ্ণ চোখ সমালোচক। নজরুলের এই প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যে-গুলি তাঁর 'মুগাবানী', 'মুদ্রিনের বাত্মী', ও 'কল্পবল' এই তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে ছাপা হয়েছে তাদের সংখ্যা মোট ৩৬টি। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সাহা সৈনিক 'নবযুগ', ও পাকিস্তান 'মুহকেতু'তে লিখিত নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ছটি প্রবন্ধ 'জাগরণী', 'আমি সৈনিক', 'হলির ও মসজিদ' 'হিন্দু-মুসলমান' এবং 'মোহরুর' ও 'বিষ-বানী'—যথাক্রমে ১৩২৭ সালের আশ্বিনের 'বকুল' ১৩২৯-এর কাঙ্কির 'মুহকেতু'তে, ১৩৩২-এর ভাদ্র-আশ্বিনের 'গণবানী' এবং ১৩২৯-এর ভাদ্র-আশ্বিনের 'মুহকেতু'তে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থকারে সংকলিত নয় এমন প্রবন্ধগুলি হল: ১. তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা, ২. রাজবন্দীর জবানবন্দী (কল্প পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত), ৩. বড় পিরীতি বালির বাঁধ, ৪. বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য, ৫. ওয়ের কাব্য ও দর্শন, ৬. বর্ধারস্তে, ৭. আজ চাই কি, ৮. আমার স্মরণ, ৯. সভাবানী, ১০. বার্ষিকতার বাণী, ১১. মুহকেতুর আদি উদয় স্মৃতি, ১২. বর্ষ ও কর্ণ, ১৩. 'কবাইরা-ই-হাকিমের' সুবন্ধ, ১৪. বুলবুল-ই-পিরাজ ১৫. কাব্য আর-পারার আরজ ও ১৬. বাঙলা ও বাঙালী। এছাড়া তাঁর লিখিত কয়েকটি প্রশংসামূলক পুস্তক পরিচিতি আছে। যেমন: আবুল মনসুর আহমদের 'আয়নার প্রেম', মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত 'হান্না-বশি', বেনজীর আহমদের 'বন্দীর বাঁশী', আবুল কাশির-এর 'দিলকুশা', মোহাম্মদ কাসেমের 'আগামীবারে সরাপা', মোহাম্মদ সুলতান অনুদিত 'শেকওয়া ও জবাবে শেকওয়া', সুফিয়া কামলের 'সাঁঝের মাসা', বরদাচরণ মজুমদারের 'পথথারার পথ' ও গিরীশ চক্রবর্তী সংগৃহীত 'স্বপ্নের গান'।

এছাড়া তাঁর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের উপর তিনটি প্রবন্ধ আছে: ১. জনবীপের প্রতি, ২. পতর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব ও ৩. জীবন বিজ্ঞান।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রবন্ধসমূহ ছাড়া নজরুলের অভিভাষণগুলোকে প্রবন্ধ হিসাবে গণ্য করা যায়। কবি আবুল কাশির সংকলিত ও সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভারে' এগুলি মুদ্রিত হ'য়েছে। এই অভিভাষণের সংখ্যা ১২টি: ১. ১৯২৯ সালে এলবার্ট হলে প্রদত্ত প্রতিভাষণ, ২. ১৯৩২-এর সিরাঙ্গপত্তের অভিভাষণ 'ভক্তের সাধনা', ৩. ১৯২৯-এ চট্টগ্রামের বুলবুল সোসাইটির বানপাতের অভিভাষণ 'প্রতি বনজার', ৪. ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের এডুকেশন সোসাইটির প্রতিভা উপলক্ষে অভিভাষণ 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা', ৫. ১৩৪৩ সালে করিমপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রবন্ধ সভাপতির অভিভাষণ 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও', ৬. ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সৈনিক কৃষক

পত্রিকার অফিসগৃহে জনসাহিত্য-সংসদের শুভ উদ্বোধনে অভিভাষণ 'জন-সাহিত্য', ৭. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধন জমিরুদ্ধীন বাংলার মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত শোকসভার সভাপতির অভিভাষণ 'উদ্বোধন জমিরুদ্ধীন বাং', ৮. ১৯৪০ সালে কলকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ইদ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ৯. ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার নিরাপত্তা পাবলিক লাইব্রেরী ও ক্রি বিডিং ক্লব-এর বারেন্ড্‌বাটন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণ 'নিরাপত্তা', ১০. ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কলকাতা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনের অভিভাষণ 'আমাদের পক্ষে আরসমর্পণ', ১১. ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মিলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ 'মধুরম'। একমাত্র "ইসরাইল হোলেন নিরাপত্তার উপর প্রদত্ত ৮ লাইনের ভাষণটি ছাড়া প্রত্যেকটি প্রবন্ধাকারের দীর্ঘ অভিভাষণ। স্বতন্ত্র এগুলিকে প্রবন্ধ হিসাবে গণ্য করাই বুদ্ধি সংগত।

প্রবন্ধ, পুস্তক আলোচনা ও অভিভাষণ বিনিময়ে নজরুলের গদ্য রচনার সংখ্যা বাঁড়ার (গল্প-উপন্যাস, পত্রোপন্যাস বাণ দিয়ে) ৭০টির উপর। এই লেখাগুলিতে ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর নজরুলের সমালোচক স্থূলত মনোভাঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। এ-ছাড়া এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর চিঠিপত্রে তাঁর ঐ সমালোচক দৃষ্টি অনাবৃত।

নজরুলের প্রথম সমালোচকস্থূলত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৩২৯-এর কাউকে 'সওগাতে' প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা'য়। এটা ছিল ১৩২৫-এর কৈশোরে ভারতবর্ষে শ্রীহেতুজুয়ার রায় লিখিত তুর্ক মহিলার রূপ সম্পর্কে বিরূপ আলোচনার প্রতিবাদ। বেশ বাঁধালো তাঁর সাহসী ভাষায় নজরুল ঐ আলোচনার প্রতিআলোচনা করেন। এই ভাষা ভঙ্গীর একটু নমুনা এখানে দেওয়া যাক :

তবে ও সম্বন্ধে এ গরীবের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, New York Herald নামক আমেরিকান সংবাদপত্রের অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার একটা খটকা বেধে গেছে। আজকাল অনেক লেখক ঘরে বসেই জুনিয়ার বেকোন-স্থানের ভ্রমণকাহিনী অসঙ্কোচে লিখে থাকেন, এ একটি নিদারুণ সত্যি কথা। তাঁরা হঠাত বিখ্যাত ভ্রমণকারীর কাছ থেকে শুনে, নতুবা কোন ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে এবং তাতে কিছু ঘরের তেলমগালা সংযোগ করে আবারের সামনে এনে হাজির করেন এবং আমরাও কৃতার্ব হ'য়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি যে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। হতে পারে তিনি কিছু দিন বা খুব বেশী দিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি, আমার যত্নসূর সম্ভব ধারণা, সাদা চোখে কিছুই দেখেননি। সাহেব তুর্কদের সম্বন্ধে যে-সব বাজে বকেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু না ব'লে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু'চারটি কথা ব'লে এই নীরস গল্পের অবসান করব।

এই ভাষার সাহেবের নামে শ্রদ্ধায় আভূষিত বাঙালী স্থূলত কোন হীনমনাতা নেই। ২০ বছরের নজরুল যে যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং আত্মবিশ্বাসম্পন্ন ব্যক্তির তাঁর এই লেখার সৈনিক পরিস্ফুট। সাহেব হ'লেই যে সে দেবতা হবে এবং তাঁর বাক্য হবে বেদবাক্য নজরুল উক্ত বরন থেকেই জা

ভাবতে পেরেছেন নি। জুই 'বাক্যে বকেছেন' এমন কথা বলতে তিনি সাহসী ও সজোচ্ছবী। তাঁর এই নিকৃষ্ট সাহসের প্রকাশ দেখি তাঁর 'বক্তার পিরীতি বাজির বাঁধ' নামক প্রবন্ধে। বেখানো তিনি রবীন্দ্রনাথকে পর্বত সুরধার ভাষার আক্রমণ করেছেন:

বীণাই শোভা পায় বাঁধ হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখেন দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোহানী বাতাবাতিতে কে যে কর বান, তা ত বলা দুষ্কর।...

আজকের 'বাঙালির কথা'র দেখানাম—যিনি অল্প বৃত্তান্তটুকুর শত পুত্রের পক্ষ হ'য়ে পক্ষপাতকে লালিত করবার সৈন্যপতা গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সহ সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিনবাবে সার দিয়েছেন। মহাদায়কের ভীষ্ম এই অনার্য বৃদ্ধ সার দেখনি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সার দিয়েছেন এইটাই এ-বুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়নায়ক।

এই অভিনব রক্ষী মনে ক'রে কবিগুরু আমারও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। বলেছেন, আমি কথার কথার 'রক্ত'কে 'বুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে তক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি নিজেকে টুপী পারজায়া পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হ'য়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক'রে গেছেন।

....ঐ একটি ভালো শোনার লোভেই, ঐ একটি ভিন দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব জ্ঞান ও প্রতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবি-গুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনার এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হ'চ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈরাগ্যের পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাক।

'বুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বংশোদ্ভিক্তী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-সুটোর একটাও রং আজকাল পছন্দ করবেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু 'বুন' নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখার। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, কিন্তু-কাবালক্ষীরও একটা মুসলমানী চং আছে। ও সাথে তাঁর শ্রীর হাসি হ'য়েছে বলেও আমার জ্ঞান নেই। স্বর্গীর অজিত চক্রবর্তীও ও-চং-এর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন।

বাংলা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটি ইরানী 'জৈওর' পরালে তাঁর জাত নার না, বরং তাঁকে আরও 'বুন' সুরতাই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অনভাবিত মুসলমানী চং-এর। বাঁধেরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকর্য্য সকল বিলম্বিত স্বীকার করেন। পণ্ডিত মানবিদ্যা স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তা ছাড়া যে 'বুনের' জন্য কবিগুরু রাগ ক'রেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হ'চ্ছে আমাদের কথার, কালার বক্সে (Colour box) এবং তা বুন-করা, বুন-হওয়া ইত্যাদি বুনোবুনি ব্যাপারেই নয়। হুসরেরও 'বুন-বাঁধাবী' হ'তে দেখি আজো।.....

....কবি-গুরু যমে করেন যজ্ঞের যানটা আরও ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাজেও চলে। চলে কিন্তু তখন ওতে রাগ সোপাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' কোটে না, তেমনি স্বপ্নও কোটে না—নেহাৎ দাঁত না কোটালে। প্রিয়ার সাথে খুনা-খুনি হয়ত খেলনা, কিন্তু খুনহুড়ি হয়ত করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর উক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর আচকান চায় না, চায় বাঁধে বাঁধে বেহালার সাথে সারেঞ্জীর সুর শুনে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে, বাগিচায় বুল-বুলির সুর।

এই সমালোচনাটি আকর্ষণীয়ক নিঃসন্দেহে। হয়ত বা উগ্রতার স্থূল। কিন্তু এই লেখাটি থেকে অনুমান করা যায় নজরুলের শিল্পী-সত্তার পিছনে একটি অতি-প্রখর অতি-সচেতন সমালোচক-সত্তার দৃষ্টির প্রহরা ছিল। নিরুপক আবেগের দাসত্ব করায় বড় উদাসীন ভাবুক তিনি ছিলেন না। প্রতিটি কাজের পিছনে তাঁর চিন্তা কাজ করত।

সমালোচকদের কাছ থেকে আনরা প্রায়ই একটা অভিযোগ শুনি যে নজরুলের সাহিত্য সাধনার পিছনে তেমন কোন পাঠের প্রভাবিত ছিল না। এ-জন্য নজরুলের শিল্প-সম্প্রদায়কে অনেক আধা শিক্ষিত সমালোচক 'অশিক্ষিত পটু' বসতে সঙ্কোচ করেননি। এখানে বলে রাখা দরকার যে কোনো শিক্ষকনাই বিনা শিক্ষায় অর্জন করা যায় না। প্রতিভা যতই দৈবী হোক বাস্তব শিক্ষা তাকে গ্রহণ করতেই হবে। অকথা শিল্পী যে সর্বদা এই শিক্ষা প্রকাশ্য-ভাবে পাঠশালায়, বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করবেন তেমন কোন কথা নয়। জগতের অনেক বড় বড় কবি-শিল্পী তেমনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁদের এক উপায়ে শিক্ষা লাভ হয়েছে। যেমন ধরা যাক শেক্সপীয়ারের কথা। ব্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন :

Shakespeare was no deep reader. True, but in the Greece of Pindar and Sophocles, in the England of Shakespeare, the poet lived in a current of ideas in the highest degree animating and nourishing to the creative power; society was in the fullest measure, permeated by fresh thought, intelligent and alive. And this state of things in the true basis for the creative power's exercise, in this it finds its data, its materials, truly ready for its hand ;

নজরুলের বেলায় এই কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য। নজরুল, বহুসুদন, বক্তিবচন, ববীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ পূর্বসূরীকে যে তাঁর ভাষার মাধ্যমে পেরেছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর সমাজ পরিবেশের জন্য, সৈনিক জীবনের পরিবেশের জন্য করেকজন জগৎবিখ্যাত পারসী কবিকেও আশ্রয় করতে সর্ব্ব্ব হরেছিলেন। এছাড়াও পেরেছিলেন বিংশ শতাব্দীর উচ্চ বসাবিত্ত বাঙালীর শিকিত বুদ্ধিজীবী সমাজ। খেলাকত আন্দোলন, বলশেভিক আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সত্যসিদ্ধি এবং তাদের কর্মীদের সহবাস নজরুল পেরেছিলেন। এই সহবাসের শিক্ষা নিরুপক বাবুলী বলে ডাকা অনুচিত।

এ-ছাড়া আছে কবির বর্ষেক্ষিতের শিক্ষা। অর্ধশতাব্দীর সাহায্যে কবি প্রকৃতির অবাঞ্ছিত ভাষা বুঝতে পারেন। এই ধরনের একটি কথা শ্রীশচীন করকে লিখিত নজরুলের একটি চিঠিতে দেখি। নজরুল বলছেন: 'কবির ভাষা, কুড়ির ভাষা, পাজার কথা, সত্যের আবেগ, তবুও বাণী আনন্দের স্তম্ভে পাই বুঝতে পারি বলে আচার্য জগদীশের লাক্ষ্মীনারায়ণ লেখতে বাছিনে।' এবং ছাড়াও এই প্রাকৃতিক শিক্ষা একটি বড় শিক্ষা।

এটা হয়ত সব কিছু নয় পড়াশুনানীরও প্রয়োজন পড়ে। কারণ পাঠের মাধ্যমে শিল্পীর অথবা কবির উচ্চাশী নজি বৃদ্ধি পায়। এই লেখা পড়ার প্রতি অনুৎসাহী ছিলেন বলে আর্নল্ড ওয়ার্ডনওয়ার্থকে সমালোচনা করে বলছেন:

Wordsworth cared little for books, and disparaged Goethe. I admire Wordsworth, as he is, so much that I cannot wish him different, and it is vain, no doubt, to imagine such a man different from what he is, to suppose that he could have been different. But surely the one thing wanting to make Wordsworth an even greater poet than he is — was that he should have read more books, among them, no doubt, those of that Goethe whom he disparaged without reading him.

এই বিষয়টি যে নজরুলের জানা ছিল না তা নয়। বেগম শাহনুজাওয়ার হাতবুদের কাছে লেখা চিঠিতে নজরুল বলছেন:

বড় বড় কবির কাব্য পড়া এইজন্য প্রকার যে তাতে সম্পদের ভাটা খুলে যায়, চিন্তার বহুধা বা বৃদ্ধি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উবেগ, তা সহজ হ'লে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা বর্ধনের অপেক্ষা রাখে। নটিলে তার সঠিক বেদনা মনের মাঝেই গুহের মরে।

আমি এক চিঠিতে তিনি শ্রীশচীন করকে লিখছেন:

পড়া ছাড়িয়েন তুই, তা'হলে তোকে বেলায় ডাড়বে। অবশ্য দণ্ডিত হ'লে আমি বলতিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঞ্জিও আমার পাকা চাই। --- জরুলগণের হাত তোর পেটটা গজগজ করুক বিদ্যায়, এ আমি বলছি। তাই বলে জানতে শুনতে যতটুকু জানা পোনার প্রকার—তা থেকে নিজে থেকে আলাদা করে রাখবি কেন?

এই উপদেশ যিনি দিয়েছেন তাঁর পাঠাভ্যাস একেবারে ছিল না। এমন মনে করা সম্ভবত অসঙ্গত। এ-প্রসঙ্গে নজরুলের বর্তমান 'বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এখানে আমরা একসঙ্গে যে কজন কবি-সাহিত্যিকের নাম উচ্চারিত হ'তে দেখি, তাঁদের সাহিত্য আনোচিত হ'তে দেখি, তাঁরা হলেন: বিল্টন, শেলী, নোভটি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ, গুগিক বোয়ান বোয়ান, বার্নার্ড শ', বেনাডীতে, নিউমিই অস্ট্রিড, নুটি হারম্বন, ওয়াশিংটন বের্ড, আনাডোল ফ্রান্স, কীটস, হুইটম্যান, বের্নলফোল্ডস, পুশকিন, মন্তরভাষি, টলষ্টয়, কার্লমার্কস, ইবসেন, ক্রম্বল্ড, ব্যালজাক, জোলা, গ্র্যাংসিয়া সেলেকা, লুয়াননভুসিও, কিপলিং।

সশেষবাহীরা হয়ত বলবেন যে লেখকের পক্ষে গ্রন্থ পাঠ না ক'রেও তাদের মনের তালিকা দেওয়া সম্ভব। অকির বেপারওয়া বোহেমিয়ার নজরুলের সময় কোথায় ছিল যে তিনি এত বই পড়তেন। হ'তে পারে তা; এর সবটো যে তিনি ইন বিটুইন লাইন প'ড়েছেন তেমন তথ্যগত প্রমাণ দেওয়া মুক্তিল। কিন্তু শান্তিপদ সিংহের “নজরুল কথা” থেকে জানা যায় যে নজরুল এক সময় মুক্তি-মুক্তির মত বিপ্লু-সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। তাছাড়াও নজরুলের কয়েকজন মজরক বন্ধু ছিলেন বিপ্লু সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার তিনি তুড়ি-পতিতে ঐ সব সাহিত্যিকদের আত্মসাৎ করেছেন। নজরুলের স্মৃতিশক্তি যে অসাধারণ ছিল তাঁর তথ্যগত প্রমাণ পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, গান এবং গোটা গীতাভিনি নজরুলের মুখস্থ ছিল। একবার মনোযোগ দিয়ে দেখলে অবশ্য তুলে নজরুল যে তা তুলতে। না নজরুলের অসংখ্য হিন্দু-পুরাণ ও মুসলিম পুরাণ প্রয়োগ থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু নজরুল শ্রী মনুধ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন : ‘আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণ শক্তি একটু বেশী।’ অতএব উদ্ধৃত লেখকগণের সাহিত্য যে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো তা বলা যেতে পারে। বলা যায় আরও এইজন্য যে নজরুলের ঐ প্রবন্ধটি কোন হাল্কা সাহিত্য পরিচয় নয়, রীতিমত বিপ্লুসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা। গভীর পাঠ ভিন্ন তুলনামূলক বিচার সম্ভব হয় না। ‘বর্তমান বিপ্লুসাহিত্য’ প্রবন্ধটি একটি তুলনামূলক সাহিত্যালোচনা। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর বিপ্লু-সাহিত্যের সাহিত্যিকদের তিনি দৃষ্টিভাগে ভাগ করেছেন। ইব্রাহীম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে নজরুল বলেছিলেন :

বেলাব গান গেয়েই আবারে নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গ'ড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইরেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে না-ই পায়, পুণ্ডিন, লতরভূমি, হুইটম্যান, গকি, যোহান বোয়ারের পাশে ধুলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই।

‘বর্তমান বিপ্লুসাহিত্যে’ এটাকেই তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শুরু করেছেন তিনি এইভাবে :

বর্তমান বিপ্লু-সাহিত্যের দিকে একটু ভালো ক'রে দেখলে সর্বাত্মে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত বিকসনের Bird of Paradise-এর মত এই ধুলিবলিন পৃথিবীর উর্ধ্ব উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না, কেবলি উর্ধ্ব—আরো উর্ধ্ব উঠে স্বপন লোকের গান শোনার। এইখানে সে স্বপনবিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার সমস্ত অঁকড়ে ধ'রে থাকে।----- এইখানে সে মাটির দুলাল। ধুলি-বলিন পৃথিবীর এই কর্মাক্ত নিত যে স্বপ্নরকে অধীকার করে, সে স্বপ্নকে চার না তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে কেলে স্থলরের স্বর্গলোকে যেতে চার না। সে বলে : স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আবারে সাধনা দিয়ে এই ধুলার ধরাতেই নামিয়ে আনব। আবারে পৃথিবীই চিরদিন তাঁর দলীপনা করেছে, আজ তাকে এসে আবারে মাটির মতের দাসী করব। এর এ উদ্ভটো জ্বর

লোকের দেবতারা হলেন। বলেন: অসুরের অহঙ্কার, কুংসিতের হাডলারী! এরাও চোখ
পাকিয়ে বলে: আভিষ্যাতের আশঙ্কান, লোড়ীর নীচতা।

গত বহাবুদ্দের পরের বহাবুদ্দের আরম্ভ এইখান থেকেই। উর্ধ্বলোকের দেবতারা যুকুটি
হেনে বলেন, দৈত্যের এ উচ্ছ্রতা কোন কালে টেকেনি।

নীচের দৈত্য-শিশু দুধি পাকিয়ে বলে: কেন যে টেকেনি, তার কৈশিক্যুট্ট ত চাই, দেবতা।

দুই দিকেই বড় বড় রখী বহাবখী। এক দিকে গোঙচি, ইথেলস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি
dreamers স্বপ্নচাসী; আর দিকে গকি, ঘোহান ঘোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাডীডে। আত্মকের
বিশ্বসাহিত্যে এ-যুট্টো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এই দুটো রূপের পরিচর দিয়ে, নজরুল আত্ম হননি। তিনি আর একটি তৃতীয় রূপের কথা
বলেছেন। এই তৃতীয় রূপের ধারা সৃষ্ট। তাঁরা উপরের ঐ দুটি extreme রূপের মাঝামাঝি
একটি রূপ। সে কি করে? কবি বলেছেন—‘সে এই যাত্রির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী
পৌনে।-----সে তার যাত্রির মাকে ভালবাসে, খুঁচি বলে স্বর্গের বিক্ষোভে অভিমানও করেন।’
লিওর্নিজ, অ্যান্ড্রিড, ন্যাট হামসন, ওয়াশিংটন বের্নকে তিনি এই দলভুক্ত করেছেন। তাঁর
মতে, ‘বার্নার্ড শ’ আনাডোল ফ্রাঁস, বেনাডীডের মত হলাচল এরাও পান করেছেন, এঁরাও
নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এরা শিবির প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদগার করেননি।’
অর্থাৎ এঁরা বিদ্রোহী দলের নন এঁরা সংস্কারপ্রভী নন। নজরুল বলেছেন, ‘দুই চরনের মাঝামাঝির
সাহিত্যিকরা ভেবেছিলেন সবাইয়ের বিকর্ষ হবে ইডোনিউশন দিয়ে কিন্তু বহাবাদীরা ভেবেছিলেন
বিকর্ষ ইডোনিউশন দিয়ে হবে না হবে ‘রক্তমাখা রিডোনিউশন দিয়ে।’ তাঁরা নতুন দুনিয়া
সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এর ‘খোল নলচে দুই বললে।’ তাঁরা চেয়েছিলেন ‘নতুন সৃষ্টি নতুন সৃষ্টি’
সৃষ্টি করতে। এই দলে জইটমান, বার্নার্ড শ', বেনাডীডে ছিলেন। কিন্তু নজরুল এই দলের
নাযক বলে মনে করেছেন গকিকে। নজরুলের ধারণা এই গকির সৃষ্টি দক্ষ্যভক্তি, পুণকিন ও
শেখত। বিশেষ করে দক্ষ্যভক্তি। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর এই নতুন সৃষ্টি-সৃষ্টির
দিন বলে মনে করেন নজরুল যেদিন ‘বর্বর রূপ সম্রাট নিকোলাসের দণ্ডাজার’ ‘নৈতিক কবি
ও সাহিত্যিকের’ নির্বাসন হয়। এই নির্বাসিতের মাধ্যমে ছিলেন দক্ষ্যভক্তি। নির্বাসন থেকে
কিয়ে এসে তিনি রচনা করেন Crime and Punishment। নজরুল বলেছেন, ‘Crime and
Punishment-এর ‘রাজনৈতিকত্ব যেন দক্ষ্যভক্তিরই দুঃখের উন্মাদ বৃত্তি, সোনিরা যেন ‘বহিতা
রূপিরায়ই প্রতিসৃষ্টি।’ নজরুলের ধারণা ‘যেদিন রাজনৈতিকত্ব এই বহু পরিচর্যারত সোনিয়ার পায়ে
তলার প’ড়ে বলসো,—I bow down not to the but to suffering humanity in you! সেদিন সমস্ত ধরনী
বিশ্বেরে ব্যাখ্যার শিউরে উঠলো। নির্বাসিত মানকের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুত্রীভূত
হ’য়ে কেনিয়ে উঠলো। ইস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার বহাপ্রাবনে।’
নজরুল মনে করেন এই বহাপ্রাবনের সৃষ্টি গকি। জইট তিনি বলেন ‘আরপর এস এই বহাপ্রাবনের
গুপ্ত ডুকানের মত, ডরাবর সাইক্লানের মত বেগে যাত্রির গকি। শেক্সপেয়ারের এটিবক ‘ড্রেড
পঙ্কল, সে বিশ্বেরে বেরিয়ে এসে এই বড়ের বড়কে অভিমান করলে। বেদনার গবি দক্ষ্যভক্তি
বলে: ভেদার সৃষ্টির জন্যই আবার এ উপসর্গ। চালাও পরশ, চানো ত্রিশূল।’

নজরুলের ধারণা। বিশ্ব সাহিত্যের সত্যিকার প্রথম ডাক্তার গান গাইলেন গকি। কার্লমার্কস যে ধারণার উচ্চারণ করেছিলেন, সেই 'কার্ল মার্কসের ইকনমিক্সের অঙ্ক এই বাবুকের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কনশ্রী হয়ে উঠেছে। পাখরের কুপ স্কন্দর ডাক্তারহলে পরিণত হয়েছে।' নজরুলের ধারণা মার্কস অর্থনীতির নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে সাম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণের যে কীকী দেখিয়ে দেন—সেই অঙ্কশাস্ত্রের সূত্র সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে গকির হাতে। জই গকি বললেন—“দুঃখ বেদনার ভয়গান পেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নিব। রক্তে নাইয়ে অণুটি পৃথিবীকে গুচি করব।” নজরুল বলছেন—“এতদিনে সে তরকের বেগে এসে প্রাসাদে লুণ্ঠারিত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল—জারের রাজ্য গেল—বনভাসিকের প্রাসাদ চাভুড়ী শাবলের ঘারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।” এই স্বয়ংপ্রতী সাহিত্যিকরা বনভাসিকীদের দ্বারা নিলিখিত হন। নজরুল চমৎকারভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন :

দশবুও দিয়ে ধেরে, বিশ্ব হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হ'ল না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া বন্ধ-সেনারা এদেরে বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা হবে ধরণীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটের ভোগ্যা, ধরার প্রজারপাইন বরাক্ষা পুটোর হবে সেবিকা।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সালের নজরুল নিজে এই রক্ত-বিশুবকারীদের দলে ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বয়ংপ্রতী—তার সাধনা ছিল 'খোল মল্চে বন্নে' 'নতুন স্ট্রি নতুন শ্রুটা' স্ট্রি করার। তিনিও বাংলা-সাহিত্যে এসেছিলেন 'মহাপ্রাণের ওপর তুফানের মত, ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে।' গকির মতই নজরুলের বক্তব্য ছিল—“দুঃখবেদনার ভয়গান পেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে, অণুটি পৃথিবীকে গুচি করব।” এই চিন্তা থেকেই নজরুল 'কামাল পাশা' কবিতার লিখেছিলেন :

হিংস্র ওয়া হিংস্র পড়ব দল!
গুপ্ত, ওরা, লুচ ওল্চে লক্ষ অম্লব বল...
হিংস্র ওয়া হিংস্র পড়ব দল।
জানিব ওয়া অত্যাচারী।
সার জেনেছি সত্য বাহা হত্যা তারই!!

'ওরা অত্যাচারী জানিব' সুভাষা ওল্চে হত্যা করাই উচিত। কামাল-স্বরের কারণ হ'ল কামাল পাশা এই সাম্রাজ্যবাদীদের 'উচিত সাজা' লিখেছিলেন। এই চিন্তা থেকেই নজরুল বিখ্যাত "কোরবানী" কবিতার লিখেছিলেন—'ওরে সত্য নৃক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন।'

এই চিন্তা থেকেই 'দুঃশাসনের রক্ত পান' কবিতার বসেছিলেন:

বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই কবির।
চাই কবির রক্ত চাই,
ষোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই।

এই কবিতা লিখেই শিক্ত বুর্জোয়া বাবু সমাজের কাছ থেকে নজরুল-কাব্য 'লক্ষ-বাম্প' উপাধি পেয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্র সম্ভরদীরা নজরুলের কাব্যকে 'যার যার কাছাকাছি ও অসির স্বপ্নের মতো রূপ ও রসের প্রক্ষেপটুকুও হারিয়ে গেছে' বলে বস্তুত্ব করেছিলেন। বস্তুত্ব হ'য়েছিল—'এ অসির স্বপ্নের আভির বনের আবেগে ডাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জন-প্রিয়তাও বিনিময়ে থাকে।' শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষ নজরুলী কাব্যকে 'লাঙলী পরা ওলি পাকানো বুলো মাথা আধুনিকতা', 'মাধুর্যহীন ক্ষুদ্রতা', 'পালোয়ানির মাতামাতি', 'শায়তানি মাথা পালোয়ানি', 'সার্কাসের 'খেলোয়াড়' ইত্যাদি বলে সমালোচনা করেছিলেন।

এই সব কথাতে উপলব্ধ করেই বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের প্রতি রূপবাদী সাহিত্যিকের বনোড়ি বাখ্যা করে নজরুল বলেছেন—'Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ত-সেনারা এসেছে বলে হনুমান।' বস্তুবাদী এই সাহিত্য অবর হ'তে পারে না এই অভিমত ছিল বুর্জোয়াদের। কিন্তু 'বুধপোড়া হনুমান'-বে অবর হ'তে পারে তার উপাধরণ রামায়ণের হনুমান। সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে তার বুধ পুড়েছিল। কিন্তু ঐ মহৎ আত্মত্যাগের জন্য হনুমান পূজ্যমান হয়েছে। নজরুল সেটাই বাখ্যা করছেন এইভাবে:

সীতার উদ্ধারে যার যে তথাকথিত হনুমান, রক্ত-সেনা দেয় তার লাজে আঙুল লাগিয়ে।
তথাকথিত হনুমানও বলে, লাজে যদি আঙুলই লাগানি, আমার হাত বুধ যদি পোড়েই
—তবে তোর স্বর্ণলতাও পোড়াবে। ব'লেই দেয় লক্ষ।

আজকের বিপ্লু-সাহিত্যে এই হনুমানও লাকাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলতাও পুড়েছে
—এ আপনারা যে-কেউ দিবাচকে দেখছেন যোধ হয়।...

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পূণ্যবান বুধপোড়া হনুমান অবর হ'য়ে গেছে। সে আজ পূজাও পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাজনার আঙুলে যে দুঃসাহসীদের বুধ পুড়ে তারিও ভবিষ্যতে অবর হবে না, পূজা পাবে না—এ-কথা কে বলবে?

অর্থাৎ তারিও পূজা পাবে অবর হবে কেননা 'বুধপোড়া'র বদনামের আত্মত্যাগ তারি মহৎ কুর্ভাব পালনের জন্য গ্রহণ করেছিল। আর আসনে শু তারি 'হনুমান' নয়—এ নাম দেওয়া শু বুর্জোয়া রাবণ ও তার রক্ত-সেনাদের। লক্ষ্য করবার বিষয় যে নজরুল দু'দুবার 'তথাকথিত হনুমান' লিখেছেন। 'তথাকথিত' বিশেষণটি বীরা মহৎকে হনুমান ভাবেন তাদের প্রতি সমালোচনার কটাক্ষ। বা হোক

আবার বলিয়া হ'ল এই যে নজরুল যাই পাঠ করুন তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধি ছাড়া এই ধরনের তুলনামূলক বিচার সম্ভব নয় :

রাশিয়া দিগেছে revolution এর মর্যাদিক বেদনার অসহ্য জ্বালা। ক্যাঙিনেভিয়া দিগেছে অরক্তন বেদনার অসহ্য দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিগেছে হাতে রক্ত তরবারি, নরওয়ে দিগেছে দু'চোখে চোখ ভরা জন। রাশিয়া বলে : এ বেদনাকে পক্ষ্য শক্তিতে অভিক্রম করব,— ভুজবলে ভাঙব এ দুঃখের অঙ্ককার। নরওয়ে বলে : প্রার্থনা করো ; উর্ধ্ব আঁষি তোল। সেখায় স্থলর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না।

নজরুল বিশুসাহিত্যের আজিকাগত কলানোশন, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে কোন আলোচনা করেননি অথবা বিশুসাহিত্যের ক্রমাগত পরিবর্তিত মতবাদ নিয়েও আলোচনা করেননি, যে মর্মবুল থেকে সাহিত্যের ভাবের উদ্ভব, যে উৎস বুল থেকে সাহিত্যের বৃক্ষের উৎপত্তি সেই আইডিয়ায় অগভীর শাদৃশ্য বৈশাদৃশ্য তাঁর আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন দেশের বনীশী সাহিত্যিকবৃন্দ সমকালকে কি ভাবে গ্রহণ করেছেন, জীবন ও অগৎ সম্পর্কে কিভাবে চিন্তা করেছেন সেইসব বৈপুণিক চিন্তা-সমূহকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নবা দুনিয়ার বিপ্লবের চিন্তাধারায় রাশিয়ার অবদানকে নজরুল দেখিয়েছেন। কিন্তু একা রাশিয়া নয়—রাশিয়ার সংগে সংগে বৈপুণিক চিন্তাধারার অন্য দেশের দাবীও যে অগ্রাহ্য করার মত নয় সে-কথাও তিনি বলেছেন :

আইডিয়ার অগভীর বিপ্লবের অগভীর ব'লে দাবী রাশিয়া যেমন করে—ডেবনি নরওয়েও করে। ক্রান্স-জার্মানীও এ অধিকারের সবটুকু পেতে দাবী করে।

আজকের নরওয়ের হুটিহামসুন—যোহান বোরগার—ওথু নরওয়ের ওঁরাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বে ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বৃষ্টি বা ইবসেনের মানস-পুত্র।

পার্থক্যকে নজরুল কীভাবে নিরূপণ করেছেন। নজরুল বলছেন যে রাশিয়া দিগেছে revolution-এর বেদনার জ্বালা আর ক্যাঙিনেভিয়া দিগেছে বেদনার দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিগেছে রক্ততরবারি, নরওয়ে দিগেছে চোখভরা জন। রাশিয়া শক্তিবলে দুঃখের কারাগার ভাঙতে চেরেছে আর নরওয়ে চির-জাগ্রত স্থলর দেবতার কাছে প্রার্থনার সজলচোখ তুলে ধরতে বলেছে।

নরওয়ের দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক হ্যামসুন ও বোরগারের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

হ্যামসুন বোরগারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamer অর্ধেক উপন্যাসিক। যোহান বোরগারের Great Hunger-এর Swan যেন তারডেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপে-পুণ্যে অবিশ্রাসী নিবিকার উপনিষদের সজ্জমানন্দ। হ্যামসুনের Growth of the Soil-এর Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ধর্মবাদের মত ঘরের আকৃতি। যে করুণ স্থলর দুঃখের যে মানবতন্ত্রার বেদনা এঁদের লেখার সিঁদুতীরের উইনোডর মত দীর্ঘশ্বাস কেলছে তার তুলনা অগভীর কোন কালের কোন সাহিত্যে নেই।

নজরুল বলছেন মহিকুটার এই আশ্বিক বুদ্ধভঙ্গিকে হুকুটি কুটিল, বিভ্রমের অবিশ্রাসের নির্বহ হানিতে উড়িয়ে দিতে চেরেছেন 'বার্ভার্ডন'—আনাতোল ক্রাস—ডেসিডো বেনাভীতে। পক্ষির দর্শনিক ওয়

যেমন হার্কিন ডেবনি এঁদের গুচ্ছ করেত। নভরুল তাই বলেন 'তাদের পেছন থেকে উফি যৌর
করেত।' নভরুলের ধারণা এঁদের সমিতি হাঁসির মধ্যেও পার্থক্য আছে। যেমন বেনাউটে—
“বেনাউটেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারি তাঁদের মধ্যেই একটু ভীক। ... সে নির্বক কিন্তু সে হার্কিন
ব'র বড় আশ্বিনী নয়।”

কিন্তু এই প্রথম বৈশ্বিক সংস্করণের পাশে আর এক ধরনের সাহিত্য বিরাজ করছে। যার মধ্যে উইকে
দিয়ে আকৃষ্ট করার নব্বিত চিত্রকারি সেই আছে জনান্তিকের দীর্ঘত্ব কর প্রবাহ। নভরুল বলছেন:

এরি মাঝে আবার পাঁচ লোক চূর্ণ ক'রে ক্ৰাণ জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ব'লে যাচ্ছে—
তাঁদের একজন ওয়াশিংটন রের্ব—পোমিণ আর একজন গ্র্যাংসিয়া দেশেরা ইতালীয়ান।

এ-যেন কোলাহলের বাইরের প্রবাহ পরীজীবনের কর্মবিশালেন করেকটি করেব দুইভের কথা। কিন্তু
বুদ্ধবানী সাহিত্যের বনত্ব হঠাৎ এই স্বপ্নবোর কাটিরে দেব। অথবা এ-বৃদ্ধ বিশুবীনের গর—
শাস্ত্রাবাদীদের, কাসিত্বদের। আর এর অগ্রাণয়ক হ'লেন ইতালীর দু'আনবুসিও ও কিপলিং।
নভরুলের ভাষার:

কিন্তু গল্প শোনা হর না—হঠাৎ চমকে উঠে তুমি, আবার বুদ্ধ বাজনা বাজছে—এ বুদ্ধ-
বানী বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। সেখি, তালে তালে পা ফেলে আসছে শাস্ত্রাবাদী ও
কাসিত্ব সেমা। তাদের অগ্রে ইজনির দু'আনবুসিও, কিপলিং প্রভৃতি।

ভিনু ভিনু এই চিন্তাধারার সংঘর্ষে—কবির মধ্যে মানসিক যশের সূত্রপাত হয়। কোন্টি ঠিক, কোন্টি
বর্ধা? হানুয়ের বজলের জন্য শুভতর কি? —এই অন্তর্ঘর্ষ প্রত্যাক ক'রে কবি বর্ধন ক্রান্ত তর্ধন
তার কানে আসে আর এক সাহিত্যিকের বাণী—নোঙচির বাণী। নভরুলের ভাষার:

ক্রান্ত হ'রে নিশীথের অন্ধকারে চলে পড়ি। হঠাৎ তুমি দু'রাগত বাণীর ধ্বনির বড় শ্রেষ্ঠ
স্বপনচাবী নোঙচির গভীর অভলতার বাণী—The sound of the bell, that leaves
the bell itself।

পাঁচ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্রে প্রবঃ বিশুসাহিত্য সম্পর্কে নভরুল তাঁর সুন্দর ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করার
চেষ্টা করেছেন। এ-কথা ঠিক যে বিশ্বের বহু দেশের বহু ব্যাক্তনরা সাহিত্যিক তাঁর আলোচনা
থেকে বদি পেছেন। কিন্তু বাঁদের সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছে, এবং তাঁদের অসেকেই সে দেশের
প্রাণ প্রতিনিধিবলুনক সাহিত্যব্যক্তি, তাঁদের সাহিত্যের একটা মোটামুটি ধারণা এতে তিনি দিতে
পেরেছেন। এই কাজটি সাবান হ'লেও খুব সহজ নয়। পরিপাক পক্তির অসামান্যতা ব্যতীত ক্রিয়া-
পদ্ধিতে বিশ্বরটিকে উপর্য এবং আদর্শ ক'রে পরিবেশন করা সৈবপ্রতিভাবান ব্যক্তি ভিনু সন্তব নয়।
উপরের আলোচিত প্রবঃটি ছাড়া কেবল সাহিত্যের উপর লেখা নভরুলের পাঁচটি প্রবঃ চোখে পড়ে।
এর একটি 'বাহুল্য সাহিত্যে বুলবান', 'জনসাহিত্য', 'কবাহিরাৎ-ই-তাকিজের সুবন্ধ', 'বুলবুল-ই-

*এই প্রবঃটি নভরুলের একটি অনির্দিষ্ট বক্তৃতা। এই নির্দিষ্ট রূপদান করেন কবি আবদুল কাবির অথবা কবির
অনুলেখন দিয়ে।

শিরা' (হাকিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী) ও ওমরের কাব্য ও দর্শন ।' এইসব প্রবন্ধ যে গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে লিখিত হয়েছে তা নয় । কিন্তু এই প্রবন্ধেও নজরুলের সাহিত্য-বিচার দৃষ্টির আলোকপাত ঘটেছে ।

প্রথমে 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধটির কথা ধরা যাক । গোটা প্রবন্ধে তিনি বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন এবং তার ভবিষ্যৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন । মাত্র তিন পৃষ্ঠার ছোট প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার যে ছবি কুটিয়ে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ । এখেকে তাঁর সাহিত্য-সাধনার পিছনে পাহারারত তাঁর সজাগ মনটিকে বোঝা যায় । নজরুলের মূল বক্তব্য ছিল যে সাহিত্য হবে উদার সত্যীব, আন্তরিকতাময়, প্রাণময়, বৈচিত্র্যময়, আনন্দময় এবং সৌন্দর্যময় । এতে তিনি নিম্নোক্ত অনুদার জড়তাগ্রস্ত সাহিত্যকে সাহিত্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন । তিনি প্রবন্ধটিতে সাহিত্য ও শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য রেখেছেন । এতে তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলো হ'ল :

১. যে সাহিত্য জড়, যার প্রাণ নাই, সে নিম্নীষ সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, যার তাহা স্বামী সাহিত্যও হইতে পারে না ।
২. সাহিত্যের নৃজগারায় থাকিবে চলার আনন্দ, যোড়ের বেগ এবং চেউ-এর কলগান ও চঞ্চলতা ।
৩. যে সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য মত ভাল, যিনি মত বেশী প্রকৃত চিত্ত, তাঁর লেখা তত বেশী স্বাস্থ্যসম্পন্ন তত বেশী কনমুখর ।
৪. 'পুঁজে মারা' পিলে রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই লেখিবেন অসুস্থ (morbid) ; ইহাই সাহিত্যের স্বচ্ছ বায়র আধিনতা যানে ।
৫. লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি । যেখানে লেখা সত্য, তাহার লেখাতেও সে-সত্য সত্যভাবেই কুটিয়া উঠিবে ; যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি ছাড়ার চেষ্টা করিলেও লুকটিতে পারিবেন না ।
৬. সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন বর্নবিষেধ, জাতি-বিষেধ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না । বাঁধ-সেঁচরা ভোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে । তাঁহার স্রষ্ট সাহিত্য খাঁতুড় বরেই মারা যাইবে ।
৭. সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের বাধা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথার হোঁরা দিবেন । সাহিত্যিক যতই কেন সুকৃতাভূতের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে-কোন লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা :- ---- এই রূপেই বিশ্ব-সাহিত্য স্রষ্ট হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সার্বজনীনতা । --- আনন্ডগীতকেও তাই এখন করিতে চাইবে সাহিত্যে সার্বজনীনতা স্রষ্ট । অবশ্য নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া ।
৮. তিনিই আর্টিষ্ট, যিনি আর্ট কুটাইয়া তুলিতে পারেন । আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য নাট্রেই মূল্য, সত্য চিরবজনময় । আর্টকে

স্বষ্ট, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা হইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৯২০ সালে নজরুলের বয়স যখন ২২ বছর মাত্র তখন তিনি এটি লেখেন। সেই বছরসেই সাহিত্য নিম্ন সম্পর্কে একটি নিম্নের বক্তৃতা গড়ে নেওয়া কন কথা নয়। পরবর্তীকালে নজরুলের নিজের সাহিত্যে এই আশ্রয় বহুলাংশে রূপায়িত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই লেখাতে তাঁর সমালোচনা দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে নেই। নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যখন বলেন:

সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখার প্রাণ দিবে কোথা হইতে? যাহান নিজের বুকে বসের আনিম্পনা কুটে না, সে চিত্রে রঙ কুনিটেবে কেননা করিয়া? যাহাদের অধিষ্টিত হইয়া গিয়াছে জড়, কেননা যাহাদের জীবন একধেরে, তাহাতে না আছে কোন বৈচিত্র্য, না আছে কোন গৌলব। তাছাড়া, বোঝার উপর থাকের খাঁটির' বত যাবনা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কৃতি পার না হইতেই যাবনা গম্ভীর হইয়া পড়ি অস্বাভাবিক বক্তব্যের। আর, গম্ভীর হইলেই অবনি নিজীব যচেন্তন প্রাণীর বত ছাড়া-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড় ভরতের বত বসিয়া থাকা, টহাই যাহাদের প্রাণশক্তিকে টুটি টিপিয়া নারিতেছে।

তখন বিশ্লেষণ দ্বারা আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা লক্ষ্য না ক'বে উপায় থাকে না।

এব পর 'জন সাহিত্য।' 'জনসাহিত্যের' মূল বক্তব্য কবির কথায়--বলা যাক:

জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হ'ল জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য বসের পরিবেশন করা। ---- তাদের বত ক'বে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তারা তা বুঝতে পারবে। কিন্তু সাধারণ, আপনাদের মুক্তবিরয়ানার তাঁর যেন প্রকাশ না পায়--জনগণের সাথে সঙ্গ করা হলে তাদের আত্মীয় হ'তে হবে।----জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই।

সম্ভবতঃ কৃষকের গান, শ্রমিকের গান এবং বীরের গান কবি এই পরীক্ষা চানিয়েছিলেন। তাঁর পরীক্ষা যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে না।

এবারে "কবাইবাং-ই-হাকিকের"--র 'মুখবন্ধ' ও 'মুনবুন-ই-নিবাত' পঞ্চদশ দৃষ্টির কথা বলা যাক। এটি দুটি প্রবন্ধকে হাকিকের Critical appreciation বলা হতে পারে। শুধু এর মধ্যে সমালোচকস্বলভ আদর্শচেতনা বোঝা যায়। 'মুখবন্ধে' তিনি বর্ণনাচেন:

আমি হাকিকের মাত্র দুটি কবাইবাং বাণ শিখেছি--বমিও আরও তিন চারটি বাণ সেওয়া উচিত ছিল। যে দুটি কবাইবাং শিখেছি তাঁর অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হ'ল। সমস্ত কবাইবাংয়ের আসল সুরের সঙ্গে এই দুটি কবাইবাংয়ের সুরের কোন মিল নেই। (পাঠকদের এই কবাইবাং দুটি নজরুলের কবাইবাং-ই-হাকিকের অনুবাদের মুখবন্ধে দেবে নিতে অনুরোধ জানাট।) কবাইবাংয়ের আলাপোড়া শাবাব, সাকী, হালি, আনন্দ, বিবহ ও অশ্রুর মধ্যে এই উপদেশের যে

স্বপ্ন কানে স্বীকৃতিবত বেগাশুপা ঠেকে। আবার অনুমানের আটকিত নবর কন্ডাই-ও প্রকৃতিত ব'লে বনে হর। কেবলা প্রথম দু'বাধিনের মাথে পেয়েব দু'বাধিনের কোন নিষ কেই, এবং ওর কোন মানেও হর না। দিনের ওরনে রাত্রি গর্ভবতী হবেন, এ আর বিনি লিখুন—হাকিজ কিভাবে পছন্দ না।

'ওরনের কাব্য ও দর্শন' প্রবন্ধেও বেগা বার নজরুল বলেছেন:

আমি ওরনের কন্ডাইগাং ব'লে প্রচলিত প্রায় এক হাজার কন্ডাই থেকেই কিছিরবিক দু'শ কন্ডাই কেছে মিরেছি; এবং জা কালী ডাফার কন্ডাইগাং থেকে। কারণ আমার বিবেচনার এইগুলি ডাফা বাকী কন্ডাই ওরনের প্রকাশভক্তি বা ফটাইনের সঙ্গে একেবারে মিশে যায় না।

একর দ্বারেন রুচি ও বিপাকোৎসাহপনু সনালোচকবৃত্তির হাঁকুনি যে বাবফত হ'রেছে জা সম্ভবতঃ কলা বাজকা।

হাকিজের কবিতার পরিচর করিয়ে দিতে গিরে নজরুল বলেছেন:

হাকিজের গান অতল গভীর সমুদ্রেব মত। কুলের পণিক যেমন ডাহার বিশালতা, তরঙ্গলীলা দেখিরা অধাক্ বিশ্ময়ের চাহিরা থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ভুবুরী তেমনি ডাহার 'তলদেশে' অজগু বণিমুক্তার সন্ধান পায়। ডাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্ভন, মিশুল বিশালতা; নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রগাতি, বহিরা।

বলা বাহুল্য হাকিজের দর্শন সম্পর্কে এ-প্রবন্ধে কোন বিস্তারিত বিশ্লেষণ ত্রিনি করেন নি। শুধু একটি বাক্যে তিনি বলেছেন 'হাকিজ ছিলেন উদাসীন সুখী।' কিন্তু 'ওরনের কাব্য ও দর্শন' প্রবন্ধে ওরনের দর্শন নিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। বলেছেন:

---- ডাহারের কাছে, বিংশ শতাব্দীর জন-বিজ্ঞানশুভ কারণজিজ্ঞাস্ত বনের কাছে, ওরনের কবিতা বেন আনাদেরই প্রণু, আনাদেরই প্রাপের কথা। আররা জিজ্ঞাসা করি করি করেও যেন সাহস ও প্রকাশ করতার সৈন্যবণতঃ জা জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। বিগত বহাবুচ্চের কয়েই আনাদের আভিকের জীবন বহাবুচ্চ জাজ। অবিশ্বাসী বন জিজ্ঞাস্ত ক'রে ওঠে—কেন এই জীবন, বৃত্তাই বা কেন? স্বর্গ, মরক, তরবার ব'লে সন্ডাই কি কিছু আছে? আকিরা ব'রে কোথায় যায়? কেন এই হান-হানি? এই অজাব, দুঃখ, পোক? এবং ওর অজবুতি প্রণু, বার উত্তর কেউ দিতে পারেনি। যে উত্তর দিরেছে, যে আর উত্তরের প্রকাণে কিছুই দেখাতে পারেনি; শুধু বলেছে: বিজ্ঞান কর। শুধু আনাদের বন বিজ্ঞান করতে চায় না, সে তর্ক করতে মিছে? এই চিরন্তন প্রণু ওরনের জ্ঞান-প্রশান্ত বনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়ের বতুই লোন দিরেছিল। সেই জরজ সংজ্ঞার সংগীত, কিরাণ, গর্ভন, তব্বেত . পাই তাঁর কন্ডাইবৃত্তে।-----

ওর বলতে চান, এই প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্য কত অবজ্ঞার পরগাধর এনেন, জুধু যে প্রণু সেই প্রণুই বরে গেল। বানুয়ের দুঃখ এক ডিগন্ত কবুল না। জুই ডিগির বহরেন, এ-সব

শিখা, পৃথিবী বিখা, স্বৰ্গ বিখা, পান-পূনা বিখা, জুনি বিখা জাহি বিখা, বজ্র বিখা, বিজ্ঞা বিখা। একবার সত্য—যে যুহুর্ড জেনার হাডের যুঠোর এম জেকে কুট্টরে ভোপ ক'রে নাও। সূটা যদি কেউ থাকেনও, তিনি আবারে বৃঃ-বৃঃ-বৃঃ লিখিব—আজ্ঞা তাঁর হাডের খেলার পুতুল। সৃষ্টি করছেন ডাঃছেন তাঁর খেলার-বত, তুনি কানিলেও বা হবে, না কানিলেও জা হবে—না হবার জা হবেই। যে হ'লে পেল, সে একবারেই করে পেল; যে আর আনবেও না খাঁটবেও না। তাঁর পান-পূনা সূটাই আনেন—তাঁর খেলা জরায়র জন্ম। যেটুকু সূটা একটা বিজ্ঞা খেলা বা ঐশ্বর্যময়িক।

সত্যটাও এক বসনের সমালোচনা। সে-জায়ে উপস্থিত উক্ত অংক সমালোচনা কিন্তু তালপত্র ও বাক-ভাণ্ডার পার্থক্য নিরূপণার্থে যে সমালোচনা এটি তা নয়। সে সমালোচনা এই প্রবন্ধে নজরান করেছেন তবে জা ওকালেক নয় তাঁর অনুবাদক ফিটজিরাড ও তাঁর সমর্থকদের। নজরান বসছেন:

ওব্বকে তাঁর কারো প'ড়ে বঁাধা জাঁকে Epicurean ব'লে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না। ওব্বকে Epicurean বলা যাব শুধু তাঁর 'কুকুরিয়া' শ্রেণীর কবিতার জন্য। ওব্বের কারো শায়া সাকীর ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতার যেহেতু ভাবের প্রগাঢ়তা, অথবা সংযমের আটপাঁট বাধুনি, তাঁর জীবনও ছিল তেমনি।

ফিটজিরাডের যুখে ঝান বেঁধে অনেকের ব'লে থাকেন, ওব্বর যে শায়ারের কথা বলেছেন জা হাকারস, তাঁর সাকীও রক্ত-রাগের। ফিটজিরাড তাঁর হাতের পরিপোষকতার জন্য কোন প্রমাণ দেননি। তাঁর হাতে বত দিয়েছেন ধাঁধা তাঁরাও কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। ওব্বর তাঁর কবাই'তে অবশ্য শায়ার বসতে আঙুরের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ওটা পাশদোর সকল কবিরই 'বলার জন্য বলার' নিলাস।"

অর্থাৎ ফিটজিরাডের ওব্বের কবাইরাতের অনুবাদ পাঠে ওব্বর সবচেয়ে যে একটা অনুভূতি দাবিদারী জোড়-খিলানী হাদুয়ের চরিত্র জোখে জালে নজরান ওব্বের সেই ইয়েকটাকে, সেই ভাববৃত্তিটাকে প্রকৃত ওব্বের চরিত্রের বর্ণনা স্বাক্ষর নয় বলে বসে করেন। নজরনের ধারণা জ্ঞানী ও শায়ার শ্রদ্ধের ওব্বর ইচ্ছা থাকলেও আত্মবিশ্বাস, কোনো অসংযত হ'তে পারেননি—তাঁর হাতে ওব্বর 'শায়ার-বাকীর ছপুই ঘেঁষেছেন,—জায়ে ভোপ ক'রে যেতে পারেননি। জোড়-বৃত্ত বসে এমন আঙুল জুয়েক।' জাহাজ ঐতিহ্যবাহী ধারণাকে নজরান উল্টে বিঙে চাননি। পানলী দাবিতো শরায় ঘেঁষের প্রতীক, সাকী বৃশিদের প্রতীক। নজরান বসছেন—“ইরানে কবিতা শরায়কে অভিহিত কর ব'লে ব'লে বেন না। তাঁরা ধরাককে আনক জুবানককে যোছেন—যে আনক-জুবানী কবিতা কোণার জাকর ওবি সংযমের নয় জুলে বিয়ে আপনাকে আপনি বিভোর হ'রে থাকেন। সাকী কয়েক যোছেন বৃশিকে, জুকে, বিরি সেই আনক-শরায় পরিবেশন করেন।” এই কথা বসার প'র জবাব তিনি একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন এবং সেটা দার্শনিক দৃষ্টির কথা নয়, কবি-দৃষ্টির কথা। নজরান বসছেন:

যাক ও-সব শুধু কথা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই; কেননা আমরা শুধুজিজ্ঞাসু নই, আমরা রসপিপাসু। ওসব কবিতা লিখেছেন এবং ডা চরমকার কবিতা হয়েছে, আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। আমরা ডা প'ড়ে অত্যন্ত আনন্দ পাই;

কবিতা সম্পর্কে এটাই কিন্তু বসস্ত্রের শেষ কথা। দার্শনিক কবিতা লেখেন না, কবিতা লেখেন কবি। সুতরাং বা কবিতা হ'য়েছে তার দর্শন নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? কাব্যানুভূতি স্বভাব বিশেষে এক একজনের কাছে এক এক মূর্তি নিয়ে দাঁড়াবে। নজরুলের কাছে ওসবের তাৎপৰ্য্য একজন প্রজ্ঞাবান বিমূঢ় কবির।

সাহিত্যের উপর লেখা নজরুলের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর রসজ্ঞ দৃষ্টির আলোচনা করা গেল। এবার তাঁর অভিভাষণাবলীর বক্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই অভিভাষণে তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। বেতার বাংলার নজরুল-সংখ্যা, ১৯৭৭-এ ৪৭ রচিত 'সমালোচক নজরুল' প্রবন্ধে তাঁর এনসার্ট হলের প্রতিভাষণ থেকে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার কিকিঞ্চ আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য এই অভিভাষণগুলিতে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেমন তেমনি তাঁর নিজস্ব সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সেখানে তিনি ব্যাপক আলোচনার সুত্রপাত করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিগরে তাঁর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে প্রতিটি অভিভাষণে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা যে একজন সমাজহিতৈষী, দেশপ্রেমিক এবং উদার মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের চিন্তা তাতে কোন সন্দেহ নেই। বোঝা যায় বিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যে মুসলিম আগমন ঘটেছিল তার পিছনে নজরুলের অনান্য অসামান্য। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়াই, কর্মবিমুখতা, প্রগতি বিমুখতা, শিকপচর্চা-বিমুখতা, কুসংস্কার, কুপনশ্রুততা, স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, অনুদায়তা, রক্ষণশীলতা পরশ্রীকাতরতা, ইবাদপন্যাসতা, শরাকতী, ভগ্নাধী প্রভৃতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তবে তাঁর এই সমালোচনা ধ্বংসশীল নয়, সজ্ঞানশীল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে, কুপনশ্রুততা এবং অজ্ঞতা থেকে বেবিধে আলোকে আসতে হবে তাঁরও নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯২৭-এ ইব্রাহীম খাঁকে লেখা পত্রোত্তরে তিনি বলেছিলেন :

বাঙালার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিয়ে, কিন্তু মনে যে কাঙাল, অভিমান্যার কাঙাল, তা আরি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হ'তে।

নজরুলের এই সমালোচনা ছিল বনী মুসলমান সমাজের প্রতি, বর্ষাক্ত স্বার্থপর গোঁড়া মুসলমানদের প্রতি—যাঁরা কবি কাব্য-প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া শুধুরের কথা তাঁকে 'কাকের' 'লবডান' ইত্যাদি শব্দের বিশেষণে তির্যক্যাব দ্বারা পর্যন্ত দ্বিধা করেননি।

কবি এঁদের তির্যক্যাবের গঠনমূলক সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে ইসলামের বর্ষকে যোদ্ধা বৌদ্ধবীজ্য যে-ভাবে গ্রহণ করেছে সত্যিকার ইসলাম তা নয়। সেই চিহ্নিতই তিনি জানিয়েছিলেন যে 'ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন স্বাভূত ও সমানারিকারবাদ।' নজরুলের বিশাল সাহিত্য-জীবনে ইসলামের অনুপ্রেরণার মুখ্য ভূমিকা যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের সারস্বর্ভ তিনি চেয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হ'য়েছিল :

আবুবকর, উসমান, উমর, আলী হাইদার :
 বাঁড়ি যে এ তরবার নাই ওরে নাই ডর
 কাণ্ডারী এ তরবার পাকা হাতি হান্না
 বাঁড়ি বুখে সারি গান লা-শখিক-আনান্না।

ইসলাম যে পৃথিবীতে আজও টিকে আছে প্রধানতঃ উল্লিখিত পাঁচজন মহানবীর অচিহ্নীয় আত্ম-ত্যাগের আদর্শের ভিত্তিতে। ঐশ্বর্যভোগ করার স্বভাব থাকা সত্ত্বেও এরা কোন দিন লোভ-লালসের দ্বারা পরাজিত হননি। সাক্ষাৎ হ'য়েও এই যে অসামান্য আত্মবিশ্বাস এই আদর্শের অটল নিদর্শন ইসলামের আরম্ভের চিরন্তন প্রমাণ। কবির বক্তব্য ছিল এই আদর্শের ভিত্তি যে ধর্মের আছে তার কর্তনও মৃত্যু হ'তে পারে না। মৃত্যুর বিষয় ইসলামের এই বর্মকথাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেমনি তার ধর্মবাহকেরা এবং তাই ধর্মপূজা করেও তাঁরা ধার্মিক হ'তে পারেন না—তাঁরা অধার্মিক থেকে যান। ১৯৪০ এ কলকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউটের ভাষণে এই অধার্মিক ধর্মবাহকারী রাজনীতিকদের ট্রিনি এইভাবে সমালোচনা করেন :

যার অন্তর বাহির সমস্তই রইল আত্মত্যাগের পূর্ণ সেই স্মৃতি আজ বাইরে ত্যাগের গৌরব ও খেলকা পরে কোনো দেশের জাগরণকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর পাথে, জাহান্নামের পথে। --- আনান্না যে ভয় করে--আনান্না স্বভাবের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে যে মুসলমানের—কোরআন মজিদে এক ভয়ও যারা প্রদর্শন করে—তাঁরা জাত ভাইকে জাতিকে এমন বিশ্বাস পথ দিয়ে নিয়ে যার না। এদের খেলকার ভিতরে, এদের চোখা চাপকানের অন্তরে—বাঁদের অস্ত্রশস্ত্র যার, তাঁরা স্বেচ্ছা—এরা স্বস্বার্থের কাবুলীর চেয়েও ভীষণ—দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সিংগাপুরের নাট্যভবনের ভাষণে ট্রিনি বলেন :

আমাদের বাঙালী মুসলমানের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যাশ্চর্য হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকারী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে ঘেরিতে পাইতেন—বেনো জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জনও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুসংস্কার আলিয়া ভিত্তি করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যার, মোল্লাও চক্ষুর্কণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠামোর অপ্রাচ্যর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কতবার জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার বড় জ্ঞান নাই বলিয়া ইহাদের কথা করা যায়। ইহারা প্রায় প্রত্যেককেই “বন-বন শাহু-করীম, বর্জন যে ইট।” ইহাদের নীতি “বুর্জা মোজব-যে যার যা বেলেপ্ত নে যার, বেরা হালুয়া জটি সে কার।”

কুসংস্কারগুলো কি? তা নাহ ক'রে ক'রে তিনি অবশ্য দেখাননি। তবে একটা কুসংস্কার পর্দা প্রথার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন :

আমাদের পথে যোরাহা যদি হন বিদ্যাচল, তাঁহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিবাচল।
আমাদের বাঙলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ তাহাকে অবরোধ বলিলে
অন্যায় হইবে; তাহাকে একেবারে শাসিরোধ বলা বাইতে পারে।--- আমাদের কন্যা-স্বামী
জমদীনের শুধু অবরোধের অঙ্ককারে রাখিয়াই সন্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতার ফলে
কেলিমা ইত্তহাসিনীদের চিরবিশ্বাসী করিয়া রাখিয়াছি।--- খোঁদার রাজ্যে পুরুষ আত্ম জামিন,
নারী আত্ম বজলুহ। ইহাশেরই করিমানে আমাদের এই পূর্ণশা, আমাদের মত হীনবীর্য মতাদের
জন্ম।

আজ থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালী মুসলমান সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প-
চর্চায় মিদারূপ পশ্চাৎপদ ছিল। আর এর মূলে ছিল খোঁদা-বৌদ্ধবাদের ধর্ম-ব্যাখ্যা। সে-ধর্মব্যাখ্যা
দেখা গেছে সমাজের স্বার্থের চেয়ে আত্মস্বার্থবুধী। নজরুল তাই প্রায় কেত্রেই যোরা বৌদ্ধবাদের কথা
উল্লেখ করেছেন তাঁদের 'কজেরাবাজ' ইত্যাদি বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিবিনিবেশের দক্ষণ
বাঙালী মুসলমান সমাজ পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের থেকে অনেকখানি পিছিয়ে ছিল; আর কারণও
ছিল ধর্ম-পুরোহিতদের বিদ্যাচল সন্ধ্যা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার নিষেধ। নজরুল উক্তদের এই নিষেধ অবান্য
করার আহ্বান জানিয়েছেন এইভাবে :

সকল শিল্পের বিরুদ্ধে যোরাহাদের সঠি এই লোকমতকে বদলাইতে উক্তদের আহ্বান চোটা
কলিতে হইবে। তাহাশিককে শিখাইতে হইবে যাহা সুলার তাহাঁতে পাপ নাই। সকল বিবি
নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ডাক্তার নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই,
বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এইসবের বাহাদুর জগদীশ্বর জেঁদা নইয়া
আনিরাছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া বারিয়া কেলিরাছে ও কেলিতেছে।
এই অগাধতার বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি নইয়া বুলিতে হইবে। নতুবা আট্টে বাঙালী
মুসলমানের দান বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না। পণ্ডর মত সংস্কারগিরি হইয়া বাঁচিয়া আমাদের
গাউ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছু না থাকে?

মুসলমানদের উন্নতির আর এক অন্তরার তাঁদের নিজেরদের মধ্যে একতরব ঐক্য। নজরুল তাই
১৯৩৬-এ কবিতাপুর্বে প্রথম ভাষণে বলেন :

জোবাদের কর্তব্য সবিনয়িত হওয়া, সংযত হওয়া। যে ইব্রাহিম সার্বজনীন প্রাণু, যে
একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ, তার জোবে মুসলিম জাতি এক পতঙ্গবীর মধ্যে পৃথিবী অর
করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই—হিংসার, ঈর্ষার, কবহে, ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন।
যেহানের পর দেয়ান তুলে আমরা ডেমবিডেবের জিন্দানখানা সঠি করেছি : কত ভয় নাহ—
নিরা, সুলী, শেখ, সৈয়দ, যোগল, পাঠান, হানাকী, শাকী, হাবলী, বালেকী, না-বজহাবী,

ডুবানী ও আরও কত শতজন। এই শত জনকে একটি বোটার, একটি বুথানের বড়নে বঁধতে পারি জেবাই। শতকা-বিচ্ছিন্ন এই শতজনকে এক সানিল কবো, এক জাবাত কবো সকল ভেগ বিজেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর জাবাতে ডেও ফেল।

আমি বলছি নজরুল তাঁর সবাইকে সমালোচনা করেনও সে সমালোচনা ছিল গঠনবলক। উপরের দুটি উদ্ধৃতি তার প্রমাণ। এইভাবে তিরতীরের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সবাইকে এগিরে দেওয়ার পদ্ধতিতেও আনিরে দিতে ভালোবাসেন।

একটা ব্যাপার কিন্তু বৃষ্টি এড়ায় না। নজরুল বর্ষব্যবসারীদের সোমারোশ করেনও বর্ষকে দিল্পা করেননি। বরং তিনি ইদনান বর্ষের বর্ষগত আদর্শের স্বরূপ তুণে ধরায় চেষ্টা করেছেন। বলেছেন বর্ষের প্রবাস বিক্ষা অপরের জন্য ভাগ্য, নিঃস্বার্থপরতা, স্বাধীনচিত্ততা, আলার পথে আত্মসমর্পণ।

এপর্ভত বা সমালোচনা করবার তাঁর সব কিছু মিনিরে দেখা যাবে যে দেশ, সমাজ, সমাজের মানুষ, বিশ্রামাণ, দেশীর সাহিত্য, তাঁর নিজের সাহিত্য ও বিশ্র-সাহিত্য নিয়ে অনির্বাপ চিন্তায় তিনি সমাজান্ত ছিলেন। সমাজ বিশ্রুষণ ও আত্ম-বিশ্রুষণে কোথাও তিনি অচেতন ছিলেন না। তাঁর শেষ আত্মবিশ্রুষণ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান সাহিত্য সমিতির রক্ত-জুবিলা উৎসবে প্রদত্ত তাঁর শেষ ভাষণ। এই ভাষণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করব:

অনুশ্রবের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ্ পরম শ্রবর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-বন শ্রবর, প্রেম-বন শ্রবর, রস-বন শ্রবর, আনন্দ-বন শ্রবর।--- আমার সর্ব অস্তিত্ব, জীবন-বরণ-কর্ম, জড়ীভ-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে লক্ষ্য করে ডাকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে যিবা নেই, আমার কথা-শ্রবর প্রিয়তম আমার আনিরকে গ্রহণ করেছে।

‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিষের বাণী’র যুগে নজরুলের বহো ‘আনি’রের ভাব দানা বেঁধেছিল। তিনি ‘আনি’রের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এই ব’লে যে ‘পুরুষোক্তব’ই ঈশ্বরের স্বরূপ। মানুষের পৌরুষ-শক্তিই তাঁর ঈশ্বর। পরবর্তীকালে সেই মহতীর আত্মসমর্পণে নিঃশেষ হর। এখানে তাঁরই উল্লেখ করেছেন। পরে বলেছেন:

আনন্দ রস-বন স্বর্ণবর্ণের এক না-জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমার রস করতেন—আগেই বলেছি, তিনি মহাপুরুষরূপে রাখে রাখে হয়ে যান সমাধিবা। তখন আনিও হ’রে যাই নীরব, আমার বাঁশী আর বাজে না।

পৃথিবীর অনেক ভাববালী শিল্পীর বড় নজরুলের ধারণা ছিল যে এক অলক্ষ্য শক্তি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁরই ইচ্ছা শক্তিতে তিনি কর্মশক্তি পান, কাব্য সৃষ্টিতে সক্ষম হন; তিনি সেই প্রেরণাক্রম শক্তি হরণ করলে তাঁর পক্ষে কোন কিছু রচনা করা সম্ভব হয় না। এতে তাঁর সাহিত্যসাধনার উৎসেধাও ব্যাখ্যাত হয়েছে:

হিন্দু মুসলমানে দিল দাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিবেচ, বুদ্ধ-বিক্রম, মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর পরিশ্রম ওপ অজাব —অন্যদিকে মোড়ী অনুশ্রবের বন্ধের ব্যাভে কোটি

কোটি টাকা পাখান দুপের মত জমা হ'য়ে আছে—এই অসামান্য এই ভেলকান দূর করতে আমি এসেছিলাম।

শেষে তিনি বলছেন :

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্য যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার মন মেনে, আমি আমার ব্যক্তিত্বের প্রিয়তমের নিকে চেয়ে গড়ে উঠেছি।

মজলুম-সাহিত্যের আলোচনা ও ব্যাখ্যার উপরিত্ত বক্তব্য সম্ভবতঃ চাবির মত ব্যবহৃত হ'তে পারে। তবে এ-কথা যথার্থ যে তিনি তার প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও পত্রে যে-কথা বলেছেন যে আলোচনা করেছেন সে-কথাগুলোই তিনি তাঁর কবিতাতেও ছন্দে গেঁথেছেন এবং এইভাবে গদ্যো-কবিতায় তিনি আমাদের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনকে সমালোচনা করেছেন।

ধুমাকত্বৰ ঐতিহাসিক পটভূমি

এস. এম. লুৎফৰ মহমান

বাহিৰেৰে প্ৰেক্ষাপট

ঔপনিবেশিক ভাৰতৰ আধুনিক স্বাধীনতাৰ প্ৰেক্ষাপট আলোচনা কৰলে দেখা যায়,—উপনিষদকালৰ পৰা ব্ৰিটিশ ভাৰতে স্বাধীনতাৰ চেষ্টাৰ সূচনা হয়। তৎকালীন ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰথম স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠান—স্বৰাজ্যবাদী বন্দোপাধ্যায়ৰ (ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসৰ পৰা বৰ্খাস্ত) প্ৰচেষ্টাৰ স্থাপিত, 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'।^১ কিছুকাল পৰে এই সংগঠনৰ অনুদ্বৰণে পাবাঙাই দৌলোকাই গঠন কৰে 'বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন'। ভাৰতৰ ১৮৮১তে 'বাহ্যিক স্বাধীনতা' স্থাপিত হয়।^২ এ নতুন প্ৰতিষ্ঠান স্বাধীনতাৰ সংগঠন হিচাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। সংগঠনভাৱে কোন সৰ্বভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ ৰূপ ছিল না। শাখা-প্ৰশাখা ছিল না। সেইজন্য অ্যাসোসিয়েশন হিচাবে প্ৰচেষ্টাৰ ১৮৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ"-কেই উপনিবেশ ভাৰতৰ সৰ্বভাৰতীয় স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠান হিচাবে উল্লেখ কৰা হয়। এ প্ৰতিষ্ঠানৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে বলা হৈছে:

It began as a body not unlike the Indian Association, but it had its committees scattered over the different provinces, and it was this fact which made it into an organisation worth capturing when nationalism had become more effective.*

কিছু কংগ্ৰেছকে কেন্দ্ৰ কৰে স্বাধীনতা কেন্দ্ৰ যে ভাৰতীয়সকল উল্লেখ কৰা হৈছে—জা হিন্দু জাতীয়তা। প্ৰধানতঃ হিন্দু অভিজাত, চাকুৰীজীৱী, বাবলৰী ও বুৰ্জোৱাজীৱীৰ আৰ্হেৰে ৰক্ষক হিচাবে কংগ্ৰেছৰ আত্মকৰ হৈছে। মুসলমানসকলৰ পক্ষৰ পৰা সৈয়দ আহমদ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বোধিত কৰা শুভ কৰ্মে। তিনি এ-প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে মুসলমানসকলৰ বৈশিষ্ট্যৰ স্থাপন না কৰাৰ অনুদ্বৰণে আন। ১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে 'বোম্বাই-লক্ষ্ণৌ একত্ৰীকৰণ কংগ্ৰেছ'ৰ আধীনত কংগ্ৰেছৰ স্বাধীনতাৰ কৰ্মৰাৱৰ্ত্তি কৰিছে তিনি দুটি অভিমুখৰ উৎপাদন কৰে। সৈয়দ আহমদ কংগ্ৰেছৰ আধীনত—আত্মকৰ। সৰ্বভাৰতীয় প্ৰকৃতি নহ'ল; ইংলেণ্ডৰ শাসকসকলৰ সৈতে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পৰ্ক যতটো বৰ্দ্ধিত ও উন্নত হওবা উচিত ছিল, তা বোটেই হয়নি। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘুসকলৰ আৰ্হেৰে প্ৰতিও এ সংগঠনৰ

১. See, A.B. Keith, A Constitutional History of India (London—1936), p. 176.

২. বোম্বাই স্বাধীনতা। আত্মকৰ হিন্দু-মুসলমান (চাকু—পৰিচালিত দ্বিতীয় সংস্কৰণ—১৯৬৭), পৃ: ১৫৮।

৩. H. Thompson & G. T. Garrat. Rise and fulfilment of British Rule in India. (Allahabad—1962), p. 543

বিশেষ দাবী নেই।”^৪ এ বক্তব্য সত্য। কারণ অনুসরণ থেকেই কংগ্রেস ‘জাতীয় ঐক্যের মনো-ভক্তি সমূহকে সংহত করা’র উদ্দেশ্যে:

...demanded inter alia the presence of elected members in the councils, the right to discuss the budget and to ask questions, the reference to a standing committee of the House of Commons of issues between the councils and Governments simultaneous Examinations at a latter age for the civil service, the limitation of military expenditure, and the abolition of the Secretary of State's council.^৫

এসব দাবী স্যার সৈয়দ আহমদের প্রীতিপ্রদ হয়ে হয়নি। সেকালের মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধিতার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থ। প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া-অভিজাত হিন্দুদের বিরুদ্ধে উপনির্বাহন বুর্জোয়া অভিজাত মুসলমানদের শ্রেণী স্বার্থগত দৃষ্টি ছিল স্যার সৈয়দ আহমদের সরকার-ভাষণ ও কংগ্রেস বিরোধিতার আসল বিনিয়োগ। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের জন্ম ও পরিণামে ‘পাকিস্তান’ প্রতিষ্ঠারও ভিত্তি ছিল এই অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী স্বার্থ।

কংগ্রেসের নিজস্ব ভূমিকা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। ও’নালী লিখেছেন:

A few Muhammadans indeed attended the early meetings, but as years went on, the Congress became more and more Hindu in character.^৬

এরনি অব্যাহত সম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের মনোভঙ্গি সমূহকে সংহত ও বিকশিত করে জেলায় সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটি সরকারী কর্মনীতির প্রতিও আক্রমণ ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধি করে তুলতে থাকে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে খোলাখুলি কংগ্রেস নতুন ‘কউন্সিল অফিস’-এর সমালোচনা করে এবং ভারত শাসনে কড়িপুর ভারতীরের নিয়োগ ব্যতীত, সরকারী নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশ নাভের দাবী জানায়। এ সময় থেকেই সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়।^৭ কংগ্রেসের দাবী লাগু আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আবেদন-নিবেদনের স্থর পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সদস্যদের মধ্যে নরম ও চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বালগদাধর ডিনক-এর নেতৃত্বে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ করে।^৮ ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যদের সঙ্গেও নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ তীব্রতা লাভ করতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান সদস্য কংগ্রেস থেকে তাঁদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন। যদিও সন্তোষজনক মুসলমান উত্থানও এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন।^৯

৪. ও’নালী লিখেছেন, পৃষ্ঠা ১৬০।

৫. Keith, Ibid. P. 177.

৬. L.S.S. O'Malley. History of Bengal, Bihar & Orissa Under British Rule (Calcutta—1925), p. 518.

৭. Thompson. Ibid, p. 544.

৮. প্রীতিনির্বাহনকার দায় জেদুদী। প্রীতিনির্বাহন (প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা—১৯৫৬), পৃ: ২৪০।

৯. Thompson. Ibid, p. 544.

কিন্তু জনতন্ত্র প্রচলিত আন্দোলনের তিনক ধারণ করে বিন শতকের অভ্যুদয় হয়। ব্রিটিশ ভারতে প্রথমে প্রচলিত প্রথম ধর্মবর্ষ দেখা দেয়—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দারপুত্র এময়েন্স বিন-এ। ভারতের ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সর্বত্র ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'কনফেস পিটিসিট ধর্মবর্ষ কাঁচি পরিণত হয়'।^{১০} এসব ধর্মবর্ষের প্রথম চারিত্র্য—স্ববিবেচনক পঠ আবার সাপেক্ষে দানিক পক্ষেই সজে আশোষ। কিন্তু বুর্জোয়া-অভিজাত প্রচলিত রাজনৈতিক সংগঠন অপেক্ষা নতুনদের ধর্মবর্ষ সাংগঠনিকতা বৃদ্ধি ছিল। সবরূপে তাঁরা প্রথমে জনতন্ত্র ধর্মবর্ষ প্রতিষ্ঠা করত।

বিন শতকের প্রথম দশকে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রম বিকৃত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব জনআগরণ দেখা দেয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার জনসাংখ্যা বাঙলার সাত কোটি আশি লক্ষ এবং বাঙলা দেশের আয়তন তখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনকে ছাড়িয়ে যায় এবং ক্রান্ত ও জার্মানীর আয়তনের কাছাকাছি পৌঁছে।^{১১} দর্শন কার্জন 'রাউন্ড অ্যাণ্ড রাউন্ড কহিলে' প্রাণ অনেক সবস্যার অনুগ্রহ এ-সমস্তা সমাধানের জন্যও তৎপর হন। তাঁর সরকার এক বড় দেশের প্রশাসনিক অগ্রবিদ্যা বুর করার জন্য বাঙলা দেশকে ভাগ করার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব, বিরোধের সম্মুখীন হলে ভারত সরকার সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অপেক্ষা এ পরিকল্পনার প্রধান বিশেষত্ব হোল, নতুন ব্যবস্থার বাঙলা জবাজবী একটি দেশের বিধানভিত্তি এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা ও সবুজির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অংশ পশ্চিম বাঙলাকে পশ্চাৎপদ পূর্ব বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন করণ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই ঘোষিত স্বপ্নেরা অনুযায়ী বাঙলা বিভাগ ঐ সালের অক্টোবর থেকে কাঁচি পরিণত হয়। ১৮৯ হাজার বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট ও ৫ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত বাঙলার বড়লাট হন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার অ্যাগুস্ট ক্রেচার এবং ১১২ হাজার বর্গমাইল আয়তন ও ৩ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ব বাঙলার বড়লাট হন অগাস্টের টাক কমিশনার স্যার ব্যানকিন্ড কলার।^{১২}

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে এবং ৭টি আগস্ট সারারণ ধর্মবর্ষ আজ্ঞান করে। জনসাধারণ কংগ্রেসের আজ্ঞানে বিপুল সাড়া দেয়। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। ফলে বঙ্গভঙ্গ চালু হবার দিন' ১৬ই অক্টোবর কংগ্রেস কলকাতায় পৌক দিবস পালনের আজ্ঞান জানায়। ঐদিন হরভল, পোতাধিকার এবং রাবী বহন উৎসব পালিত হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে আন্দোলন কিছুটা স্থিতিত হয়ে আসে। তখন লগুনে মহাসভার সমবেদন হয় এবং উদারনী-নীতিকরণ সরকার পঠন করেন। মি: মলি ভারতের জন্য 'সেক্রেটারী অফ স্টেট' নিযুক্ত হন। কংগ্রেস আশা করেছিল তিনি এ-ব্যবস্থা বহিত করবেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে মি: মলি 'সেক্রেটারী অফ স্টেট' বলে ঘোষণা করার আন্দোলন আবার তীব্র হয়ে ওঠে। বিলেতী পণ্য বর্জন ও বিসিতি কাপড়

১০. হীয়েজরার বুর্জোয়ায়, জবজব ও মার্কসবাদ (কমিকাজ—১৯৪৩), পৃ: ৮১।

১১. O'Malley. Ibid. P. 488.

১২. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩০।

দরদর ভাষা নীচকর্তব্যবুদ্ধি করি চলিতে থাকে। 'হুদুদী' পণ্ডিতেরা বাস্তবতার প্রতীক বুদ্ধি পায়। এই আন্দোলনকে হুদুদী আন্দোলনও বলা হয়। আন্দোলন অব্যাহত থাকে অবসার কংগ্রেস ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে "হুদুদী" দাবী করেন।

নতুন বোম্বাই দ্বারা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দরদর ও চরমপন্থীদের বিরোধ সাময়িকভাবে দূর পায়। 'হুদুদী'কে কেন্দ্র করে তারা দেশে আন্দোলনের চেউ হুজিরে পড়ে এবং মুসলমানরাও কংগ্রেসের পতাকা-তলে শরীক হয়। অন্যান্যপাশে ব্রিটিশ সরকার—“কমান্ডন জেনারেলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক অল্প মুসলমান সমাজের কাঁধে ডর করেন। মুসলমানদিগকে বুঝান হইতে লাগিল, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম একাধি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে তথার সংখ্যাগুরু হিসাবে জাহাঙ্গীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।”^{১০} চাকার জমিদার গওয়ান খাঁজা মনিমুহাম্মদ সহজেই কাঁধে পা দেন। শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকারের সাথে কিছু সংখ্যক সামন্ত অভিজাত ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মুসলিম নেতাদের আঁতাত গড়ে ওঠে। তাইসরর লর্ড মিণ্টো তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুরূপ আবহাওয়াতেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের' জন্ম হয়। কংগ্রেসের বিপর্ষিত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের স্বাক্ষরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হয়— 'ব্রিটিশ-রাজের অধীনে দেশের নিয়ন্ত্রিত উন্নতি (The orderly development of the country under the Imperial Crown.)'^{১১} মুসলিম লীগ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দ্বারা অনুসরণ করতে থাকে এবং রাজনীতি কেন্দ্রে বুর্জোয়া অভিজাত-সামন্ত স্বার্থ সংরক্ষক কংগ্রেসের বড়ই, বরং অধিকতর অনুদান ও পাঠা সাম্প্রদায়িকতাসহ, বুর্জোয়া-অভিজাত-সামন্ত স্বার্থ সংরক্ষক সাম্রাজ্যবাদ-সহযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কাজেই পূর্ব বঙ্গের মুসলিম জনতার স্বার্থে বজতক করা আবশ্যিক বলে পেশকৃত সরকারী বুদ্ধি ছিল বিভ্রান্তমূলক ও বিভ্রান্তিকর।

শীঘ্রই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নেতাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হুজিরার দ্বারের এবং বিপিনচন্দ্র পালের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। 'তখন উভয়েজনাতে আশ্রয় করিয়া বাংলার তরুণদের মধ্যে দলগড়ার প্রেরণা দেখা দেয়। ... 'অনুশীলন সমিতি', 'ব্রতী সমিতি', 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রভৃতি নানান দল বাংলার চতুর্দিকে বুঝক শক্তিকে জাগাইয়া তুলে। নেতাদের সহিত ইহার যত স্পর্শক ছিল না।'^{১২} হুজিরার দ্বার-এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলা যায় না। সম্রাসবাদী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন স্পর্শক ছিল না একথা পুরাপুরি সত্য নয়। বজতক কংগ্রেসের চরমপন্থীরাই সম্রাসবাদী সমিতি সমূহের, সর্বক্ষেত্রে না হউক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালক ছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই পাহাণ, রাজা, বোম্বাই ও কাঙ্ক্ষার সম্রাসবাদীদের বোম্বাই আদালত ও শিকলের গর্ভম গুরু হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের 'নিউজ পেপার অ্যাট' অগ্নিতে হুজিরতি দেয়। সম্রাসবাদী কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ, অনুদান থেকে উৎপাদিত মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও বজতক চিরস্থায়ী করার দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের করাচী অধিবেশনে,

১০. জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা ৩৭০।

১১. O'Malley. Ibid, P. 361.

১২. শ্রীমতিলাল দাস। হুদুদী বুদ্ধির স্মৃতি (১৯৩৬), পৃ: ১২০।

পরবর্তীকালে আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অবশেষে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশন সমূহে—কংগ্রেসী কর্মনীতির সমালোচনা, বিরোধিতা, স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী ও স্বতন্ত্র প্রত্নে উন্নত সরকারের জুটিকা ঐকান্তিকভাবে সমর্থন করা হয়। অবশেষে নিম্নলিখিত উন্নত মুসলিম লীগের বিজ্ঞপ্তি অধিবেশনের পর “মুসলিম লীগের দাবী প্রতিষ্ঠান বিলাতে উদ্বাসিত ভারত-গণিত লর্ড বালিকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। অভিনন্দন-পত্রে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের আরো বহু অজ্ঞ-অভিযোগের কথা লেখক লীগ-দাবী বৃষ্টিপ গভর্নমেন্টের দরবারে পেশ করেন।”^{১০} অচিরেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের বৌদ্ধিকতা স্বীকার করা হয়।

ভারতে উন্নত মুসলিম লীগ পুরোপুরিভাবে সরকারী স্বার্থকে নিজস্বের স্বার্থ ভেবে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কংগ্রেসবিরোধিতা, সরকারী কর্মনীতি সমর্থন এবং রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। মুসলমানদের সামসিকতা সম্পর্কে গায় ড্যানেল-টাইন চিরম “উদ্বেগ ইতিহাস” (India Unrest) গ্রন্থে লেখেন :

It may be confidently asserted that never before have the Muhammadans of India as a whole identified their interests and their aspirations so closely at the present day with the consolidation and permanence of British Rule.^{১১}

কিন্তু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনীর দানে লর্ড হাডিংটনের সঙ্গে সুরেস্ত্রনাথের গোপন সমঝোতার ফলে লীগ-নেতৃত্বের অগোচরে ১২ই ডিসেম্বর স্বতন্ত্র রহিত করার কথা ঘোষিত হয়।

১৯১২-তে আন্দোলকে আলাদা করে দাখিলি জেলাসহ সমগ্র বাঙলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল দিগে বাঙলা দেশ পুনর্গঠিত হয়। আর বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা সম্বন্ধে আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বাঙলার গভর্নর নিযুক্ত হন লর্ড কারবাইকেল। মুসলিম লীগ এ ঘটনাকে কিসুদ্বন্দ্বিতাক্রমে ধলে অভিহিত করে। তাঁদের রাজনৈতিক সংকটের পরিচয় দিতে গিয়ে ও’ম্যালি লিখেছেন :

It seemed that the Muhammadan support of Government throughout that agitation had gone for nothing, and the conservative section found it difficult to meet the argument that more was to be got from active agitation than from passive acquiescence.^{১২}

ফলে, মুসলিম লীগের নিকট সরকার সমর্থনের বৌদ্ধিকতা আর রটল না। কারণে আজম মুহম্মদ আলী জিন্দাহ কর্তৃক কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস এ সময়ের বিশেষ ঘটনা। কিন্তু তা বিফল হয়। একদিকে বৃষ্টি সমগ্রবারের বুর্জোয়া অভিজাত-সামন্তদের পারস্পরিক স্বার্থের লড়াই বর্ধন এইমতোবে অগ্রসর হচ্ছিল তখন অন্যদিকে প্রচার লাভ করছিল সম্মানবাদ ও বহু আন্দোলন। সমগ্র বহু মেজুয়ে ১৯০৭ সালে ইট ইতিহাস যেমের এক কারখানার ধ্বংস হয়। এ বছর বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে যে ধ্বংস আঘাতপ্রকাশ করে তার সমর্থনে সম্মানভূতিসূচক বিভিন্ন ঐল লাইনে ধ্বংস দেখা দেয়।^{১৩} রাজনীতির সঙ্গে ধ্বংসবহুয়ের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তাঁর প্রমাণ—

১০. আবুল কাদার দামহুদীন। পলানী থেকে পক্ষিতান (ঢাকা—১৯৬৮), পৃ: ১২০।

১১. O’Mally. Ibid. P. 561.

১২. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৬১।

১৩. মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৩।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর হ' বছর কারাবন্দের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের ছয় দিন ব্যাপী বর্ষবট।

বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এমন বছর আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। জার্মানি ও রাশিয়ার শ্রমিক সংগঠন বৈশ্বিক সংস্কার পরিণত হয়। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ডি, আর্, লেনিন ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থেকে স্বদেশ ও বিদেশের শ্রমিক আন্দোলকে বার্ষিকী প্রাণীভূত হুসংবদ্ধ করে গড়ে তোলেন। প্রথম মহাবুদ্ধের পূর্বে, ভারতীয় কাবু শ্রমী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৈশ্বিক চারিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের "কারাগার হিউম্বর্ক সভা" নামক বছর সং শ্রমিকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।^{১০} কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত এসেপের বছর শ্রমী বর্ষেই আত্মগোপন হয়ে ওঠেনি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের চক্রান্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'লে, কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশেষভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ সবার্তির অব্যবহিতপরে এসেপের বছরদের মধ্যেও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য সংগঠন তৈরী প্রেরণা প্রবল হয়।

পরবর্তী অবস্থা

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী ব্যাপী প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কাব্য। যুদ্ধের জন্য পণ্য, অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় বুর্জোয়া শিল্পপতি ও সামন্ত রাজস্ব-বর্গের নিকট সহযোগিতার আবেদন জানায়। ব্রিটিশ ভারতীয়দের নিকট থেকে বিপুল সাড়া পায়। উপনিবেশ-ভারত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে অর্থ, সৈন্য এবং শিল্পস্রব্য বোঝান দেয়।^{১১} যুদ্ধ শুরু হবার এক বছরের মধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন পতি সত্তর করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বায়ত্বশাসন অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে একত্রিত হয়। এ-অধিবেশনে স্যার এস, পি, সিংহ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব কি তা প্রকাশ করার দাবী জানান।^{১২} মিসেস জ্যানি বেনার্স পরবর্তী বছর 'ভারত ভারতবাসীদের' এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'হোমরুল' তখন আর একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ছিল না। কলে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আও একটা সাধারণ দাবী উচ্চারণ করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতকে স্বায়ত্ব শাসন দানের প্রতিশ্রুতি দেন। যুদ্ধকালে ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি পুনরায় লাভের জন্যও সরকারকে তুরস্কের উবিদ্যাত সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হয়। কারণ যতদূর যুদ্ধের পর বিজয়ান্তর ঘূরতিসিদ্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠার ততদূর সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। সরকার এ-অবস্থার তাঁপেরকেও আই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন যে, যুদ্ধের সময় ভারত ব্রিটিশ রাজকে সাহায্য করলে তুর্কী খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করা হবে না; তুরস্ক দখল করা হবে না। আশ্বাসে পরিভূত মুসলিম লীগ পুনরায় সরকার সর্বত্র নীতি গ্রহণ করে এবং যুদ্ধকালে কংগ্রেসের দ্বারা লীগ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সর্বপ্রকারে সহায়তা দানে অগ্রসর হয়।

১০. দ্বৈতপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ: ৮৩।

১১. Kish, Ibid. P. 240.

১২. এ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪২।

কিন্তু চেম্‌বোর্ড কাই প্রতিশ্রুতি দিবার কোন—বুলাও ভারত সরকার তখন—বিত্তিসিপিলাস কন্ট্রোল, কোম্পানী বোর্ড শেয়ার প্রতিশ্রুতির সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশাসন বিভাগে সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আইন পরিষদেরও তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জোটের যোগ্যতা নির্ধারিত করা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হতে চাননি।^{২৩}

কিন্তু স্বল্প সময়ের পর জাই 'কলার পরিবর্তে বুলো'—অসহযোগ পরিষদের বসেও চেম্‌বোর্ড শাসন-তান্ত্রিক সংস্কার ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এ উপহার প্রত্যাখ্যান করে। অসহযোগ বৈরত একে 'চিরস্থায়ী দাঙ্গার' নামে অভিহিত করে বলেন যে, একমাত্র বিশুদ্ধতার দাবীই এ-অসহযোগ অবসান ঘটানো যাবে।^{২৪} ১৯১৭-তে কংগ্রেস ১৫ বছরের মধ্যে পূর্ণসার্বভৌম স্বাধীন জাতির কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯১৯-এর রাউলার্ট আইন এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরো উত্তেজিত করে তোলে। পাঠ্য এ-আইনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কলে শীতলই সেখানে সাময়িক আইন জারী হয়। হাটটান-কমিটি পাঠ্যের বিরুদ্ধে বিকোডকে প্রকাশ্য বিতর্ক বলে ঘোষণা করে। বিলাকত প্রস্তুত মুসলমানরাও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। গান্ধীজীর সভাপ্রবাহ আন্দোলন এসবর শুরু হয়।^{২৫} এপ্রিল মাসে কলকাতার হরভানকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। সেমাবাদীজীর সাহায্যে সরকার পরিস্থিতি আরও আনেন। তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের পক্ষপাতবুলক বসোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। বোম্বকা কামাল পাশার অভ্যুদয়ের ব্রিটিশ সরকার দমনের প্রয়াস পায়। শেষে জর্জ কর্তৃক বোলাখুলি তুরস্ক গ্রাস করার কথা কীল হয়ে পড়ার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সভাপ্রবাহের পাশাপাশি মুসলমানগণ বিলাকত আন্দোলনও শুরু করেন। এরনিজাবে বৃহৎকালে সরকারের প্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি পালিত হওয়ার পরিবর্তে দেশবাসী লাভ করে একটি দাঙ্গাবুলক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, সাময়িক আইন ও নিষিদ্ধ—তথা বিশৃঙ্খলাবৃত্তি এবং তৎসহ বৃদ্ধির সকল দরদর কুল ও বোলা। এসবরকার অবস্থার বর্ণনা দিতে গিরে নেহেরু লিখেছেন :

A better sense of humiliation and a passionate anger filled our people. All the unending talk of Constitutional reform and Indianization of the services was a mockery and an insult when the manhood of our country was being crushed and the inexorable and continuous process of exploitation was deepening our poverty and sapping our vitality.^{২৬}

এবন অবস্থার কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যক্রম; অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি-ভেদী হয়।

প্রথম কিন্তু বৃদ্ধের পর এদেশের শ্রমিক আন্দোলনেরও অগ্রগতি বটে। শ্রমিকদের রাজনীতি ব্যাপকতা ও পটভূমি লাভ করে। বৃহৎকালে শ্রমিক জনতার আন্তর্জাতিক সংহতির ভিত্তি স্থাপন হয়। গোভিন্দে জন-প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়। রাশিয়ার বলশেভিক সরকারের প্রতিষ্ঠার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সপ্রমাণিত হওয়ার তার চেয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষও তা' থেকে বাস যায়নি। তখনও এদেশের শ্রমিকদের কোন পটভূমি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। শ্রম-

২৩. Keith. Ibid P, 242.

২৪. See. O'Mally, Ibid. P. 576,

২৫. Jawaharlal Nehru. The Discovery of India (India, Reprinted—1964). P. 378.

কারখানার তাঁদের অধিকাংশ ছিল অকর্মণীয় দুর্ভাগ্যব্রত। লক্ষ লক্ষ অল্প শ্রমিক খেঁকায় হয়ে পড়ে। জিভিল পত্রেস দাব হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের আর ক্ষেত্রেনি। এ-অবস্থার কোন ঝঁকট লক্ষ্য হতে পারে না।^{২৬} তথাপি ১৯১৯-এর প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের ঝঁকট প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক বোম্বাইয়ান করে। ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই, বাক্সাজ, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক আন্দোলন দেখা দেয়। কানপুর শপথকালে, জাহানপুর রেল-কারখানার কলকাজী পাটকলে, পোলাপুর কাপড়ের কলে, জাহানপুর টাটা কারখানার শ্রমিক ঝঁকট বদায় বড় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ছ'মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ২০০টি ঝঁকট অংশ গ্রহণ করে। ১৯১৯-এ স্বাধীন রাষ্ট্রনাট আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বার বার হস্তাক্ষেপ ও পোড়ানো পালন করে।^{২৭} ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর লাল লাক্ষপত রায়েস সভাপতিত্বে কোলকাতা শহরে “নিম্নলিখিত ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর” প্রতিষ্ঠা হয়। শিল্পকারখানার শ্রমিকদের এইটিই প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

পুঁজিবাদী ব্রিটিশ শাসকদের নিকট তৎকালীন ভারতের এসব ঝঁকট তখনো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। শ্রমিকদের উপর তালি চালনা, তাঁদের যেকোন, কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি রকম নির্বিকারে তারা অত্যাচার করতেন অসীম প্রকাশ করেনি। তবে, ‘কমিউনিজমের সংক্রমণ থেকে ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোই ব্রিটিশ বুর্জোয়া সর্বাধিক উদ্বেগ অনুভব করছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লরেন্স জর্জ, উইলিয়াম উইলসন, হার্বার্ট হডার প্রভৃতির লেখায় ও বক্তৃতায় “ইউরোপ বলশেভিক হয়ে যাচ্ছে”—এই আশঙ্কা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯২৩ অবধি ইউরোপে সমাজ বিপ্লবের ব্যাপক আশঙ্কা অব্যাহত থাকে। ইউরোপে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের ‘গোদের উপর বিবর্তিতার বড়’ তরঙ্গে যোড়কা কানাল পাশা অত্যাচার হয়। যথা প্রচোয় দেশগুলোতে বিদ্রোহভাব দেখা দেয়। আরার্ম্যাণ্ডও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। ভারতেও রাজনৈতিক আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর প্রত্যাখিত অসহযোগ-নীতি এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে মহাত্মা গান্ধীর সত্যায়ন-নীতি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বিলাকত সম্মেলনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গৃহীত হয়। অতঃপর মওলানা বোহান্দ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বিলাকত সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইউরোপে গমন করেন। কিন্তু তাঁদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়।^{২৮} সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বিরোধিতার কথা নিয়েও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। গান্ধীজী বোম্বাই করে—‘অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে এক বছরের মধ্যেই ‘স্বাধীন’ অর্জিত হবে।’^{২৯} কিন্তু স্বাধীনতার কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। এবং আইন পরিষদের নির্বাচন—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করে। আইনজীবীগণ আমলত ও হুজুরা ইউরোপীয় শিকার বর্জনের জন্য ফুল,

২৬. Sd. Nehru. Ibid. P. 374.

২৭. বুধোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪-৮৫।

২৮. তালুকদার, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৭-০৮।

২৯. O' Malley. Ibid. P. 584.

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী বেজাম্বারীরা বেজাম্ব বর্জন করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় কুড়িজনক অস্বগ্রহণ করে।^{৩০} খুব কম সংখ্যক আইনজীবী আদালত বর্জন করেন। বেজাম্ব ত্যাগ করেন কারে একজন। আর কয়েকজন অবৈজম্বিক ব্যালিস্টেট ও পুলিশ অফিসার চাকুরীতে ইস্তফা দেন। কমকাজের 'গৌড়ীর সর্ববিদ্যাবত্তর' নামে একটি পেশীর বিশ্ববিদ্যালয় ও মকামদের বিভিন্ন বসনে পেশীর শিক্ষারতন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহাত্মা গান্ধী লোক ত্রাণ বর্জন, বন্ধন প্রচলন ও চর্ক। ব্যবহারের আবেদন জানায়। অক্টোবর মাসে তিনি সাময়িক ও বেসাময়িক উভয় প্রকার জারজীর জনসাধারণকে এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত আনয়ন। ৩১শে ডিসেম্বর তিনি সরকারী কবজা এবং সরকার ও জর অহিনের অবমান ঘটানোর জন্য বেসাময়িক অত্যাচারের পরিকল্পনা পেশ করেন।^{৩১} বলোনিতে কম বহুতরও সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই নিরাশ্রিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি। মহাত্মা গান্ধী অহিংস উপায়ে অস্বগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে বার বার অবহিত করলেও আন্দোলন বীথুই সহিংস পথে পা বাড়ায়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেস যেচ্ছালেবকলন বৃদ্ধ প্রদেশের পৌরকপুত্র জেলার জোরিজেরা থানা অস্বগ্রহণ করে ২০ জন কনস্টেবলসহ গারোথাকে পুড়িয়ে রাখে।^{৩২} ঘটনার আভ্যন্তরিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাখ্যার করেন। এ সময় একটি রাজস্বোবদলক রচনা প্রকাশের অত্যাচারে অস্বগ্রহণ ৬ বছর বিনাশ্রুত কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জাহাঙ্কা...

Proceedings taken against local leaders guilty of lawlessness, and the break-up of organizations pursuing methods of intimidation and violence.

তখন অধিকাংশ রাজনৈতিক নেত্রা ও কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপর্যয় নেমে আসে। নবমাত্র বিনাকৃত আন্দোলন তখনও চলতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসবুহের মধ্যে স্ভাবন না থাকার ঐক্যের অভাবে তাঁদের কোন কর্মসূচী ও প্রত্যাখ্য-মসহযোগ আন্দোলনের স্থান অধিকার করতে পারেনি। কলে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাখ্য হওয়ার ও বিনাকৃত আন্দোলন স্থিতিত হয়ে পড়ায় সেন্যাপানী রাজনৈতিক পুন্যাতা, হজালা ও নৈরাশ্র্য দেখা দেয়।

শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ চ'মাসে শিল্পকারখানার মোট ১০৬টি বর্ষাট অনুষ্ঠিত হয়। জাতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে।^{৩৩} পরবর্তী বছর আগাবের চা-বাগানের শ্রমিকগণ দীর্ঘ জাহাঙ্কি মাস ব্যাপী বর্ষাট চালায়। বর্ষাট শ্রমিকদের উপর লক্ষণ নির্বাচন চলে। বালিক পক্ষগুলি চালায়। তবু বর্ষাট অব্যাহত থাকে। তাদের সর্বধনে আগান-বেজল হেল

৩০. Keith, Ibid, P. 227.

৩১. O'Malley, P. 585.

৩২. Sec, O'Malley. Ibid P. 603.

৩৩. জাহাঙ্কিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১১। এবং Keith, Ibid. P. 283.

৩৪. O'Malley, Ibid, P. 612.

৩৫. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬১৪।

শ্রমিকরাও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট পাগল করে। এবছর শুধু বাতাইল দেশে ১৪২টি ধর্মঘট কার্কে পরিণত হয়। ২ লক্ষ ১২ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সাম্প্রতিক রূপ লাভ করে। ১৯২১-এ অক্সফোর্ড অধিবেশনে তার প্রথম রাজনৈতিক রূপ প্রত্যাক্ষ করা যায়। ইউনিয়নিস্টরা স্বরাষ্ট্রের দাবীতে প্রত্যাহ পাশ করেন।^{৩৩}

এসবর ফলস্বরূপ মুজব্ব্বর আহমদের নেতৃত্বে শিবিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টিও গঠিত হয়। ১৯২২-এ রেল এক কারখানার শ্রমিকরা দেড়মাস ব্যাপী ধর্মঘট চলার। ইন্সট ইতিহাস রেলওয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘট অর্থাভাবে ভেঙে পড়ে। বহু শ্রমিক কর্মী দলিলদের বিশ্বাসঘাতকতার নির্দোষী হন। তথাপি ধর্মঘটে সরকারের দোষ কোটি টাকারও অধিক লোকসান হয়। শিবিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের অধিবেশন এ-বছর কলকাতায় বসে। তাঁরা বিনিমিত্র ব্রহ্মা কর্জন, চর্কা প্রচলন ও গান্ধীবাদের প্রতি আনুগত্য আদায়। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভারতীয় বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দেশে কংগ্রেস ও বিনাকৃত আন্দোলনের সমর্থনে সার্বভূমিক নেতৃত্বের পত্রিকাভূলে কাজ করতে থাকেন।^{৩৪} ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের বিপর্যয় তাই বিনুলভাবে রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে বুর্জোয়া-অভিজাত সামন্ত শ্রেণী, স্বাধীন শ্রেণী এবং শ্রমিক কৃষক জনসাধারণ তথা সকল শ্রেণীর-ই মানুষ সেকালে বেশ চোখ ঝাঁকানো আলোর বন্যা থেকে হঠাৎ অন্ধকারে বেঁধে ফেলে যায়। সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে আলো, আশা, উজ্জ্বলতা, কর্মপ্রেরণা, চাক্ষুস প্রায় একেবারে লুপ্ত হয়।

দেশকাল ও সমাজের এই প্রেক্ষাপটেই উল্লেখ কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনার বিশুবী বাতাইল বৃংশত্রয় রূপে “ধূমকেতু”র প্রকাশ। ‘ধূমকেতু’র বৃকে একালের প্রায় সকল লক্ষণ স্পষ্টরূপে অভিযুক্ত। কিন্তু ‘ধূমকেতু’ হতশাশ্বত লালন করেনি। সকল নিরাশা, নিষ্ক্রিয়তা ও বিনুততা কাটিয়ে বাতাইল জনতার যেন আবার আত্মবিশ্বাস সকারণের ব্রত নিয়ে ‘ধূমকেতু’র উদয় হয়। তখন শাসকের সঙ্গে শাসিতের বিরোধই শুধু দেখা দেয়নি; শাসকশ্রেণীর বিশ্বাস্যাপী পুঁজিবাদী বৈজ্ঞানিক সংঘের মধ্যে অভ্যবহার, পুঁজিবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের বিরোধ; স্বাধীনতার দাবীতে জনতার সঙ্গে অবিধেবাদীদের বিরোধও তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময় বাতাইল দেশের স্বাধীন রাজনৈতিক আবহাওয়ার জীবনের সর্বক্ষেত্রে আবর্ত রচনা করে “পূর্ণ স্বাধীনতা” লাভের রাজনৈতিক দাবী-ই ‘ধূমকেতু’র কাল পরিচয়ের তারকা চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী ও সমকালীন অপর কোন পত্রিকা ঐ-কৃত্তির অধিকারী নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ-বলিষ্ঠ ও সোচ্চার কণ্ঠে জনময় ‘ধূমকেতু’ আজও তুলনায় দ্বিতীয় বহিত।

৩৬. O'Malley. Ibid P, 608.

৩৭. পুনরায় কোণী। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট (৩য় প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪৪), পৃ: ৮।

স্মৃতি-সভার আলোকে টি. এস. এলিয়ট

সিদ্ধিকুর রহমান

এলিয়ট-এর কবি-বাসন ও তাঁর নিষ্পনোষ আলোচনা করার আগে একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়া দরকার যে তিনি কোনো প্রকার অস্পষ্ট জীবনবোধ দ্বারা আকৃষ্ট নন। মনে কাব্য রচনা করেমনি। অগ্ন ও জীবন তত্ত্বাচ তাঁর কাব্যের বিষয়বস্ত সম্পর্কে তিনি সজাগ। স্বীকার্য, তিনি কাব্য রচনার অবিকার্য ক্ষেত্রে Contrapuntal method-এর আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ'ও বলা দরকার উক্ত বোধ-এর মধ্যস্থ ব্যবহার কেবলমাত্র অসাধারণ কবিরের দ্বারাষ্ট সম্ভবপর।

জাহাঙ্গী আরেকটি দিক'ও রয়েছে যা যে কোনো কবির জন্যে আদর্শ হওয়া উচিত। কবিতা রচনার জন্যে প্রচুর পড়াশোনা থাকা দরকার। এলিয়টের সৃষ্ট অগ্নকে বুঝতে চলে বিপুল সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাথে ঘোঁরাবুটি পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কবিতা তাঁর কাছে বুধূর্তের উচ্ছ্বাস-কেন্দ্রীক নয়। এর সাথে রয়েছে মানবিক সভার আশ্রিত প্রয়াস যা দ্বারা বিশেষ বুধূর্তের উচ্ছ্বাসকেই সীমিত নয়। মানুষের ইতিহাস সভাজ্ঞা ঐতিহ্য কবিতার মল্লভারী গায়ে বেধে অপূর্ব সৌন্দর্য চরমে নির্ধারিত। আর এখানেই এলিয়টের সৃষ্টি-মৈশূণ্য।

গোপেনহায়ার (১৭৮৮-১৮৬০)-এর প্রেট গ্রন্থ The World as Will and Idea প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। এ গ্রন্থে বিখ্যাত তাঁর চিন্তাধারা দর্শনের অগ্নতে 'দানোড়ন' সৃষ্টি করেছিলো। তিনি বলেছেন, সব কিছুর প্রাথমিক স্তরে যা দিশেবল নাজ করে খায় তা হচ্ছে ইচ্ছাপন্থি। তিনি বোঝাতে চান, ইচ্ছাপন্থির সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের মরণীয় মূলসূত্র। এবং 'উই' হচ্ছে মূলত: ক' প্রকৃতির।

গোপেনহায়ার মানুষের সহজাত দুর্বলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ডক্টর স্যান্ডোরন জমদাস সম্ভবতঃ ওই বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করে মজবুতরূপে বলেছিলেন, কোনো কিছই অতোটা তুচ্ছ নয় যতোটা তুচ্ছ হচ্ছে মানুষ নামের জীব-- Nothing is insignificant to so insignificant a creature as man.

এলিয়টের চিন্তাধারা প্রায় কাছাকাছি হলোও একটু ভিন্ন ধরনের। তিনি তাঁর Essays Ancient and Modern গ্রন্থে লিখেছেন We must apply the whole history of our civilization upon our particular emergencies.

মানুষকে তিনি বাঁচো করে দেখেননি। অসন্ত শক্তির সাথে মানুষের সংঘাত চিরন্তন। আর ওই অসন্ত অস্থির অকল্যাণকর প্রতিক্রিয়া তাঁর মানসিকতার বিপরীতের সূচনা করেছে সত্যি কিন্তু তিনি কখনো বিবাক্ত হয়ে পড়েননি।

এলিরট বলছেন :

The knowledge imposes pattern and falsifies,
For the pattern is new in every moment
And every moment is a new and shocking
Valuation of all we have been.

["East Coker," II]

এলিরটের কাব্য সৃষ্টির সাথে অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন বিজড়িত। তবে তা কভোখানি, এম্বিয়ারে নিছক দেয়ার আগে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়া যাক।

হে, এর, শ্বাইয়ার অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা প্রদান করার প্রয়াসে বলছেন, Existentialism is a philosophy of crisis—Christianity and Existentialism. শ্বাইয়ার সংকটের দর্শন প্রত্যক্ষ করছেন অস্তিত্ববাদে। আর এ দর্শনটা কি তার প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বলছেন খুঁটবর্ন ও অস্তিত্ববাদের কথা। উভয়ের মধ্যে বিরোধবান মধ্যে অস্তিত্ববাদের মূল উপাদান রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। তবু সংকট কেনো এবং কোথায় তার সুস্পষ্ট দ্ব্যব উন্মিষিত বক্তব্যে অনুপস্থিত।

'সংকটের দর্শন' কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রাল্ফ হারপার তাঁর Existentialism, a Theory of Man গ্রন্থে। হারপার বলছেন :

Man is on the operating table, naked, ashamed, worried; he faces pathologists rather than surgeonsMan's nobility as well as his misery is on display.

মানুষ অস্ত্রোপচারের টেবিলে শায়িত। উলঙ্গ লজ্জিত অসহায়। প্রয়োজন হলো Surgeonদের অথচ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে pathologists। কল একদিকে যেমন মানুষের বহুস্তর প্রকাশ ঘটছে, তেমনি আরেক দিকে তার মূখ্য যাতনারও প্রদর্শনী হচ্ছে।

যদিও 'অপারেটিং টেবিল'-এর সাথে 'লাশকাটা' ঘরের তেরা কোনো একটা বিল নেই, তবু জীবমানস লাশ-এর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা যায় :

শোনো

তবু এ-মৃতের গল্প;—কোনো

নারীর প্রথমে বার্থ হর মাই;

বিবাহিত জীবনের সাধ

কোথাও রাখেনি কোনো বাপ,

সবরের উত্তরমে উঠে এসে মধু

মধু—আর মননের মধু

দিয়েছে জানিতে;

হাড়হাতাতের গ্রামি বেদনার শীতে

এ-জীবন কোনো দিন কঁপে ওঠে নাই,

তাই

লাশকাটা ঘরে

চিং হ'রে শুরে আছে টেবিলের 'পরে।

জামি—তবু জামি
 সারীর স্বপ্ন—শ্রম—শিত—গৃহ—গর সখ্যামি;
 অর্থ ঘর, কীতি ঘর, সঙ্কলজ ঘর—
 আরো এক বিপন্ন বিগ্নার
 আবারের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
 বেলা করে;
 আবারের ক্রান্ত করে
 ক্রান্ত—ক্রান্ত করে,
 লাশকাটা ঘরে
 সেই ক্রান্তি নাই,
 তাই
 লাশকাটা ঘরে
 চিং হ'বে ওরে আছে টেবিলের 'পরে।

[বহাপুণিণী]

না, অস্তিত্ববাদের কথা বলছিলেন। উক্ত অংশ জীবনামল দাশের সহঃ কাব্য প্রতিভারই ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু 'লাশকাটা ঘরে' জীবনের অনিবার্য পরিণতি কিংবা এর দর্শাত্মিক বিষয় ভাবনার নবো অস্তিত্ববাদ নেই। অত্ৰোপচায়েন টেবিলে মুমূর্ষু বোর্থা'র জটিলপূর্ণ চিকিৎসার চিত্র ভুলে ধরার নবো বর্ষের প্রতি যে উল্লেখ্য ইঙ্গিত রয়েছে কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই অস্তিত্ববাদের মূল মূল সম্পর্কে আঁচ করা যায়।

এলিয়টের কবিতার অন্তর্ভুক্ত, বাসি মৃত্যুর চিত্রকল্প পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। আর এই চিত্রকল্প অস্তিত্ববাদী ধারণা থেকে উৎসারিত। কেনোনা বাসি মৃত্যু জীবনের চরম অসফলতারই প্রমাণ। Four Quartets কবিতার বাধ্যতাসূচক দৃষ্টান্তে এলিয়ট উল্লেখ করতেন:

Our only health is disease
 If we obey the dying nurse
 Whose constant care is not to please
 But to remind of our, and adam's cur
 And that to be restored, our sickness must
 grow worse.....

এলিয়টের বাক্যচেষ্টার অস্তিত্ববাদের লক্ষণ রয়েছে। 'তবু' বলা যায় অস্তিত্ববাদ তেমন কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, The absence of logical consistency in existency in existential thought is a common charge levelled against it, and that perhaps rightly. সম্ভবতঃ এ ধরনের ধারণা এলিয়ট নিজেই পোষণ করতেন। তাহলে এলিয়টের জগৎ বর্ষীয় মূল্যবোধের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। জীবনের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি তা হচ্ছে মূলতঃ দর্শাত্মিক। পার্থক্য দৃঃ যতদূর যৌব-বিবাহ নিবেই

তিনি জীবনকে বিচার করতে চাননি। নির্দিষ্ট সময়ের পত্নীতে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না-হলেও, পরিচিত অঙ্গভঙ্গির বাইরে এবং যা সময়ের সীমারেখার নির্দিষ্ট নয় এমন কোনো মূল্যবোধের প্রতি আস্থা রাখাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিষয়টীর ব্যাখ্যা তিনি করেছেন এভাবে :

The real issue of our time is not between those who believe in recourse to war and those who do not : the frontiers are vague. The real issue is between..... those who believe only the values realizable in time and on earth, and those who believe also in values realized out of time.

['The Criterion,' P. 68]

আর এই যে ধর্মীয় সমুদ্ভূতি, তা কি প্রচলিত অর্থে এলিয়ট-এর ধ্যান ধারণাকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলো ? সোজা জবাব হচ্ছে ; না। ধর্মকে তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে থেকে বিচার বিশ্লেষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে এ. জি. অর্জ বলছেন :

The religious man need not necessarily be a Christian (or a follower of any particular variety of religion). Even an atheist who in all earnestness and sincerity repudiates all belief in God is religious, according to Eliot. The essential point is that one should seriously consider the spiritual problems.

[T.S. Eliot : His Mind and Art]

ধর্মের ব্যাপারে তাঁর উদার মনোভঙ্গী প্রশংসনীয়। ধর্মীয় কোম্পলে যেতে তিনি মারাত্মক। আনন্দ কথা হচ্ছে আত্মরিক্ততা। কেউ যদি জন্ম দিয়ে সৃষ্টির সাহায্য অনুভব করতে ব্যর্থ হন অথচ তাঁর কথা ও কাজে কোনো প্রকার ডবিতা নেই, তাহলে তিনিও ধার্মিক ব্যক্তি। এলিয়ট তাই বিশ্বাস করতেন।

অবশ্য অস্তিত্ববাদের সারবত্তা যে এলিয়ট অস্বীকার করেছেন, এমন নয়। অস্তিত্ববাদের উৎপত্তি সম্পর্কে কিলিপ ব্লেইসেটের বক্তব্য প্রবিধানযোগ্য :

Existentialism is a reaction of the philosophy of man against the excesses of the philosophy of ideas and the philosophy of things."

[Philip Mairet : Existentialism and Humanism]

অস্তিত্ববাদ হচ্ছে মানুষের জীবন-দর্শনের এক প্রকার বিদ্রোহ। এবং ওই বিদ্রোহটা হচ্ছে দর্শনের অনাবশ্যক ছড়াছড়ির বিরুদ্ধে।

এদিক থেকে এলিয়ট-কাব্য-অঙ্গভঙ্গির সাথে অস্তিত্ববাদের যোগাযোগ অনস্বীকার্য। যে-কোনো জীবন-ধর্মী লেখকের লেখার অস্তিত্ববাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কেনোনা জীবনের মৌলিক সত্য এক নিয়তির অনিবার্য প্রতি প্রকৃতি সম্পর্কে সত্যের লেখক কিংবা শিল্পী ইচ্ছে করলেও অস্তিত্ববাদের প্রস্তু থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন না।

বাস্তব কি ?

এলিট এবং হিটল উভয়েই বিশ্বাস করে :

Man is essentially limited and imperfect endowed with Original Sin, a wretched creature who can yet apprehend perfection, though he can never reach it.

আদি-পাপ থেকে বুদ্ধির পথ নেই। Wretched creature এবং সিন্টিমেন্ট-এর innocent frail প্রায় সবধৰ্মী। অসহ্য মানুষ ভবু আদি-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বুঝে। অথচ তার এ প্রচেষ্টা কখনো সফল হবার মর। কিন্তু কোমো এমন হয়? এর জবাব আনন্দিকভাবে পাওয়া যায় Animals কবিতার :

The heavy burden of the growing soul
Perplexes and offends more, day by day ;
Week by week, offends and perplexes more
With the imperatives of 'is and seems'
And may and may not, desire and control.

প্রত্যেক শিল্পীরই জীবন সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য কিংবা জীবন দর্শন থাকা চাই। শিল্পীর বৈশিষ্ট্যও এখানে। এলিট বলছেন : Life is an act of faith। বিশ্বাস—জীবনে বিশ্বাস, বুলাবোঝে বিশ্বাস, নিজের প্রতি বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস—যহৎ শিল্প রচনার শিল্পীকে উৎসাহ করে। শিল্পী যদি মিজেই কোমো কিছুতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হোন, অপেক্ষেও তিনি বিশ্বাসের কথা বলতে পারেন না। এর ফলে শিল্পীর অপেক্ষে দেয়া হয়তো কিছুই থাকে না।

তাই, এলিটের কাছে জীবন হচ্ছে বিশ্বাসের প্রক্রিয়া।

এলিটের ওই মানসিকতার কিরেকোর্পার্ডের প্রভাব স্পষ্ট। কিরেকোর্পার্ড বলছেন, :

সে (মানুষ) অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণই থেকে যায়। পাপ-প্রবণতা তার বোধো বিদ্যমান। ভালো করার ক্ষমতাও সীমিত। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো আত্মিক বুদ্ধির সন্ধান।

সব ব্যাপারেই পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের ওপরে অসীমিক ঘটনার প্রাথমিক ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

মানুষ হচ্ছে অসীম ও সীমিত ক্ষমকাল ও অনন্তকাল, বুদ্ধি ও আবেশকতার সংশ্লেষ—সংক্ষেপে বলতে গেলে সে হচ্ছে একটা সংশ্লেষ।

গোপেনবাহার মনে করেন :

Pain is the fundamental and positive condition of existence and evil is inseparable from human nature. [World as Will and Idea]

বেদনা বস্তুত্বাত্মক পূর্ব-শর্ত। মানব প্রকৃতির সাথে অন্তর্ভুক্ত ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অথচ এর কোনো সীমারেখা নেই। আদিও নেই। অন্তও নেই।

কের্স-এর মতে 'উদ্ভাবন, অজ্ঞান, বর্তমান ঘটে কিছুই নেই।'

জাহ্নবে সবকিছু নির্দিষ্ট করা বাবে কিভাবে? এর জবাবে তিনি বলেন :

Duration knows no such distinction. The past exists in the present which contains

the future. The concrete and ever present instance of duration is life, for each of us living individuals is his own time.

এলিরট Burnt Norton কাব্যে ওই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন :

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.

The Dry Salvages—এর এলিরট আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ অনন্ত-বর্তমানের প্রোতে বাঁধা পড়লেও, বৃহত্তর বলক মাঝে মাঝে আরো কিছু রহস্য, আরো কিছু অব্যক্ত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে :

It seems as one becomes older
That the past has another pattern, ceases to be a mere sequence
The moments of happiness—not the sense of well-being
Fruition, fulfilment, security or affection
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience, but missed the meaning,
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

মাকবেথের অবিস্মরণীয় স্বগোষ্ঠি... Tomorrow and to-morrow and to-morrow স্মরণে রেখে এলিরট বলেছেন :

There is no end, but addition : the trailing
Consequence of further days and hours.....

‘ওই পটভূমিতেই উচ্চারিত হলো Moments of happiness..... the sudden illumination.

আর এর মাধ্যমেই জীবনের অর্থহীনতার নিগড় থেকে বুদ্ধির নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায়।

এলিরট বের্গসের মতবাদ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে শাটভর করে তুলেছেন :

I have said before
That the past experience revived in the meaning
Is not the experience of one life only
But of many generations...

কিন্তু যেই 'সব' ব্যাপারটাকে metaphysics-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চেষ্টা করেন।
এলিয়ট তা প্রত্যাখ্যান করতেন। বলেন :

'your shall not think' the past is finished'
Or 'the future is before us'.

তাহলে এলিয়ট কি বোঝাতে চান?

তিনি বোঝাতে চান :

time past and time future
always point to one end, which
is always present.

অতএব এলিয়টের জীবন দর্শনের মৌল উপাদান হচ্ছে ঐতিহাসিক অস্তিত্ববাদ। মানব প্রকৃতি,
পাপ এবং আদি-পাপ সম্পর্কে তাঁর সে মতবাদের সাথে মিল রয়েছে। সেন্ট অগাস্টাইন, পানকাস
এবং কিরেকোর্গার্ডের মতবাদের।

নির্দিষ্ট সময় ও অনাদিকাল সম্পর্কে অগাস্টাইন—কিরেকোর্গার্ডের তত্ত্ব এলিয়টের কাব্যে অনুপ্রাণিত।

এলিয়টের কাব্যিক আদর্শ নিয়ে আন্দোচনা করা কঠিন ব্যাপার। তিনি কবি। সমালোচকও তিনি।
এবং দু'টি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এলিয়টের কাব্য বুঝতে
হলে সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর নির্ধারিত স্বভাব ও চিহ্নিত তত্ত্ব বোঝা দরকার। একটি বাক্য দিতে
অপরটি বুঝতে চাইলে সম্পূর্ণ এলিয়টকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না।

কাব্য তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধারণা হলো : *emotion recollected in tranquillity*।
এলিয়ট তা মেনে নিতে রাজী নন। তিনি মনে করেন সত্যিকার সুদূর্ভ উদ্ভাসের অভিজ্ঞান কাব্য
এবং আর এ কথা বলতে গিয়ে তিনি সমালোচনার ওয়ার্ডসওয়ার্থকে ব্যঙ্গোক্তি করে বলছেন : *Poetry*
is neither emotion nor recollection, nor without distortion of meaning, tranquillity.

কেবলমাত্র বিকাশ মতব্য করা হলেই কিংবা অপরের মতবাদকে ধ্বংস করলেই সাহিত্য কেত্রে
কারো মূল্য দেয়া হয় না। ব্যক্তিগত মতব্য, এমনকি তা খুব ভয়ানক না হলেও, সাহিত্যিক মূল্য
বহন করে। এলিয়ট তাই অত্যন্ত সংবেদনশীল উপায়ে নিজের মতব্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি
বলছেন : *Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion,*
it is not an expression of personality but an escape from personality,

[Selected Essays]

এলিয়ট, কাব্যতত্ত্ব বলি কিংবা সমালোচনা তত্ত্ব বলি, উভয়ক্ষেত্রেই নিজস্ব স্বাভাবিক অনন্য
ছাপ রেখেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি-নির্দেশ হলো, কবিতা হচ্ছে মূল লক্ষ্যবস্তু—কবি
নন। বিপরীত তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

There are many people who appreciate the expression of sincere emotion in
verse.....But very few people know when there is an expression of significant

emotion, emotion which has its life in the poem, and not in the history of the poet. The emotion of art is impersonal,

[Selected Essays, Page : 22]

এলিয়ট তত্ত্ব উইগব কথা বলেই কলত হননি। তিনি যে কোনো কালের কবির জন্মো তাঁর জীবনের সোনার ফল তাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সূত্র হিসেবে উদ্ধারণ করেছেন :

It is an advantage to mankind in general to live in a beautiful world; that no one can doubt. But for the poet is it so important ? We mean all sorts of things... ..by beauty. But the essential advantage for a poet is not to have a beautiful world with which to deal : it is to be able to see beneath both beauty and ugliness, to see the boredom, the horror and the glory.

[The Use of Poetry and the Use of Criticism, Page : 106]

সাধারণ মানুষ জ্বলন্ত পৃথিবীতে বাস করতে চায়।

কিন্তু কবির জন্মো কি তা অত্যাবশ্যক? কবি জ্বলন্তের উপাসনা করেন। জ্বলন্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। এলিয়ট এর কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না।

তিনি এগুনতে যে বক্তব্য রেখেছেন তা সত্যিই অপূর্ব।

জ্বলন্ত ও কুংসিডের আড়ালে কী আছে তা দেখার জন্যে কবিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করতে হবে। দেখতে হবে অসঙ্গত, আতঙ্ক সৌরভ কীভাবে প্রবহমান রয়েছে জ্বলন্ত আর কুংসিডের পতীরে।

কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণার উৎস সম্পর্কে এলিয়টের তত্ত্ব হলো : মানুষের পরিবর্তিত নিরে কবিকে ভাবতে হবে—এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে—এক কথায় এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। প্রকৃত, জিরোদনিরন, দ্য ওয়েট ল্যাও প্রভৃতি কাব্য এলিয়টের হিউম্যান সিচুরেশন সম্পর্কে সচেতনতারই প্রতীক। এবং উইগব কাব্যে রচিত অগ্নি তাঁর vision of the boredom, the horror, and the glory of life-কে নিরুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশেষভাবে প্রকৃত থেকে আনন্দিক উদ্ভূতি দেয়া যাক :

Do I dare
Disturb the Universe ?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.
For I have known them all already, known them all
Have known the evenings, mornings, afternoons,
I have measured out my life with Coffee spoons ;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the Music from a farther room.
So how should I presume ?

প্রচণ্ড হতাশায় চিত্ত।

আতঙ্কের পাখি বিড়ায়।

জাতকবিক পরিবর্তন । আশার আলো । সব কিছুই কাব্যিক সহ-অবস্থান । এবং এখন এলিট
কর্তৃক অকিত্ত জনগোষ্ঠেই সম্ভবপর ।

এলিটের কবিতার ও সঠিকে মৃত্যুর অন্তহীন ছায়া লক্ষ্যীয় । মৃত্যু-চিন্তা বার বার ঘুরে ঘুরে আসছে ।
বলা হচ্ছে :

“গীতা এলিটকে তাঁর কাব্যের চমৎকার রসম বৃষ্টিয়েছে, তাই গীতার জগতেই বলা যায়
যে কর্মেজির নিবৃত্ত রেখে যে ব্যক্তি ইঞ্জিরগ্রাহ্য বিশ্বর সমূহে মনে মনে বাস করে, সে উন্মত্ত
জন কণ্ঠাচার করে । বলাই থাকলো কাব্য আচরণ নয়, কাব্য হচ্ছে যমের অন্তরঙ্গ উল্লসিত বহির্বিষয়ে
অসীকার, কাজেই কণ্ঠাচার নয়, উন্মত্তিই এখানে প্রটীবা । এই উন্মত্তি ছাড়া এলিটের
একাধারে আর্চর মুকুতার প্রজ্ঞাশ্রবণ এবং মৃত্যুর উপরে উদাসীন বৌদ্ধ বেনামো বার না ।
কুলা নয়, যোগ নয়, প্রেম নয়, রংগড়া নয়, বুদ্ধ শূন্য নয়, কারণ এইসবই মানুষের সজ্জি
সাধার ভিতরে শুধু বিষ্ঠা আর মৃত্যু । মৃত্যু যে স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক মিলে শোক করা
যে নির্বুদ্ধিতা সে অবশ্যই এলিট জানেন শুধু কেন এত বৌদ্ধ ? প্রা কবিতা বিচলিত হন না
জীবিত বা মৃতের জন্যে’……(বিক্ দে: সাহিত্যের ভবিষ্যৎ) ।

বিক্দের মনীষা অবিকিত । অতএব এলিট সম্পর্কে তাঁর মতামত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ।

কিন্তু আমাদের ধারণা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এলিটকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন ।
সীকার বিংশ শতাব্দীতে এটি একটি প্রয়োজনীয় মাপকাঠি । শুধু আমরা জানি, ওই মাপকাঠি
সাহিত্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শেষ কথা নয় । যখনই হতাশা শূন্যতা পাপ অত্যাচার শোষণ ইত্যাদির
মানবিক আত্মমালের উপাধিসমূহ মৃত্যুর ঝুঁকি চিত্র । এ সবই স্বাভাবিক । এলিট নিজেও
তা জানেন । কিন্তু ওই স্বাভাবিক জীবনকে এতো গভীর, এতো নিরবচ্ছিন্নভাবে ভিত্তি
রয়েছে যে এ সম্পর্কে ভাবনার মাত্র নির্বুদ্ধিতা নয় । তাছাড়া কবির অন্তর্ভুক্তিইল মঙ্গল মানুষের
সামগ্রিক সমাজকে ধারণ করে বলে ‘জীবিত বা মৃতের জন্যে’ বিচলিত হবে না কিংবা হতে পারে না—
কথাটা সঠিক নয় । বরং বিচলিত হর বলেই মানুষ পাশবিকতার দর অতিক্রম করার প্রয়াসে অসংখ্য
জগৎ । কবির দাবির জো এখানেই ।

Boredom ও Horror এলিট কাব্য-চিন্তার শেষ কথা নয় । মৃত্যু এবং ধ্বংসকে ভিত্তি
এবিরে বাবার সাধনায় ধরোই Glory of life—এটাই সম্ভবতঃ এলিট আমাদের বোঝাতে চান ।

এলিট কাব্যের নিরর্থক নৈশূন্য ও আজিকার বৈশিষ্ট্য

কম্পটতা ও ভীতিন্দ্র—যা এলিটের কাব্য-সৃষ্টির সাথে বিচ্ছিন্নভাবে ভিত্তি—মূলতঃ তাঁর নিজস্ব
চিত্তমগ্না থেকেই উৎসারিত । আর এ প্রসঙ্গে এলিট-এর বক্তব্য হচ্ছে :

We can only say that it appears likely that poets in our civilization, as it exists
at present, must be difficult. Our civilization comprehends great variety and com-
plexity, and this variety and complexity, playing upon a refined sensibility, must

produce various and complex results. The poet must become more and more, comprehensive, more allusive, indirect, in order to force to dislocate if necessary language into his meaning.

[Selected Essays, Page : 101]

এলিরট বর্তমান সভ্যতার মূল মূল প্রত্যক্ষ করেই এর অটলতার কথা বলেছেন। কবীটি নিতর্ক-নাগৈক। সভ্যতার অটলতা যদি স্বাভাবিক পরিণতির স্বাভাৱে ঘটে, তর্ক অনাবশ্যক। বলজিলাব, বেজাহুত অটলতার কথা। পাণ্ডিত্যের বেড়াঘালে আঁটকে থেকৈ শিল্পী যদি আৱহসানের উন্নয়ন ঘটনা করে তাহলে তার ডক্ত-বোমাছিয়া দুৱেই থেকৈ যাবে।

অবশ্য এলিরট সভ্যতার কথা বলেছেন। বৈচিত্ৰ্য ও অটলতা আধুনিক সভ্যতার নিশ্চাল। তাই কবিকে হতে হবে পৱোক, অধিকতর ইঞ্জিতবহ, আৱো বিম্বৃত মানসিকতার অধিকাৰী। প্রৱোকন-বোধে তাকে ভাষার পরিচিত বলৱকে নিজস্ব নিৰ্বাচিত অৰ্থে ৰূপান্তৰিত করতে হবে।

ইং, to dislocate...language into his meanings কবির স্বভাৱ অৱতৰুত থাকতে হবে। এখানে এলিরট আধুনিক কবিতার নিৰন্তর পরিবৰ্তনশীল অগিচ পুৰুষ তৱজ প্রবাহের কথা বলেছেন। এই যে বোধ তা কিছুতেই সাধাৰণ বন-শীতলতার পরিচায়ক নয়।

তারপৰেও যে কথা থেকৈ বার তা হচ্ছে এলিরট-এর বিৰাট বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অবদান, অৰ্থাৎ UNIFICATION OF SENSIBILITY কে সন্তবপন করে ডোলাৱ প্রবাস। 'ইঞ্জিৱগ্ৰাহ্য অনুভূতি একত্ৰীকৰণ' বলতে তিনি বোঝাতে চান ভাবনা ও অনুভূতির পারস্পৰিক সাহচৰ্য বিধান। এলিরট কাব্যের এমিকটায় স্বার্থ মূল্যায়ন হওয়া প্রৱোকন। মইলে আধুনিক কবিতা সম্পৰ্কে তাঁর ধাৱণা কী, তা কিছুতেই বোঝা যাবে না।

এলিরট কাব্যে প্রতীক ব্যবহার

Symbols ও Metaphor তিনি বিশেষ অৰ্থে ব্যবহাৱ করেছেন। প্রতীক ও ৰূপক কবিতায় অলংকাৰ হিসেবে পরিগণিত। এক্ষেত্রে এলিরট ভিন্ন ধাৱণা পোষণ করেন। তিনি মনে করেন প্রতীক ও ৰূপক অভিজ্ঞতা থেকৈও অৱত অৰ্থাৎ ভাবও বাইরে বিৱাজমান কোনো কিছু প্রকাশের একমাত্র উপাৱ অবশ্য মাধ্যম।

বক্তব্য: এলিরটের সাৱা কাব্য-সৃষ্টি ভূতে প্রতীকের ছড়াছড়ি। তাঁর কবিতা Burnt Norton -এ Rose হচ্ছে মানুষের পাখিব অভিজ্ঞতার প্রতীক, Little Gidding-এ বৃদ্ধা—

The moment of the rose and the moment of the new tree
Are of equal duration

Yew tree আৱাৱ বৃদ্ধাৱ প্রতীক। East coker-এ factory হচ্ছে বাড়িৱ মানুষ শস্যক্ষেত্ৰের অবকৱের প্রতীক, Field mouse বংগের উপাৱানের, Dancers and ocean ঐতিহ্যের, Still point উপৱের, sea অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একত্ৰীকৰণের—আৱাৱ কবিতা ইতিহাসেরও 'the sea's history' বৃদ্ধাৱ প্রতীক। Rock বহাৱ ও নিষ্কাশন প্রতীক। Small of food and drinks

কর ও বিহিত্ত্বতার প্রতীক। বলা বাহুল্য প্রতীক ও স্বপ্নক ব্যবহারে এমিরটের সজ্ঞানা অসাধারণ। যেমি USE OF IMPLICATIONS/র ব্যাপারেও এমিরটের অসাধারণ মৈশূবা লক্ষ্য করা যায়। আর এ পদ্ধতি সম্পর্কে এমিরট-এর বক্তব্য যা জ্ঞ হলে 'in the use of statements which carry a weight far beyond their ostensive meaning. কিন্তু এর কি কোনো প্রয়োজন ছিলো? এমিরট বলেছেন, it helps the poet to avoid direct statements of his beliefs, and attitudes, leaving the reader to reconstruct meanings for himself. জাহ্নে Implications বলতে আমরা বুঝতে পারছি:—ক. পরিচিত শব্দাবলী অধিকতর জোরালো ও গভীর জ্ঞাপর্ষপূর্ণ করে ব্যবহার করা যায়; খ. সরাসরিভাবে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ থেকে বিরত থাকা যায়; গ. শব্দের অর্থ পুনর্গঠনে পাঠকদের স্বেচ্ছা থেয়া সম্ভবপর হয়। উপাত্তরূপ দেয়া থাকে:

And indeed there will be time
To wonder, 'Do I dare?' and, 'Do I dare?'
Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot in the middle of hair—

Do I dare
Disturb the Universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.
For I have known them all already, known them all—
Have known the evenings, mornings, afternoons,
I have measured out my life with coffee spoons;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the music from a farther room.
So how should I presume?

[Prufrock]

Implications এর পদ্ধতি কবিতার নায়করূপেও পরিচিন্তিত: Burnt Norton বাবুর প্রতীক। East coker রবিত্রীন্দ্র, The Dry Salvages জন্মের Little Gidding অশ্বিনুর প্রতীক। যথাযুগে কাব্যের ভাষার ব্যাখ্যার প্রতিটি বক্তব্য তিন, চার কিংবা সাতটিরও অধিক অর্থে উপস্থাপিত করা হতো। পাঠে Vita Nuova কাব্য গ্রন্থে নিজস্ব কবিতাসমূহের ব্যাখ্যায় একাধিক অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

উপরোক্ত পদ্ধতির স্বয়ং বিকাশ বটেছে নিম্নোক্ত কবিতাসমূহে:

East coker, V:

...Trying to learn to use words, and every attempt
Is a wholly new start, and a different kind of failure
Because one has only learnt to get the better of words

For the thing one no longer has to say, or the way in which
 One is no longer disposed to say it.....
 Home is where one starts from. As we grew older
 The world becomes stranger, the pattern more complicated
 Of dead and living. Not the intense moment
 Isolated, with no before and after
 But a lifetime burning in every moment
 And not the life of one man only
 But of old stones that cannot be deciphered ..

The Dry Salvages, II :

...We had the experience but missed the meaning,
 And approach to the meaning restores the experience
 In a different form, beyond any meaning
 We can assign to happiness.

Little Gidding V :

We shall not cease from exploration
 And the end of our exploring
 Will be to arrive when we started
 And know the place for the first time.

এক কণার শব্দাবলী—কবিতার, অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। কেমনা :

These are only hints and guesses,
 Hints followed by guesses; and the rest
 Is prayer, observance, discipline, thought and action,
 The hint half guessed, the gift understood, is Incarnation.

(Burnt Norton, V)

অথবা আবার Prufrock-এ কিরে বাওয়া যাবে :

And indeed there will be time
 To wonder, 'Do I dare ?' and "Do I dare ?"

এলিয়ট কাব্যে OBJECTIVE CORRELATIVE

এলিয়ট Objective Correlative তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন :

a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experiences, are given, the emotion is immediately evoked.

আর এ সূত্র ধরে আসে 'stream of consciousness.' চেতনার প্রবাহ' এনিরটের প্রাচুর্য কাব্যে বিশেষভাবে কুটে উঠেছে। এখানে তিনি সবরকে খেঁড়াবে ব্যবহার করেছেন তা লক্ষ্যীয়। কবিতার গতিবিন্যাসের সমর এর নিজস্ব গতি হারিয়ে কেনেছে। কিংবা বলা চলে, সবরের প্রবাহ ধারিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার বারাবাহিকতাও নেই। আরো নেই সবর এগিরে চলার সজ্জা পথ। সবরের গতি ধারিয়ে দেয়ার উপর নির্ভৃতভাবে লক্ষ্য করা যায় প্রাচুর্য কাব্যের দিল্লি বণিত অংশে:

...the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table;

প্রাচুর্য-এর অতীত এবং ভবিষ্যৎ একটি দ্বিরবিশ্রুতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এ দ্বির বিশ্রুই হচ্ছে চেতনাবোধের একটি বিশেষ মুহূর্ত। Time এবং Space মিচল। অগ্রগতি বন্ধ। যেখান থেকে কবি শুরু করেছেন সেখানটাই তাঁর ডাবনার পরিসরাণ্ডি। কিন্তু সবরের এ দ্বির অবস্থান কেন্দ্র দিয়েই প্রাচুর্যকে বিচার করা চলবে না। প্রাচুর্য-এর অন্তর্গত জগতের আভ্যন্তরীণ অসুস্থতা খেঁবে নেই। তা যথানিয়মেই চলছে।

Objective Correlative বিশেষ অর্থে যা হলো, emotion that an audience wants to be justified in the plot: আপাতদৃষ্টিতে যা অসংলগ্ন—হয়তোবা অপ্রাসঙ্গিক, অথচ বিষয়ের কেন্দ্রীয় স্তরের সাথে সম্পৃক্ত। এদিক থেকে বলা যায়, এনিরটের প্রায় সব কয়টি নাটকের মধ্যে তাঁরই ব্যবহৃত phrase—objective Correlative-এর প্রতিধ্বনি। The Family Reunion-এর দিল্লোজ সংলাপে:

Can't you see them? You don't see them,
but I see them,
And they see me. This is the first time
that I have seen them.

এক ব্যবহৃত phrase সমূহ—

'the unexpected crash of the iron catact';
'the bright colour fades,' 'the bird sits';
on the broken chimney'—

বলিও ঘটনা প্রবাহের সাথে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয় ভবু উষ্ম উজ্জ্বলতার সাথে প্রুটের অবিচ্ছিন্ন সারসংগ্ৰহ পাওয়া যায়। তেমনি The Cocktail Party নাটকে গায়র হেদরি'র বক্তব্য তুলনীয়:

That was her destiny, the only question
Then was, what sort of death? I could not know.....
She did not know, so all that I could do
Was to direct her in the way of preparation.

ইতিহাস সম্পর্কে এলিয়টের ধারণা

ইতিহাস সম্পর্কে এলিয়টের ধারণা রীতিমতো ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি ইতিহাসকে সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিতে বিচার করতে চান। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে তাঁর মতবাদের তেমন কোনো মিল নেই। Gerontion কবিতা বলে হচ্ছে—After such knowledge, what forgiveness? আর তাঁর পরেই শুরু হলো ইতিহাস সম্পর্কে যুগান্তকারী বিশ্লেষণ :

...Think now

History has many cunning passages, contrived corridors

And issues, deceives with whispering ambitions,

Guides us by vanities. Think now

She gives when our attention is distracted

And what she gives, gives with such supple confusions

That the giving famishes the craving. Gives too late

What's not believed in, or if still believed,

In memory only, reconsidered passion.....

Unnatural vices

Are feathered by our heroism. Virtues

Are forced upon us by our impudent crimes.

উপরোক্ত কথাগুলো ইতিহাস থেকে অজিত জ্ঞানের ব্যাপারে সরাসরি দ্বিভাষা। ইতিহাস থেকে কি আমরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করি? কিংবা অর্জন করি কোনো জ্ঞান? অথবা ইতিহাস কি আমাদের চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে কোনো ধারণা প্রদান করে? এবং যদি কোনো জ্ঞান সত্যিই অর্জন করা হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে ওই জ্ঞান কি আমাদের আধ্যাতিক মুক্তির পথে পবিচালনা করে?

সোজা জবাব হচ্ছে, না। এর কোনো মূল্য নেই। অথবা এর মূল্য সন্দেহাতীত নয়।

তাহলে কোন জ্ঞান প্রয়োজন? অথবা কোন প্রজ্ঞার? যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে—আমাদের চূড়ান্ত নিয়তির ধারা বদলে দিতে পারে? সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই কেবল আমাদের প্রয়োজন। বিমূর্ত মতবাদের পেছনে ছুটে কোনো লাভ নেই। বার্বতাটি হচ্ছে এর পরিণতি। এর জন্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োজিত করার অন্যতম অর্থ হচ্ছে অথবা কালক্ষেপ করা। জিরোনশিয়াম তাই করেছিলেন। শেষটায় বুদ্ধ বয়সে, উপনদ্ধি করলেম কী চরম বার্বতার শিকার তিনি হয়েছেন। এবং এম কলশ্রুতি হলো, জিরোনশিরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। ইতিহাস একেবারেই অর্থহীন। ইতিহাস কখনো কোনো ব্যক্তিকে কিংবা ব্যক্তিসমষ্টিকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়। ইতিহাস কখনো মানুষকে তার অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষাও করতে পারেনি। এর কি কোনো কারণ নেই? এই বার্বতার কি কোনো হেতু নেই?

এলিয়ট বলেছেন, ইতিহাস deceives with whispering ambition, Guides us by vanities. ইতিহাস থেকে যে প্রজ্ঞাবোধের সূত্রপাত ঘটে তা অত্যন্ত বিলম্বিত। তবম এর প্রয়োজনও নির্দেশিত।

ইতিহাস Gives too late, What's not believed in, or if still believed, in memory only, reconsidered passion.

এলিয়ট ঐতিহাসিক নন। ইতিহাসের ঘটনাপারম্পর্য ধর্মনার ব্যাপারে তাঁর আশ্রয় নেই, ইচ্ছাও নেই। ইতিহাসকে তিনি প্রত্যাক করেছেন কবি হিসেবে। কিন্তু ইতিহাস নিয়ে যে ভাবের অবতারণা তিনি করেছেন তা সত্যিই বিগ্নারকর। Gerontion কাব্যের শেষে তিনি শ্রেয়সীতার থেকে যে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন বর্তমান আলোচনায় এর গুরুত্ব রয়েছে :

Thou hast nor youth nor age
But as it were an after dinner sleep
Dreaming of both

এলিয়ট কর্তৃক নাটক সমূহের কয়েকটি বিশেষ দিক :

এলিয়টের নাট্য সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এম পটভূমির উপরে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। Tragic Sense ও Tragic vision যদিও আপাতদৃষ্টিতে অর্থগত দিক থেকে তেমন কোনো তালিমতা বহন করেনা তবু বলতে হয়, শব্দ দুটি পুনোপরি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। বলা হয়ে থাকে বুটান বর্মে Tragic vision-এর কোনো স্থান নেই। বুটান বর্মে এবং বুটান ট্র্যাগেডী সমূহে যে আবহাওয়া, পবিত্র উপলব্ধি বিবাক করে তা মূলত: বিরোধাত্মক উপলব্ধি বা Tragic Sense. ব্যতিক্রম দেবা যার নীত্রে এবং শোপেনহাফ কর্তৃক উপস্থাপিত Tragic vision বা বিরোধাত্মক ধর্মন শক্তিতে। তাদের মতবাদ হলো Tragic vision। এই Tragic vision মানুষের বেদনা থেকে মুক্তির কোনো পথ দেখে না। মানুষের দুঃখ দুর্দশা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা সময়ের অস্তিত্বের বাইরেও কোনো অবস্থার লাবণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মানুষের জন্মের সাথে সাথে আছে দুঃখ-বেদনা-দুর্দশা-যন্ত্রণা বোধ। এ হচ্ছে গ্রন্থ কর্তৃক নির্ধারিত অবস্থা—যে অবস্থা বা ছিলো, তাই রয়েছে, থাকবেও তাই। আর Tragic vision-এর দ্বিতীয় স্তর হলো, জীবনের কোনো অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। নিশ্লেষণ নেই। জীবন অর্থহীন। জীবন এমন এক হতাশাবোধের জন্য দেয়, যে হতাশাবোধ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ত্রিহোহিত। তদুপরি রয়েছে নির্ভেজাল হতাশা। আর এই হতাশার যাবত এতোটা গভীর যে তা থেকে পালিয়ে নিশ্বাসবোধের স্তরে উপনীত হওয়ার কোনো পথের সম্ভাবনা Tragic vision দিতে পারে না।

Tragic vision না দিতে পারে তা হচ্ছে নিশ্চিত হতাশা। অপার শূন্যতা। অভিজ্ঞতা অর্থবোধের সম্ভাবনা এখানে নেই।

অপরপক্ষে Tragic Sense মানবিক সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। পাপের উপলব্ধি, অনুশোচনা, পাপের পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা Tragic Sense এর মূলে রয়েছে। কিন্তু তা Tragic কেনো? কারণ মানুষ জন্মসূত্রে থেকেই যে অবস্থার—যে উষ্মতার শিকার তা হচ্ছে, 'the thousand natural shocks that flesh is heir to' অবশ্য কিছুই করার নেই। অনুশোচনা আত্মপলঙ্কির জন্য দেয় সত্যি কিন্তু এর স্থায়ী স্বপ্নকালীন। এই যে অসহ্যের ভাব ত্রুটি বিরোধাত্মক পরিণতির জন্য দিয়েছে।

Tragic Vision-এর কিছু উদাহরণ দেয়া যাক :

১. হ্যারিসেট হোরেশিও'কে বলছেন :

If thou didst ever hold me in thy heart
Absent thee from felicity awhile
And in this harsh world draw thy breath in pain.
To tell my story.

২. কিং লিয়ার :

As flies to wanton bays are we to the Gods
They kill us for their sports;

৩. ম্যাকবেথ :

Life's but a walking shadow...a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

খ্রীষ্টান ধর্মীর আশাবাদ—যন্ত্রণা রোগ শোক থেকে মুক্তির আশাবাদ কবিকের জন্মো ন্যস্তি এনে দিতে পারে। কিন্তু সবামানে পৌঁছিয়ে দিতে ব্যর্থ :

Christian optimism is not a document which can be signed, sealed and delivered to a suffering world to solve the problem of suffering,

[উদ্ধৃতি: টি. বি. কিলপ্যাট্রিকের 'Suffering', Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edited by James Hasting]

এলিয়টের মাটিকে যে সুর তা হচ্ছে *Mystery of Suffering* -এর। এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মানা ধরনের বিভর্ত রয়েছে। এক শ্রেণীর সমালোচকেরা মনে করেন, এলিয়ট মৃত্যু চিন্তার একটানা প্রভাবে পড়ে জীবনের সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর কাব্যে, তাঁর মাটিকে মানুষের অমির্ভার্য অথচ স্বাভাবিক যে পরিণতি, এ নিয়ে তিনি অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন। এর ফলে জীবনের কবিত্ব গতিতে পরোক্ষ মৃত্যুর পদধ্বনি সর্বত্র অবগামের দ্বারা বিস্তারিত করে চলেছে। আরেক শ্রেণীর সমালোচকেরা এর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন ধর্মীয় অনুভূতি, যা কিনা প্রতিবাহুর্ভে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়—কেননা জীবন অণুস্থায়ী, এবং নকার যন্ত্রণা 'a life here after' -এ গিয়ে অমম্ব মূখার সন্ধান দেবে। প্রকৃত পক্ষে, এলিয়টের চিন্তাভাবনা আরো গভীরে। তিনি জীবনের প্রতি মবব অনুভব করেন বলে জীবনের যন্ত্রণাকে, এবং যা জীবনের সাথে নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে, তাকে অস্বীকার করতে পারছেন না। মানুষের suffering বড়ো বেশি তাঁর হৃদয়কে দাড়া দেয়। তাঁর মাটিক *Murder in Cathedral* এবং *Cocktail Party* মূলত: *Suffering* -এর রহস্য নিয়ে বিরচিত।

কিন্তু গভীরতর অর্থে 'যন্ত্রণার রহস্য' মাটিকের বিষয়বস্তু হলেও, অতিবাহাদের উপাদানই এ অনুভূতির পটভূমি রচনা করেছে। অতিবাহাদী মাটিকগুলো হচ্ছে: *Murder in Cathedral* [1935], *The Family Reunion* [১৯৩৯]

The cocktail Party [1950], The Confidential Clerk [1953], The Elder Statesman [1950]

অভিযবাহী উপাদান কি? অ হচ্ছে জীবনের 'বিশোধাত্ম উপলক্ষি'। এর উৎস কি? যন্ত্রণার রহস্য বেসে দেয়া ও অ থেকে বৃষ্টির কোনো সন্তানবির দিশা না-পাওয়া। যন্ত্রণা জাগতিক দায়ের পর্ববসিত। এর কোনো প্রতিকার নেই। প্রতিকার নিয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা চলে কিন্তু এর ফলে দুঃখভোগের কোনো প্রকার তরতর্য ঘটে না। জ্ঞান প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবত্তা সবই যাতনা দায়সমে বার্থ। মানুষ কেবলমাত্র একটা কাজই করতে সক্ষম। আর তা হচ্ছে অভিযবাসের অবস্থায় সব কিছু নিয়ে যাওয়া। বাবার তাও বেচ্ছাকৃত নয়। ভয় ও আতঙ্ক এর সাথে জড়িত। মানুষ তার সীমিত শক্তি দিয়ে শত চেষ্টা সত্ত্বেও বর্ষন বিরূপ কিংবা অতভনজিকৈ কাণ্ড করতে পারে না তখনই ভয় ও আতঙ্ক বাবা চাড়া দিয়ে ওঠে। টমাস বেকেট ওই বরনের মানসিক অবস্থা অনিবার্ণ পরিণতি হিসেব গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি আনন্দ:

Action is suffering
And suffering is action
[Murder in Cathedral]

The Family Reunion নাটকের হ্যারিও ওই অবস্থায় নিপতিত। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তকে তাকেই করতে হচ্ছে। হ্যারি হচ্ছেন bird sent flying through the purgatorial flame. তাছাড়া তার যন্ত্রণার আরো একটা বিশেষ দিক হলো তিনি একাকী। এর প্রচণ্ডতা উপলক্ষি করছেন অর্ঘট কাউকে এর ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। গ্রীক ট্রাজেডীর Orestes-এর অবস্থা যন্ত্রণার গোলাদী হ্যারি'র জীবনেও প্রতিধ্বনিত: you don't see them, you don't- but I see they are hunting me down, I must move on.

The Elder Statesman-এর Lord Cleverton ভ্রমাবহ শূন্যতার ভূমি অনুভব করছেন। এ বোধ থেকে তিনি আতঙ্কিত। তিনিও সব সয়ে যাচ্ছেন শূন্যতার ভয়ে। তার এ মানসিক পরিস্থিতি অর্পকে বোঝানো অসম্ভব। বরং অর্পব্যবহার বিস্তর সত্যাননা রয়েছে। অন্য কেউ বনে করতে পারে তার বাতনার কারণ হচ্ছে:

Morbid conscience
From brooding over faults—
I might well have forgotten

টমাস বেকেটের অতর্কালার উৎস হচ্ছে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর নিশ্চয়ই অনিশ্চিত ধারণা। একজন সিদ্ধ পুরুষ মৃত্যুর পথ বেছে নিতে চান। আর এ করণ অতৃপ্তি আলোচ্য নাটকের পরিস্থিতি উদ্ভব করেছে:

Peace. And let them be in their exaltation.
They speak better than they know. and beyond your understanding.

They know and do not know what is to act or suffer
 They know and do not know that action is suffering
 And suffering is action. Neither does the agent suffer
 Nor the patient act. But both are fixed
 In an eternal action, on eternal patience
 To which all must consent that it may be willed
 And which all must suffer that they may will it.

মাহোঁক শহীদ হওয়ার পথ বেছে নেবার দর্শন হচ্ছে মৃত্যুকে বেছে নেয়া। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে কোনো কবিতা হোক, নিজে মৃত্যুর পথ বেছে নেবার ব্যাপারে কোনো পক্ষীয় আধ্যাত্মিক অধিকার কি মানুষের রয়েছে? শহীদ হওয়া ও আত্মহত্যা করার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মেনে নেয়া যাক, কোনো ব্যক্তি সঠিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও যথার্থ কারণে মৃত্যুবরণ করতে পারে। কিন্তু কথা থেকে যায়। যে বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে প্রাণ বিসর্জন দেয়া হচ্ছে সে বিশ্বাসের যথার্থতা সম্পর্কে কি পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়?

চিনা বেকট ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করেছেন। তাই তিনি শহীদ হতে চান। নৈতিক কর্তব্য একেই উপেক্ষিত। সমস্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বেকট যে নানী দিয়েছেন এবং মধ্যে রয়েছে অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন। রয়েছে অস্তিত্ববাদী মহাত্মা:

Just as we rejoice and mourn at once, in the Birth and in the Passion of our Lord; So also...we both rejoice and mourn in the death of martyrs.

আদম ও হুঃখবোধ পাশাপাশি। আর এ ধরনের যে অবস্থা, এর মূলে রয়েছে মানুষের নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক দাঙ্গা হত্যা প্রতিশ্রুতি। এখানেই মিহিত রয়েছে অস্তিত্ববাদের প্রক্রিয়া। নাটকটি নাট্যমূলক যেমন জনপ্রিয় ডেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। স্মরণপ্রসারী এর আবেদন। কেন না এলিয়ট এ নাটকের ঐতিহাসিক দাবী—বিশেষত: বেকটের নিহত হওয়ার ঘটনার objective correlative তত্ত্বের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন। উক্ত ঘটনায় রয়েছে ধর্মীয় উচ্ছ্বাস। এবং সাথে ধর্মীয় আশাবাদ। এলিয়টের মানসিকতা ধর্ম সম্পর্কে যোচনাটি খুঁজে বেরন। ধর্মকে তিনি কেবল খেয়ালের বশে গ্রহণ করতে পারেন। যথার্থ, এলিয়ট মনে করেন, নিব্বিটচিহ্নে, ধর্মের মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

Murder in Cathedral-এর পরবর্তী পর্যায়ে রচিত নাটকসমূহে তিনু স্তর খসিঙ। প্রায় প্রতিটি নাটকই জীবনের অপর্যায়ীত্বের বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত করছে। জীবন অসামান্যের প্রবাহে একটি নিঃশ্বাসবাত্র। এর কাছে কোনো কিছু প্রত্যাশা করা অর্থহীন। ওষু ভাট নয়। আনন্দিক প্রত্যাশার অন্তরালে রয়েছে প্রত্যাশা।

নাটকসমূহের কেন্দ্রীয় স্তর হচ্ছে: timeless reality.

মুক্তির পথ হচ্ছে এগাপারে বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করা। এর ওপরে আশা স্থাপন করা।

The Family Reunion: মারের অনুদানের উৎসবে বোম্বারদের জন্যে ছেলে বাড়ি করে এসেছে।

হলে আশা, একই স্নেহ পাতি পাবে। পারিবারিক পুনর্মিলনে স্থিতি অনুভব করবে। শেখটার তার সব আশাই ব্যর্থ।

The Cocktail Party : নর-নারীর রোমান্টিক সম্পর্কে কটল ধরেছে। এটি হচ্ছে এর অনিবার্য পরিণতি। হতাশা এর প্রতিফল।

The Confidential Clerk : একই ধরনের রোমান্টিক হতাশাব আবর্ত এখানেও বিদ্যুত।

The Elder Statesman : বাহ্যিক দিক থেকে সকল কোন এক রাজনীতিবিদের অভ্যন্তরীণ জীবন এর প্রতিফল। উক্ত রাজনীতিবিদ সনসানে অবসর গ্রহণের অপেক্ষায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে। কাব্য নাটক সম্পর্কে এনিয়টের মতবাদ হলো :

Characters must some how (not necessarily) disclose a deeper reality than that of most of our conscious living, and ...show their real feeling and ovltions, instead of just what in actual life, they would normally profess or be conscious of.....

It (Poetic drama) must reveal, underneath the vacillating or infirm character the indomitable unconscious will, and underneath the resolute purpose of the planning animal, the victims of circumstances and the doomed or sanctified being.

[T. S. Eliot : Introduction to Bathell's Book]

কয়েকটি নাটকে উক্ত মতবাদের সান্নিধ্য প্রতিধ্বনিত উদ্ধৃতি দেয়া যাক :

Murder in the Cathedral : কর্ম ও দুঃখ ভোগ। 'the suffering of the witness and the action of the witnesses are one and the same thing.

বেকেট কোম্বালের প্ররোচনায় কণিক দুর্বলতা ও বিব্রাঙ্কিতে মিশ্রিত। শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জনের ভাবনা একটু কৈপে ওঠে। তবু তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে—হয়তো অলক্ষ্যে :

The last temptation is the greatest treason
To do the right deed for the wrong reason.

The Family Reunion : গুয়েটলাস্ত-এর বাণী যে, দুঃখভোগ নারকীয়—এক সহিকুতাও তাই। এর জন্যও নারকীয় যন্ত্রণা সহ্য করার মত ক্ষমতা থাকা চাই। ব্যাঙ্কেট মর্ডার ইন ক্যাথেড্রালে ওই বক্তব্যের প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ। দুঃখ ভোগ ও কর্মের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। দুঃখভোগ অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্যে সহ্য করে যাওয়া। যারা সংকর্ষ করে তারা হচ্ছে 'শহীদ' ও 'সাক্ষী'। নিশীভিত ইচ্ছাশক্তিকে পরিণীলিত করতে হবে। আর এসব বক্তব্যের প্রতিধ্বনি হয়েছে 'দ্য ক্যাম্ব্রিজ রিইউনিয়ন' কাব্যনাট্যে :

'Can't you see them? You dont see them, but I see them
And they see me. This is the first time that I have seen them.

The Cocktail party : এখানে Problem of Choice --এনিয়ট বোঝাতে চান কোনো সাময়িক সম্পর্কই স্বরংসম্পূর্ণ নয়। যারা ভালোবাসে, তারা বিয়ে করতে পারে না। বিবাহিত ব্যক্তিরা

শ্রেক হয়ে যায়। Celia-এর নিশ্চেষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা Heywoods-এর A woman killed with kindness-এর সাথে তুলনীয় :

‘O God, O God, if I could return to yesterday
Before thought that I have made a decision’

এ নাটক সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে এ হচ্ছে সংসার বিরাগী মানুষের বিবর্তনের প্রতিফলন। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। এখানে এনিয়ট এ মতবাদের সঙ্গকে : জীবনে উচ্চতর কোনো স্তরে আরোহণ করতে হলে ব্যক্তিবোধ বিগর্জন দিতে হয়।

সাহিত্য সমালোচক টি.এস.এনিয়ট

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এনিয়টের ভূমিকা ও অবদান আলোচনা করার আগে সমালোচনার ক্ষেত্রে লিখিত তাঁর মতাবলী সম্পর্কে একটি তালিকা দেয়া যাক :

Sacred wood—1920
Homage to John Dryden (1924)
Essays, Ancient and Modern (1936)
Study of Dante (1929)
After Strange Gods (1934)
The Use of Poetry and
the Use of criticism (1933)
The Music of Poetry (1942)
The Classics and the man
of Letters (1942)
What is a Classic (1945)
Milton 1947
The Three Voices of Poetry (1953)
Collected Wores ‘on Poetry and Poets’ (1957)

সমালোচক সম্পর্কে তিনি বলেন, “সমালোচক ও সৃজনশীল সমালোচক অবিচ্ছিন্নভাবে একই ব্যক্তি হওয়া উচিত।” [The Sacree Wood, P. 16]

একই গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় তিনি উক্ত মতবাদের প্রেক্ষিতেই আবার বলেন :

The true generalization is not something super imposed upon an accumulation of perception; Perception dont, in a really appreciative mind, accumulate as a mass, but form themselves as a structure; and criticism is the statement in language of this structure ; it is a development of sensibility.

আধুনিক কালে সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিব্যকে প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়।

এনিয়ট ওই প্রবণতার বিরোধিতা করে বলেছেন :

Personality tends naturally to be the unregenerate personlity, pastly self deceived, and partly irresponsible because of its freedom terribly limited by prejudice and self-conceit, capable of much good or great mischief according to the natural goodness or impurity of the man: and we are all naturally impure.

মিলটন সম্পর্কে এনিয়ট বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। মিলটনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বড়ো রোমান্টিক কবিরা মানবতার নিকৃষ্ট অভিব্যক্তি। এনিয়টে এই মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন হেওয়ার্ড বলেছেন, মিলটন কাব্যের গুণাগুণ নির্ধারনের ব্যাপারে এনিয়টের যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে তা হ'ল : An antipathy towards Milton as a man. ডুইডেনকে তিনি উচ্চমার্গে তুলে ধরেন যদিও তাঁর কাব্য মিলটনের কাব্যের চেয়ে বহুদূর দূর। পোপ ও অগাস্টাইনকে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন মনোদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এনিয়টের দ্বিষ্টা, ডট্টর স্যামুয়েল জনসন 'একজন সঠিক, নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য সমালোচক।' এনিয়ট বোকাফিজিকেল কবি জন ডানের জনপ্রিয়তার পুনর্জাগরণের নিশ্চয়তা বিধান করেন। ডানের কাব্য বুদ্ধিদীপ্ত, প্রেমবিশিষ্ট। ডান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন : a thought to Danne was an experience, it Modified his sensibility

এনিয়ট বরাবরই এ ধারণা পোষণ করতেন, তাঁর ভাব্য সমালোচনামূলক গ্রন্থাবলী রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর ভিন্নমত তুলে ধরেছে।

প্রসঙ্গক্রমে এনিয়টে তাঁর নিঃসল বক্তব্য যুগপৎ কথা যায়, 'সং সমালোচনা এবং সংবেদনশীল প্রাশংসা কাব্য মূল্যায়নে নির্দিষ্ট—কবির নয়।' (উদ্ধৃতি : Selected Essays, P. 17]

রোমান্টিক আন্দোলনের হোতা হচ্ছেন রুশো (১৭১২—১৭৭৮)।

তিনি তাঁর Social contract theory-তে উল্লেখ করেছেন, Man is born free and everywhere he is in chains.

Emile তে রুশো ভাব দিয়ে বলেছেন : God makes all things good; man meddles with them and things become evil.

উপরোক্ত দুটি কথাই হচ্ছে রোমান্টিকতার সংক্ষিপ্ত সার। ধর্মীয় মতবাদের সাথে এর বিরোধ রয়েছে।

ধর্মীয় মতবাদ হচ্ছে, Man is born sinful, and he is finite and free only in a limited sense.

রোমান্টিক কবিরা 'এই জীবন, এই সংসার বা এই ভাগ্যতিক সম্পর্কে সোভিনীয় গ্রহণীয় সত্য বলে স্বীকার করেন না; এই মুহূর্তে প্রবাহিত হতে থাকা জীবন বেশ এক বিভীষিকার বন্দীশালা, যেখানে তাদের বন্দী অন্তরাচা ব্যাকুল তীব্রতার সত্যতই কাঁদে, কোথায় মুক্তি কোথায় সেই রামধনু রঙের দেশ ও জীবন যেখানে কবির কণ্ঠে নুন্নত উন্নতি।

বাহোক, রোমান্টিক কবি-মানস সম্পর্কে T. E. Hulme বলেছেন, 'এখানে হচ্ছে রোমান্টিকতার মূল : মানুষ, ব্যক্তি-বিশেষ, অনন্ত সম্ভাবনার ভাগ্য। যদি আপনি সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারেন যেখানে শোষণের ব্যবস্থা বিলুপ্ত তাহলে ওইগর সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায় সুযোগ আসবে। আপনি প্রপত্তির সন্ধান পাবেন।

আলোচনার সুবিধার্থে বোলসেরায়ের একটি স্থলর বস্ত্রবোর উদ্ধৃতি নেয়া যেতে পারে :

Man – all men, that is to say – is so naturally depraved that he suffers less from the degradation of the universe than from the establishment of a reasonable heirarchy.

এক কথায় রোমান্টিক মানসিকতা তাৎৎ আশ্রবাক্য বিরোধী। প্রচলিত ব্যবহার আড়ালে মানবতা নিমেষিত। এলিয়ট এ আলোচনের বিরোধিতা করেছেন যে-সব কারণে সে-সবের মধ্যে প্রধান হলো মানুষের ব্যক্তির সম্পর্কে রোমান্টিক মানসিকতার অতিরিক্ত ধারণা। তিনি আরো মনে করেন, রোমান্টিক কবির মানবিক ব্যক্তিসত্তায় জীবনের চূড়ান্ত মূল্য প্রত্যক্ষ করেন। অতএব, তিনি এ'ও মনে করেন, 'ওই' ধরনের ধারণা থেকে ব্যক্তিগত মোহবিকার এবং অস্বস্তিতা সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করবে। এলিয়টের 'ওই'র কাব্যিক বড়াদর্শের ভিত্তি হলো তাৎৎ নিজস্ব শিল্পী—অর্থাৎ Theory of impersonality in art.

উক্ত শিল্পীর উপরে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলছেন :

A Practical sense of realities.....which is anti-Romantic: not to expect from life more than it can give or more from human beings than they give: to look to death for what life cannot give. [Selected Essays, P. 275]

শিল্পে নৈর্বাভিকতা ও স্বতন্ত্রত্ব দিক নিয়ে এলিয়টের ধারণা হলো : মানুষকে ধর্মীয় বিশ্ব বিশ্ব শৃংখলা মেনে চলা প্রয়োজন। এমন কি অনুভূতি ধর্মীয় বিশ্ব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। ইতিহাসের উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিল্প করে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। বর্তমানত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ বিজ্ঞ সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই।

উল্লেখ্য, উপবোধ তত্ত্ব পুরোপুরিভাবে রোমান্টিকতা বিরোধী। মানবতাবাদ মূলত: নৈতিকতার সপক্ষে। মানবতাবাদ নীতিশাস্ত্রের পটভূমি নির্মাণের উদ্দেশ্যে মানব ইতিহাসের গতিত্ব জ্ঞানভাণ্ডারের উপরে নির্ভরশীল। তাছাড়া মানুষের আর্থিক শক্তির নৈতিক সম্পূর্ণতা অর্জনের যে অনিবার্য গতি, মানবতাবাদ যত সহকারে তাও প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে আগ্রহী। অতএব একথা সত্যি, মানবতাবাদ ঐতিহাসিক জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা ভাবপোষণ করে।

যুক্তির ধী-শক্তি দিয়ে অস্বীকৃত নিরীক্ষা করার ব্যাপারে আমরা কি ইতিহাস থেকে পাঠ নিতে পারি ? এ প্রশ্নের জবাবে মানবতাবাদীরা বলেন, ইতিহাস হচ্ছে একটি Cumulative process। কিন্তু এলিয়ট ইতিহাসের Cumulative process-এ বিশ্বাস করেন, এমন কোনো প্রশ্ন নেই।

কর: ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত সুস্পষ্ট বড়াদর্শ রয়েছে :

history has many cunning passages, contrived corridors,/And issues, deceives with whispering ambitions./Guides us by vanities.....

[Complete Poems and Plays, P. 22]

ইতিহাস সম্পর্কে এমন বিকল্প ধারণা থাকার কি কারণ ? কারণ, এলিয়ট মনে করেন, 'সত্য' বিশেষ কোনো সময়ের কন্যা নয়। এ হচ্ছে অনন্তকালের কন্যা।

'সত্য'কে আমরা জামি বুজি মাঝে নয়। প্রতিষ্ঠানগত ধারণাও এখানে বিকল। 'সত্য'কে আমরা জামি Revelation বা ঈশ্বরপ্রদত্ত বাণীর মাধ্যমে।

এলিয়ট 'ঐতিহ্যের' প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন, একথা আগেও বলাইছে। ঐতিহ্য চেতনায় মাঝে তিনি এলিয়টের উপরে জোর দিতে চান যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে মূল্যবোধকে যুগ থেকে যুগান্তরে সচল রাখার উপলব্ধি যাত্রা।

সামাজিক-সমালোচক হিসেবে এলিয়টের স্থান চিহ্নিত করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচক এলিয়টকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

সমালোচনার সুবিধার্থে কয়েকজন খ্যাতনামা সমালোচনা-বিশেষজ্ঞদের অভিমত উল্লেখ করা প্রয়োজ্য :

John Crowe Ransom বলেন করেন, 'সম্ভবতঃ এলিয়টের চেয়ে ভালো সমালোচক আমাদের মধ্যে নেই।' [The Great Critics P. 713]

Edmond Wilson এলিয়টের লেখায় ধর্মোচ্ছিন্নতার বলাই করেন। তদুপরি তিনি বলেন করেন, নিজের বক্তব্যের ব্যাপারে এলিয়ট উচ্চকণ্ঠ। তাবপর অবশ্য তিনি এও স্বীকার করেছেন, 'এলিয়টের লেখায় এমনসব ব্যাপার অনেকখানি আছে যার ফলে বোঝা যায়, তাঁর নিজের যুগের পালভরা পাপিতা ও অস্থঃসাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া সোচ্চারে ঘটেছে।' [Axe's Castle P. 124]

Wyndham Lewis সি. এস এলিয়ট সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর বক্তব্য নিম্ন আশ্রয়ী, কাজেই যেটাবুটি নিরপেক্ষ ; গ্রহণযোগ্য কিনা বিতর্ক সাপেক্ষ ; তবুও গুরুত্বপূর্ণ :

If there is anything more than another paraded by Mr. Eliot, the literary critic, it is a supposed logical precision of statement, a fastidious carefulness in the use of words. Is it a gross self-delusion, one sometimes wonders, or a mere bare-faced bluff. [Men Without Art]

'Bare faced bluff' কথাটা এলিয়টের ক্ষেত্রে যেটাবুটি প্রযোজ্য নয়। সমালোচক হিসেবে তিনি গভীরভাবে সব কিছু পর্যালোচনা করেছেন, পরীক্ষা করেছেন এবং নিজস্ব ফর্মুলা, সূচিস্থিত পদ্ধতি, অতুলনীয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। হয়তো তাঁর বক্তব্যটি বিতর্কের উপধর্ম নয়। কিন্তু আট বলে কিছুতেই bluff শব্দ সঠিক কিনা তথ্যনির্ভর নয়।

অবশ্য A. G. George মন্তব্য করেছেন, he has some defects as a critic. He is often pontifical and sometimes overweening. [T. S. Eliot : His Mind and Art]

কথাটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে A. G. George ব্যাখ্য আর্নল্ড সম্পর্কে এলিয়টের নবপাটীম বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এলিয়টের দৃষ্টিতে ব্যাখ্য আর্নল্ড চলেছেন, 'দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে একজন আশ্চর্যপ্রসূ ব্যক্তি। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর বাহ্যিক ঠাট বক্তব্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে অকালিম্বুর্হ।'

স্বীকার করি এটা সমালোচনা নয়। অথবা এও বলা যেতে পারে, সমালোচনার ক্ষেত্রে পুণ্ডিত কোনো বিবিষ্ট ব্যাখ্য আর্নল্ডের ব্যাপারে তিনি যেমন চালেননি। এভাবে তিনি ছিলেনকেও কটাক্ষ করেছেন। আর্নল্ডকে তিনি আরো নির্ভরভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আর্নল্ড ছিলেন একজন সুল পরিদর্শক। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন কবিতার অধ্যাপক।'

সমালোচক হিসেবে এলিয়ট-এর প্রধান ক্রটি হলো, তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে যে মানদণ্ডের কথা বলতেন তা নিজের সুবিধে হতো। আবার পরিবর্তনও করে ফেলতেন। এ ধরনের স্ববিবেচিতা বিজ্ঞাতিক অবস্থার সূত্রপাত করেছে। অথচ তাঁর মত সমালোচকের ক্ষেত্রে এমনটি খটা উচিত ছিল না।

দাস্তে সম্প্রসিক্ত রচনায় তিনি বস্তু্য করেছেন, কোনো কবির কবিতার রসোপলব্ধির জন্যে তাঁর জীবনদর্শন কিংবা আইডিয়াল আদ্য স্থাপনের প্রয়োজন নেই। অথচ একই সাথে তিনি শেলীর কাব্যকে 'Repellent ideas' বা 'অকটিকর ভাবধারার' অত্মহাতে দিলে করেছেন।

এ ধরনের বিজ্ঞাতিক মানসিকতা সমালোচনার ক্ষেত্রে নিত্যমুখ্যজনক। এবং এর ফলে সমালোচনার মান বিপ্লবিত হয়। সমালোচনার অগতে যার স্থান অবিসংবাদিত—যিনি সবল সত্যের স্রষ্টা সমালোচনার গতিধারা প্রবর্তন করেছেন, তিনিই বা কেমন করে শেলী ও মিল্টনের মত লেখকদের প্রতি অত্যাধিকার নির্দয় হতে পারলেন, এর যথাযথ ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। তবু মনে হয়, 'ব্যক্তির প্রতি বিরূপ ধারণার' বশবর্তী হয়ে তিনি তা করেননি। শিল্পকলার উর্ধ্ব কিংবা পিছমে কিংবা অন্তরালে যে ব্যক্তি-চরিত্রের অস্তিত্ব তিনি গৌণ বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্ভবতঃ তা' তাঁর কাছে সঠিক বলে মনে হয়নি। তাছাড়া, মতবাদ বিবর্তনের আওতামুক্ত—একথাও বেনে নেয়া যায় না। এলিয়ট বিশেষজ্ঞরা বোধ করি এমিকটার প্রতি গুরুত্ব দেননি। A. G. George-এর বস্তু্য প্রাধিকারযোগ্য :

...his capacity for subtle analysis and the widely admired lucidity and severity of his prose style make him one of the most distinguished among contemporary critics.

শুধু কী তাই। সুরধার দৃষ্টিভঙ্গী, সূক্ষ্মবিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সার্বজনীন রচনামণী তাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে তাঁর কাব্যের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য তাঁকে কবি ও সমালোচক হিসেবে এক অনিত্যাত্ম্য সম্ভার রূপান্তরিত করেছে। তাঁর কবিতার সাথে তাঁর গদ্য রচনার তুলনা করা হলেও দেখা যাবে যে এমন সব সমালোচকদের সংখ্যা নিত্যমুখ্য কম যারা এতো অধিক নিষ্ঠে পারেন—এতো নিষ্ঠুতভাবে, এতো কম কথায়।

এখানেই এলিয়টের মাহাত্ম্য। যোরতর নিলুৎকরাও তাঁর লেখায় অপ্রয়োজনীয় শব্দাবলীর ব্যবহার দেখাতে পারবেন না। কবিতায় যেমন প্রতিটি শব্দ অর্থবহ এবং প্রয়োজনীয় তেমনি তাঁর গদ্য লেখারও তিনি সদাসতর্ক। মনে হয় এলিয়টের একটি কবিতা আরেকটি কবিতার সমালোচনা। নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে নিজেরই সদা-সমালোচনা মুখর—এমন নজির, টি.এস. এলিয়ট ছাড়া, আর কেউ বয়েছেন কিনা বলা কঠিন। Miss M. C. Bradbrooke বর্ণনা করেছেন: his equipment as a critic is congruent with his equipment as a poet. [Eliot's Critical Method, edited by B. Rajan, p. 126]

সামাজিক সমালোচক হিসেবে

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন: "সংক্ষিপ্ত আর অসহায় হচ্ছে মানুষের জীবন। নিশ্চিত নিরতি নির্মূল্য ও অস্বাভাবিক নিয়ে মোহে আসে তার এবং তার জাতির উপরে।"

উপরোক্ত ভাবধারা H. G. Wells, George Orwell, Aldous Huxley, Arnold, Hardy, Pater প্রমুখ লেখকদের রচনার বিকশিত। গাঢ় অঙ্ককার প্রকৃতির নিম্নলিখিত পটভূমিতে ক্রমশ: পাখা বিস্তার করে চলেছে আর এর সাথে মানুষের অস্তিত্ব অসহায় কাতরানি ও বার্ষভার দীর্ঘনিশ্বাসে ডুবেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কোথায় মানুষের জানা নেই। উল্লিখিত লেখকদের কষ্ট ভগ্নতে জাই নিষ্ঠুর নির্যাতন নিশ্চয় অথচ স্তম্ভিষ্ঠিত পলচারণা মানুষের হাসি-কান্নার অন্তরালে একটানা কক্ষনহুয়ের আবহাওয়া বিস্তারিত করেছে।

কোনো কোনো লেখক এর মধ্যে প্রত্যাক করেছেন সামাজিক অবস্থার চিত্র। কিন্তু কোনো এ অবস্থার—কোনো এ হতাশার আবর্তন—মানুষের বহনান যন্ত্রণার সূত্রপাত কোথায় এবং এর কী কারণ, এসবের ব্যাখ্যা মানাঙ্কনে নানাভাবে করেছেন। আর্নল্ড মনে করছেন, এসব হচ্ছে কালচার'কে অবহেলা করার প্রতিকল। তাঁর 'কালচান' সম্পর্কে ধারণার সাথে মিশে আছে 'ধর্ম'। অতীতকে তিনি পরীক্ষা করতে চান কেননা তিনি বিশ্বাস করেন, এর মাধ্যমে ভবিষ্যত পৃথিবীর মানুষের জন্মো পথচলার নির্দেশ পাওয়া যাবে।

এনিয়টের ধারণা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, সময়কে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে বিভক্ত করা অর্থহীন। তাজাড়া তিনি এ'ও মনে করেন, সময়ের সাথে অনন্তকালের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। বর্তমান ধারণ করছে অতীত এবং ভবিষ্যতকে। Here and now-এর অন্তর্গত হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যত। বাহ্যিক, 'সময়' সম্পর্কে উভয়ের ধারণা প্রায় কাছাকাছি। যদিও এনিয়টের চিন্তাধারা আরো গভীর। অধিকন্তর সুদূরপ্রসারী। এনিয়ট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের উপরে ইমান ছাড়া সামাজিক উন্নতিকল্পে যতোরকম পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেনো, সেসব ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি বলেন: "আমাদেরকে সদাযর্ষদা বলা হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক সমস্যা অপেক্ষা করতে পারে না। এটাও সবভাবে সত্যি, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যাও অপেক্ষা করতে পারে না। এসব আগে থেকেই দীর্ঘকাল যাবত অপেক্ষা করেছে।"

আমরা বর্তমানকে উপেক্ষা করি। অবহেলা করি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশার বর্তমানের দাবি আমাদের কাছে গৌণ বলে মনে হয়। এর ফলে আমাদের আর্থিক বিকাশের পথ বিপ্লিত হয়। আমরা Ego-centric হয়ে পড়ি। Over complacent historical knowledge এ অবস্থার অনো দাবী।

সাহিত্য কর্ম বিশেষ রূপের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সাহিত্য বিচার শুই বৈশিষ্ট্যের পথ ধরে নিজস্ব গতি নির্ধারণ করে। কিন্তু সাহিত্যকে কালজয়ী হতে হলে সর্বকালের বৈশিষ্ট্যের প্রতিকলদস করতে হবে। নইলে কোনো শিল্পকর্মই স্থায়ী হতে পারে না।

সামাজিক সমালোচনার ক্ষেত্রে এনিয়টের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মানবিক অসম্পূর্ণতা। মানুষ বতই চেষ্টা করুক না কেনো, তাঁর কাজের কলিকল সম্পর্কে সে কখনো নিশ্চিত হতে পারবে না। সুখ-শান্তি ভবিষ্যতে অস্তিত্ব হবে, এবং ধারণাও সঠিক নয়। ভবিষ্যতের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন, তা হচ্ছে ব্যক্তি-বিশেষের সাথে ঈশ্বরের যথাযথ সংযোগ স্থাপন। যাব এ সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর হলে, সুখ-শান্তির পরণ প্রতি বৃহুর্ভেই অনুভব করা যাবে।

এনিয়ট ব্যক্তি বিশেষের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করছেন। সবটাই ধারণা ব্যক্তি থেকে আসে। অন্তঃপ্রাণ ব্যক্তি যদি নিজেকে একজন ইউনিট হিসেবে সমাজকে অর্থপূর্ণ পথে পরিচালিত করতে চান তাহলে

ব্যক্তি ও সমষ্টির সাথে সাথে সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হয়। সামাজিক সমস্যার মূলীভূত কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলছেন :

If humility and purity be not in the heart, they are not in the home: and if they are not in the home they are not in the city.

The man who has builded during the day would return to his hearth at nightfall: to be blessed with the gift of silence, and dose before he sleeps.

[Choruses from 'The Rock'v]

বিচ্ছিন্নতা—বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অভিশাপ—সামাজিক কিংবা মানসিক অথবা উভয়বিধ অর্থে, মানুষের আত্মিক শক্তিসমূহের ক্ষতি সাধন করেছে। এলিয়ট মনে করেন, এ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার এবং অবিলম্বে।

এলিয়টের অবদান

It is a function of all art to give us some perfection of an order in life, by imposing an order upon it. [H. W. Carr: Proceedings of British Academy. Vol. VIII, P. 6]

শিল্পের কাজ হচ্ছে জীবন-বিন্যাসে কিছুটা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা-বিধান করা। উপরোক্ত উদ্ধৃতি এলিয়টের ব্যক্তি বাসন উন্মোচনে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জীবনভর ওই উদ্দেশ্যে সারমণে রেখেই তিনি সাধনা করে গেছেন।

জ্ঞানের কথা মুখস্থ করা এক বাপার জ্ঞান অর্জন করা আবেক বাপার। আবার, জ্ঞান থেকে নির্ধারিত গ্রহণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর বাপার। জ্ঞান হাফস করে এর মাধ্যমে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করা অতি কঠিন বাপার। উঁচুদের শিল্প চেতনা ব্যক্তিরকে তা সম্ভব নয়। এলিয়ট তাই করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিক থেকে এলিয়টের প্রতিভার জুড়ি নেই। ওষু ইংরেজী সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে এধরনের প্রতিভা বিরল।

মিলটন সম্পর্কে একবার তিনি বলেছিলেন, মিলটনের মতো এতো অধিক জ্ঞান অজ্ঞানের মাঝখান দিয়ে কোনো কবিই প্রকাশ করতে পারেননি। একখাটা তাঁর নিজের বেলাও সমভাবে প্রযোজ্য। বিশ্ব-কোষের মতো জ্ঞান তাঁর। আর ওই জ্ঞান সূচাক্রমে তিনি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

A. G. George বলছেন :

human dignity springs from the fact that man is a compact of the finite and infinite, of good and of freedom and necessity, the natural and the supernatural, the contingent and the eternal, of matter and spirit.

আলো-অঁধারের বিরোধী উপাদান আছে মানুষের জীবন ও স্বভাবে। এর একটিকে অস্বীকার করা হলে অপরটিও অস্বীকার করতে হয়। অথচ এ দুয়ের উপস্থিতি রয়েছে মানুষের চরিত্রে।

नवकन एकाडेची पत्रिका । ८१

ওই ধরনের পুজিবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থা সাময়িক মূল্যবোধের বারাদিক বিপর্যয় সূচনা করে। মানুষের এদিনের সঞ্চিত মূল্যবোধ উল্টিয়ে কেনে দিবে অসংগত জীবনধারণের সপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরে। 'কম্যুনিজম', তাঁর মতে, 'ওই ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর সুখপ্রদ জীবনের দৃষ্টিকোণী কথ্য বলে। বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের খেলায় সেটি প্রযোজ্য।' কারণ কম্যুনিষ্টরা not only feed the hungry, and clothe the naked, but remove the feeling of 'boredom' which is what the average man cannot stand.

রাজনীতি সম্পর্কে এলিয়টের চিন্তাধারা

রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। ব্যক্তি সমষ্টির অসংগত চাপে পড়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ব্যক্তির বিকাশ বিঘ্নিত হয়। সংখ্যাগুরু অত্যাচার থেকে বিপদ নেমে আসে। শুরু হয় জনতার একনায়কত্ব।

The mass can more effectively stifle individuals than totalitarianism.

জনতাব উচ্ছ্বল 'মাচরণ' ব্যক্তির বিকাশের পথে ভয়ংকর দেয়াল রচনা করে। একেত্রে অবশ্য এলিয়ট গণতন্ত্রের সামান্যকৃত্য প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মনে করেন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় এ অবস্থার অবগতি নিশ্চিত করা উচিত। কথ্যটা গণতন্ত্রবিরোধী মনোর পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে এলিয়ট গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও সাধারণ অর্থে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

তবু বলা যায়, তিনি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। আর গণতন্ত্রের ব্যাপানে তাঁর মত স্পষ্ট : 'আসল গণতন্ত্র সর্বদাই বাধাবন্ধনযুক্ত গণতন্ত্র। এর বিকাশ কেবলমাত্র বংশানুকরণিক অধিকার ও দায়িত্বের মাধ্যমেই সম্ভবপর।' [The Criterion, Vol. viii, December, 1921]

তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক গোপান-এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করে বলেছেন :

The emotional excitements which political slogans [Communism, Fascism, Republicanism, Nationalism] arouse seem to be a crude substitute for the loss of religious emotions. [The criterion, vol. viii, Dec. 1928]

সাধারণতঃ লেখকদের খেলায় যা ঘটে, এলিয়ট রাজনীতির ব্যাপারে অনাগ্রহী; তাঁর আগ্রহ ছিলো রাজনৈতিক ডাবধারা সম্পর্কে।

কম্যুনিজম-এর প্রাথমিক স্তর—যে স্তর মানুষের পাখির সমসার সমাধান দেয়, এ নিয়ে তিনি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। তবে কম্যুনিজমকে যখন অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের স্তরে নিয়ে আসা হয়, এলিয়টের কণ্ঠ তখন প্রতিবাদমুখর। তিনি ওই ধরনের বিশ্বাসকে 'বিখ্যাচার' বলে মনে করেন।

এলিয়ট এতদ্ব্যতীত এও বলেন, the same is true of Fascism and of extreme nationalism. [The Criterion, viii, 1928, P. 282]

ভবু বলা যায়, এখানে এনিরট সম্পূর্ণ নির্মূল নয়। ক্যান্টোবাদ ও চুডাত আতীতবাদ ক্যান্টোবাদের সমোচ্চারিত শব্দমালা হতে পারে না। ক্যান্টোবাদ হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। ব্যক্তিগত নিপীড়ন থেকে সবটিকে বন্ধ করার এক মানবিক দাবি। ক্যান্টোবাদ ওই ধারার ব্যক্তিগত। চুডাত আতীতবাদও তাই।

তিনি রাজার শাসনকে প্রকারে চোখে দেখতেন। সত্ত্বকত: বৃট্টানের রাজ-প্রীতি এনিরটের মনেও দোলা জাগিয়েছিলো। বৃট্টানের দৃষ্টিতে রাজত্ব হচ্ছে কনজার ঐশ্বরিক সূত্রের পাখি বিকাশ। এনিরট প্রবর্তন করলেন the idea of loyalty to a king who incarnates the idea of the Nation. [The Criterion, VIII, July 1929, P. 690]

রাজত্বের প্রতি মানুষের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এনিরট-এর যে অভিমত রয়েছে, তা হচ্ছে, তাঁর মতে “সভ্যতার বৈশ্বিক ভাবধারা—পশ্চাত্তরে ক্যান্টোবাদ কিংবা ক্যান্টোবাদের মতুম কিছুতো নয়ই—বিশ্বব্যাপক নয়।” [The Criterion, VIII, July 1929, P. 691]

উপরোক্ত মতবাদের সাথে সেন্ট অগাস্টাইন-এর The City of God ও কিরেক্টগার্ড-এর The Present Age (1846) গ্রন্থে বিস্তৃত রাজনৈতিক মতবাদের মিল রয়েছে। এনিরট তাঁর Essays, Ancient and Modern গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠায় বলছেন, ‘ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণাপোষণকারী যিহুই-হোন—তিনি ক্যান্টোবাদী অথবা ক্যান্টোবাদী অথবা গণতন্ত্রী অথবা বুদ্ধিবাদী, যে মাঝেই নিজেকে ডাক্তার না কোনো, তাঁর আদর্শ সর্বদা দীর্ঘ নামের এবং প্রত্যাশা উদ্ভবকারী।’

১৯৩৩ সালে এনিরট যুক্তবাদের বিশেষকারী হওয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি লেখলেন তাদের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন, ওদের মাঝে রয়েছে হতশাসন দীর্ঘশ্বাস। এ অবস্থার জমো দারী বৌদ্ধিক কারণসমূহ জরীপ করার পরে এনিরট সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, it is far better to be stupid in a faith, than to be stupid believe nothing. [The Criterion, XII, April 1933, P. 472] রাজ-আনুগত্য বা বিপ্লব বা Theory of royalism প্রকৃতপক্ষে এনিরটের কোনো প্রকার রাজ-নৈতিক আদর্শ নয়। বরং বলা চলে, উদ্ভূত দিক থেকে এ হচ্ছে তাঁর মানসিক প্রক্রিয়া, ধারণা, নিজস্ব অর্থবা ব্যক্তিগত অভিমত। আর এসব বকবা বলার পরে তিনি বা বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে : রাজনীতির সাথে মানবিক সম্পূর্ণতা অর্জনের যে সাধনা এর সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম-বিশ্বাস মানুষকে ওই স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

তাঁর মতবা হচ্ছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে মানব আশাবাদ সত্ত্বকত এবং তা কেবলি ক্ষুদ্র, কেবলি সামান্য। তিনি আরো মনে করেন, পাখি এবং বহুভাষিক সরকারের উৎপত্তির মূলে রয়েছে মানুষের স্বাভাবিক পাপপ্রবণতা।

রাজনীতি সভ্যতার অর্থে মানুষের আর্থিক বুদ্ধির সন্ধান দিতে পারে না। রাজনৈতিক কোলাহলে মানুষকে ক্রমিক পর্যায়ে আর্থিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে পড়ায়। আর ওই অবস্থা থেকে বুদ্ধির পথ হচ্ছে ধর্ম-বিশ্বাস। এবং এসব হচ্ছে এনিরটের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টির গোড়ার কথা। প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক বুদ্ধি সম্পর্কে এনিরটের মতবা থেকে অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি দেয়া আবশ্যিকবোধ করছি :

What ultimately matters is the salvation of the individual soul. You may not like this principle; but if you abjure it, you will get something you like less. The world

lends now to scramble for its salvations by taking a ticket (Moscow). [The Criterion, XIII April 1934, 1453]

কানো কানো মতে রোমান্টিক বিষণ্ণতার সাথে অস্তিত্ববাদের ANGST বা হতাশার প্রতিফলিত রয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে হঠাৎ কথটা মিথোও নয়। রোমান্টিক বিষণ্ণতার সূত্র সম্পর্কে শেলীর মতব্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর সূত্র হচ্ছে, the desire of the moth for the star. অর্থাৎ গভীরতর অর্থে রোমান্টিক বিষণ্ণতার সাথে অস্তিত্ববাদী উষ্মগততার কোনো সম্পর্ক নেই।

অস্তিত্ববাদী উষ্মগততা হচ্ছে, a product of Christain notion of Original sin.

মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের মৌল কাঠামোর ভেতরে রয়েছে অপরাধ, উষ্মগততা, হতাশা। অথবা এও বলা যেতে পারে ওসব হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের অন্তর্গত উপাদান। ব্যক্তিবিশেষ এহেন অবস্থার কাইকেলের অগ্নির বাণীর মতো খুঁজে পেতেও পারে তার মানসিক সাহসার সূত্র :

He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.

এক কথায়, রোমান্টিকতার সাথে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদের বিরোধিতা বর্তমান। জীবন সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদের ট্র্যাগিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। জীবন অর্থহীন অর্থোজিক এবং শূন্যতার প্রতিফলিত। জীবন ধারণের মাধ্যমে মানুষের কোম স্বার্থকতা নেই। তেমনি জীবন মিথোও অস্বার্থক ও অপ্রয়োজনীয়। আর এ হচ্ছে জীবনকে পাণ্ডিত্য কিংবা বস্তুগত দিক থেকে পর্যালোচনা করার কল্যাণ।

আরেক দিক—আধ্যাত্মিকতার দিক, সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের। এখানে জীবন অর্থহীন। মৃত্যু এখানে মহাজীবনের দরোজা মাত্র। এখানকার লুপ্ত-মহাশক্তি দিয়ে এর বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মৃত্যুর দরোজা পেরিয়ে যে জীবনের অবস্থান তাই হচ্ছে সত্যিকারের স্বামী জীবন। অতএব অংশবিশেষের আলোকিত কিংবা অন্ধকারাক্রান্ত দিক দিয়ে মহাজীবনের মূল্যায়ন সঠিক হতে পারে না।

অস্তিত্ববাদ religious classical-tragic দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে। কথটা T.E. Hulme-এর The Speculation-এ বিধৃত। তিনি এলিয়ট সম্পর্কে মতব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

Eliot stated that our present day ruin is the external sign of a world religious Crisis, and that modern history can also be understood as a metaphysical tragedy.

আর্ট-এর আর কি কাজ থাকতে পারে যদি না এ ট্র্যাগেডীকে তুলে ধরতে পারে-----

[A London conversation with T.S. Eliot. P. 280]

বিকল্প দে বলছেন :

‘বিজ্ঞান বিরোধী তিনি গভীরতর জীবনে কোনো ভারসাম্যকটিক্সের স্থান করতে পারেন না। সমস্যাটি

- একেবারে নতুন নয়। টমাস ব্রাউন এই সমস্যার শিঃ করে সমাধান করেন নিজের মতো, বর্বে তাঁর বিশৃঙ্খল নেতিবাচক ছিল না, বিজ্ঞানও ছিল আশ্রয় ; তিনি তিনু হস্তে ব্যর্থ কিন্তু মতবাদের সমাধান খুঁজে পান যাতে আধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান দুইই বিশৃঙ্খল। বসন্তের সমাধানও প্রায় এই স্বকর যদিও তাতে বিজ্ঞানের ভারতাই বেশী। মিনটন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৈ এক চেটে ভুল ছিলেন।

তাই তাঁর ঈশ্বর প্রায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির স্বপ্নক বলাই যায়। বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরায় সেকালে ডেনেব কান্টা কান্টা বুঝ কল্প—এও নিউক্লিওসফি কলন্ অল্ ইন্ ডাউট। এলিফটের অবস্থা প্রায় ডেনেব মতো; বনের গঠনে দেই অধ্যাত্মজীবীর ঈশ্বর, তবু তিনি বর্ববাপী হারী বনোবন্তের মরিকা তক্ত। কৃষ্ণ বাপারটা জানলে হয়তো বলবেন, যে জানে সর্বজীবের বিবিধ জীবনধারা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত, সে ঐশ্বর্য বাসনা দৃষ্ট।

কিন্তু না অধ্যাত্মজীবীর ঈশ্বর তাঁর মনে, তাঁর প্রাণে, এবং ওই ঈশ্বরের আলোকধারা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে করে তুলেছে স্বচ্ছ—স্ফটিকের চেয়ে স্বচ্ছতর। ব্যক্তিগত জীবনে, চেতনার প্রবাহে, সাধনার সৌকর্ষে এবং একাত্মতার তিনি সত্যিই অতুলনীয়। তিনি যে নিরপ ও ডায়নামি আরাধনা করেছেন সেসব হচ্ছে নির্ধার, নির্ভেজাল। পাখির আকাংক্ষার মতো তিনি চাননি। কিংবা এ'ও চাননি, মানুষের সামগ্রিক সত্যের কোনো প্রকার অববুধ্যায়ন হোক। তিনি বাহ্যিক সাধন করিয়ে দিয়েছেন, আরাধনের ব্যক্তিগত নিয়তি বৃহত্তর বাহ্যিক সত্যের নিয়তি থেকে আলাদা কিছু নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো মানুষ মতো বেশী ব্যক্তিগতজ্ঞানোপায় অকৃপা রাখার ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন ততো বেশী তার পক্ষে মানব জাতির সাথে একাত্মতা অর্জন ও বিকাশের পথ সুগম করা সম্ভবপর। এলিফট তাঁর সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের সাথে মানুষের যোগাযোগের পথ চিহ্নিত করার জন্যে। A Song for Simeon এবং Little Gidding কাব্যে হিরাক্লিটাসের বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন:

Those who do not die, die, those
Who die, do not die: of one another
They live the death and die the life.

এলিফট তাঁর সৃষ্টিতে মানুষের দুর্বলতা, নির্ভুলতা, অবিদ্যাকারিতা, অচরিতা প্রভৃতি উন্মোচন করেই কান্ত হননি। তিনি ওই সনের পর্দা অপসারণ করে সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে আরাধনের অবস্থিত করেছেন। আর এর অন্তরালে যে ইতিহাস রয়েছে—যেতে মানবজাতির জন্মনক্ষত্রি অর্তিমালা ও বিত্তীর্ণিকা। তিনি সেসবের সাথে আরাধনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'পোড়ো জমিতে' মানবজাতি নিঃসঙ্গ। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, এলিফট মানবজাতির নিঃসঙ্গতাকেই প্রকট করে তুলেছেন, সমাধানের ডেরন একটা ইচ্ছিত প্রণয় করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, ওই বর্ববের অভিযোগ সত্যি নয়। তিনি মনে করতেন সাহস ও ইরাদেই কেবল ('বিবাস' শব্দটা একেবারে যথার্থ মনে হয়নি।) মানুষের বুদ্ধির সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে পারে। এলিফট মহৎ জীবন-নিষ্কলী দৃষ্টি নিয়ে আরাধনের ঘোষ ও চেতনা পঙ্ক্তিকে সে-সবের দিকে ঘাবিত করতে চেয়েছেন।

তিনি মনে করেন, কোনো নিরপকর্ষই নিরপকে কিছুটা স্বচ্ছকল না করে পারে না। আর তা তবু বর্তমান ও ভবিষ্যতকেই কিছুটা স্বচ্ছকল করবে না বরং অতীতকেও ত্রুটি করে। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর এ ধারণা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ইতিহাস মানে পুরনো পদ্ধতিকে গ্রহণ করা নয়। ইতিহাস হচ্ছে ইতিহাসের মতো বা হচ্ছে humanity's memory of its our past এবং এ কারণেই এলিফট বলেছেন, Conscious present is an awareness of the past.

তিনি ছিলেন ঊর্দ্ধময়ের প্রজ্ঞানম্পন্ন লেখক। এলিয়ট সম্পর্কে বলা হয়েছে:

he brought into poetry something which in this generation was needed: a language spare, sinewy, modern; a fresh and springy metrical form; thought was adult and imagination aware of what is bewildering and terrifying in modern life and in all life.

উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক ও যথার্থ। তিনি তাঁর সমকালীন কবিদের যে কারো চেয়ে নিজস্ব যুগ-সচেতনতাবোধ আণিবে তেজস্বী ব্যাপারে অধিকতর অবদান রেখেছেন। আধুনিক কালের কোনো মহালোচকই সাহিত্য পিপাসুদের মনের উপরে এলিয়ট-এর মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। একে আবার বলা যায়, এলিয়টের মতো কোনো কবিই জীবিত অবস্থায় এতো অধিক পরিমাণে বিদ্যুত পরিসরে আলোচিত হবার গৌড়াগ্য অর্জন করতে সক্ষম হননি।

বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্কিমলাল ইসলাম

অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজমক

সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্কিমলাল ইসলামের স্থান কি এবং তার প্রাচুর্যের সত্যায়নের উপায়ই উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতব্য করা সম্ভবপর। সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন সম্বন্ধে নামাযির সংজ্ঞা ও বক্তব্য প্রচলিত থাকায় কোন সর্ববাঙ্গী সম্মত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। তবে মানব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়ে যে মানবজীবনেরই একটা অনিবার্য অভিব্যক্তি, সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ নেই। জীবনের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিধিরও যে বিস্তৃতি হয় এটি একটি অতি প্রত্যক্ষিত বিষয়। অপরদিকে পরিবেশের প্রভাবের কল্প হিসাবে বা তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাহিত্যের সঙ্গে পরিবেশের সম্বন্ধও তর্কাতীত। তবে এ সবই সাহিত্যের বাহ্যিক প্রকাশ এবং তার বাহ্যিক কারণ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের কল। সাহিত্যের অন্তরীক বাস্তবের অন্তর-সত্য। তা থেকেই বহির্বিষয়ের নামাযির কারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা প্রকাশ পায় নামাযির বৈশীক মাধ্যমে। এজন্য সাহিত্যের মৌল উৎসের সন্ধান করতে হলে মানব-জীবনের বিশ্লেষণও হয়ে পড়ে অনিবার্য। কী রয়েছে সে জীবনে—বা' থেকে যুগে যুগে কত মানুষ নামাযির ক্ষেত্রে এ ধরনীকে সন্ধান করেছেন? এখানেও সে আদি সত্যের প্রাচুর্য বক্তব্যে দেখা দেবে আদি। যৌন-আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধ-পূহা, শক্তিসাধনের বাসনা প্রভৃতি একক প্রবৃত্তির আনোকে সে জীবনকে ব্যাখ্যা করা অতি আধুনিক-কালে একটা ক্যাগান। অথবা মানব-জীবনের বা মানব-মানুষের অন্তর তলার প্রবেশ না করেও বলা যায়, ওগুলো জড়িত রয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে এদের কোনটাই মানবজীবনে একবারে কার্যকরী প্রবৃত্তি নয়। এদের মাধ্যমে মানব-জীবনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাতে অনিবার্যভাবেই যশু সব সময়ই অসীমায়িত থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি, বৃত্তি বা বুদ্ধি যা কিছু অধিকতর সামগ্রিক, তাকেই ব্যাখ্যার মাধ্যম হিসাবে জে ধরেই, জীবনের মৌল উপাদান হিসাবেও অধিকতর সফল প্রবৃত্তি বলে গণ্য করা যায়। সুতরাংভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আত্মসংরক্ষণই মানব-জীবনের আদি ও মৌলিক প্রবৃত্তি। সে আত্মসংরক্ষণই প্রথম পর্যায়ে আত্মরক্ষা, ও পরবর্তী পর্যায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠারূপে দেখা দেয়। কাম, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য প্রবৃত্তি প্রকৃতি বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলো আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠারই নামাযির বৃত্তি হিসাবে মানব-জীবনকে তার সত্যের পাশে পরিচালনা করে। আত্মসংরক্ষণ জীবনের সূচনাতে সর্বপ্রথম দ্বিগত এবং তার পরিণতিতে বুদ্ধ-পূহা, শক্তি সাধনের বাসনা, অত্যাচার, অসুখী হওয়ার বাসনা, প্রকৃতি, প্রীতি প্রকৃতি উপবৃত্তি হিসাবে দেখা দেয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে-যৌন-আকাঙ্ক্ষা, মাৎসর্য প্রবৃত্তি, পরাধীনতা, অপরতা ও বৃত্ত-স্বয়ং, প্রকৃতির সহসা ভেদের বাসনা, পরস্পরক সম্বন্ধে আত্মক প্রকৃতি উপবৃত্তিগুলো। এদের বিশ্লেষণ মানসিক দিক থেকে সম্ভব বলেও জীবনে

তাঁরা অজান্তেই বিকল্পিত। সুদূর অতীতে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকৃত বলেও আধুনিক যুগে সে আদি বৃত্তিগুলোর প্রতিপত্তি স্বীকৃতি লাভ করেছে। জীবনের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের সবগুলোর অস্তিত্বই স্বীকার করতে হয়।

এ সব বৃত্তির সম্ভাব্যবিশাল প্রয়াস অথবা ব্যর্থতার চিত্র সাহিত্যে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে সে চিত্র অংকনের সাক্ষ্যের উপর। তবে তার চেয়েও আরও প্রশিধান-যোগ্য বিষয় হচ্ছে মানবজীবনের প্রকাশের চেষ্টাতে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীনতা, যে সাহিত্যে মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক বহু বেশী প্রতিকলিত হবে, সে সাহিত্যই হবে অধিকতর সফল। একদেশদর্শী সাহিত্যে মানব-জীবন দেখা দেবে—ঠুটোজগতের মত।

বিশ্ব সাহিত্যের আলোচনার এ তত্বই আমাদের কাছে অতিরিক্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কালের ঋণ শ্রোত পার হয়ে বিশ্ব-সাহিত্যে আজও বাঁচা সম্রাট ও অটুট হয়ে টিকে রয়েছেন, তাঁদের স্বর্গীয় মূলে রয়েছে জীবনের সমগ্র দিককে প্রতিকলন করার প্রয়াস। হোবার, বাল্মিকী, শেক্সপীরর যা পোটের সাহিত্য সাধারণ সার্থকতার মূলে রয়েছে জীবনকে সর্বাঙ্গভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা। জীবনের পরিবেশের পরিবর্তন নিতাই ঘটেছে এবং জীবনকে ব্যাধা হয়েছে জীব সবে বাঁচা বাঁহিরে চলতে হচ্ছে। তবে জীবনের মৌলিক উপাদানের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলে, এ সব সৃষ্টীদের স্বর্গে তাঁদের মূলা হারাননি। এজন্য এদের স্বর্গে চরিত্রে পরিবেশের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের জীবনের এক একটি বৃত্তির বা প্রবৃত্তির প্রতিনিধির সাক্ষ্য পাই এজন্য বিশ্ব সাহিত্যকে জে কটেই, সকল সাহিত্যকেই স্পর্শক বলা যায়। বিশ্ব সাহিত্যের পর্দায় উন্মীলিত যে কোন সাহিত্যের আলোচনার এ বিষয়টিই বিশেষভাবে আমাদের নৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেক্সপীরের নাটকগুলো কেন আমাদের কাছে আমাদের বিষয়? এ প্রশ্নের উত্তর শেক্সপীরর স্বর্গে চরিত্রগুলোর মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জড়িত ব্যাকবেশ, কন্যাধর কর্তৃক প্রভাবিত রাজা লীয়ার, জন ও জীবন সবচেয়ে জীবন বিভাজ্যে রাজকুমার হ্যামলেট, প্রণয়বিধুর ওয়াল্যাংগো, বিশ্ব প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিভাজ্যে প্রয়াসী প্রসপেরো মানব-জীবনেরই এক একটা প্রকৃতির প্রতিনিধি। সে বৃত্তি ও প্রকৃতিগুলো মানুষের স্পর্শ করে এ জীবনের স্বরূপকে দেখা দিচ্ছে। সে স্বরূপের পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবে যে সব মানসিক দিকের তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছে সেগুলোর পরিবর্তন হয় নি। এ ব্যতীকরণ পোষকতার সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বোহিডালান বন্ধুনার চরমকার সম্বন্ধা করেছেন:

জীবন যেমন বাহিরের দিকে নিত্য পরিবর্তনশীল, সাহিত্যেও আমরা তেমনিই প্রকাশভঙ্গির নবম লক্ষ্য করি। তৎসত্ত্বেও সাহিত্য যে সর্বযুগে এক, তাহার প্রমাণ হোবার বাল্মিকির কাব্য এখনও যে কারণে অমর হইয়া আছে চিরদিনই তেমনিই থাকিবে। সাহিত্যের তথা জীবনের নিত্যবস্তু কি তাহার একটু আলোচনা এই প্রসঙ্গে করিতে পারিলে ভাল হইত।*

মানবের গভীরে প্রবেশ করলে তিনি দেখতে পেলেন সে আর কিছু নয় মানবজীবনের বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির চিত্রসমূহ। হোবার বা বাল্মিকির স্রষ্টার আত্মা এ তত্ত্বইই উপলব্ধি পাই। আমাদের অতি পরিচিত-সামান্যের মধ্যে রাজা দশরথ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পুত্র কামনা করে জাঁতে সকল হয়েছেন, সে পুত্র চড়ুইয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মানচক্রকে নৌ-রাডো অতিবিক্রম করা কালে তাঁর রূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত

* সাহিত্য বিচার : বোহিডালান বন্ধুনার : পৃ: ১১০

করার উদ্দেশ্যে আবার নৈতিক পানককে শূদ্ধা করতে হবে, তাঁকে দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর বনবাসে প্রেরণ করতে বিবৃথ হতে পারেন মি। যে আদর্শ পুত্র হারকে দির্বাসনে পাঠিয়ে আবার সত্য করতে না গেলে বোম্বার্ডার করেছেন, সে হারকে ধর্মীর পতি থেকে বের করে বিচার করলে তাঁর চরিত্রে এ্যাডলার (Adler) বর্ণিত শক্তিমাত্রের উন্নত আকাক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। যে শক্তির প্ররোপ করে তিনি বনবাসকালে কত প্রাণী হত্যা করেছেন, তাঁর ইয়ত্তা নেই। তিনি আচারে আচরণে বোম্বার্ডার শক্তি। রাসে ব্যতীত অন্য আহারে তাঁর কচি নেই। তবে সীতার মনে জর্জাইন্ডার নারীসঙ্কোচের কোন কামনা নেই। এখানে তাঁর চরিত্রে দেখা দিয়েছে আদর্শ নিষ্ঠা। তবে তাঁর চরিত্রে মানব-মূলত মানাচ্ছটি পূর্বাপন রয়ে গেছে।

তিনি হারকীর চাল পরিবর্তন করেননি। সীতাকে উদ্ধার করার উপায়স্বরূপ তিনি বানী ও হুজীকের সূহবুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছেন। একেত্রে ব্যাকিরাভ্যাগি প্রচারিত লক্ষ্যের আলোকেই উপায়ের বাধ্যত্বের বিচার হওয়া উচিত (The end justifies the means) নামক নীতিকে গ্রহণ করে তাঁর মানবিক গুণের প্রকাশ করেছেন। ভেদমি অপাপবিদ্ধা ভেদেও প্রজারক্তনের জন্য সীতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। এতে অতি আধুনিক প্রজাতন্ত্রের নীতির প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার নিদর্শন রয়েছে। এগুলো রামচরিত্রের মধ্যে দেখা না মিলে হরত রাম অবতাররূপে এখনও টিকে থাকতেন, তবে মানুষ বলে তাঁর কোন পরিচয় পাওয়া যেতো না। বুদ্ধবের বহু সতিাই বলেছেন :

পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য আমি যা' বুঝেছি, তাঁর নাম দিতে পারি বাস্তবতা, সে বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্বচ যে তাঁর তুলনার আধুনিক পাশ্চাত্য রিহালিজম-এর চরম সমুদায় মনে হয় দুরাত। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তাঁরই নির্বিকার দর্পণ, মহাকাব্যে ট্রাজেডির মস্তা নেই, কমেডির উজ্জলতা নেই; 'তাতে পলা কখনো কাঁপে না, পলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনার ভেদ নেই—সবই সমান, আগাগোড়াই সমতল এবং সমস্তটা ইচ্ছা ক্রান্তিকর।

ক্রান্তিকর তো বটেই কারণ যা' অশোভন,মানুষ যাকে পরিহার করতে চায়—সে দিকটা যত জঘন্যই হোক না কেন, তাতে প্রতিফলিত হয়। এজন্যই তাঁকে মানবজীবনের সবাক অভিযান্ত্রিক বলা যায়। এজন্যই এমন মহাকাব্য কালের করাল বুকুটি তুচ্ছ করে, যুগযুগান্তে আপনার মহিমা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। উপরোক্ত আলোচনাতে আমরা যে সূত্রের সন্ধান পাচ্ছি তা কেবল মহাকাব্য সত্ত্ব সত্য নয়—মহাচিন্ত্রণ সত্ত্বও সত্য। বিপুল সাহিত্যে আলগু যে সব স্থষ্টী ক্রান্তিক হিসাবে শূদ্ধা লাভে সক্ষম, তাদের সকলগুলোর সেই একই বীতির রূপারণ দেখা যায়।

২

নজরুল ইসলামকে বলা যায় বাংলার বিদ্রোহী কবি। শান্ত সমাহিত শ্যামল বাংলার বৃকে তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের ছুর আমলানী করেছেন বলে তাঁকে বলা হয় বিদ্রোহী কবি। এ উপাধি নজরুল ইসলামের সৌরভ ব্যতক না নিশা ব্যতক বোঝা কঠিন। একথা অবশ্য সত্যি যে

‘প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ব্যবস্থা, রীতি, নীতি, সংস্কার ইত্যাদি সব কিছুই বিরুদ্ধেই তিনি সর্বদা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ সবই বিদ্রোহের লক্ষণ। কিন্তু তাই বলে যদি তাঁর একমাত্র পরিচয় ঈড়ার যে তিনি বিদ্রোহী কবি; তাহলে তাঁর কবিকৃতির প্রতি খুব সুবিচার করা

হবে না।...এখন খুব স্পষ্ট গলায় বলা দরকার যে বিদ্রোহ তাঁর কবিতার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে; কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয় তাঁর কবিতার, আর একটি প্রধান উপাদান ভালবাসা।’

নীতিবোধনাথ চক্রবর্তীর এবতব্য খুবই সত্য। তবে তাঁর বিদ্রোহের পাশে প্রেমের পরিচর মিলেই তাঁর সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয় না। আরও নানাদিক তাঁর কাব্যে এত পরিষ্কৃত যে তাঁদের সঠিক বর্ণনা দিলে নজরুল ইসলামের পরিচর অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ‘নজরুল-স্মৃতি’ নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত নানাবিধ প্রবন্ধ থেকে তাঁর জাজুলনোমান প্রমাণ রয়েছে। তাতে কেউ নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী, কেউ প্রেমিক, কেউ সামন্তবাদী, কেউ শ্রেণী সংগ্রামশীল, কেউ বয়সী, কেউ সাধক ইত্যাদি নামা বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এতে নজরুলের জীবনে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তাও অতিশয় স্পষ্ট। কারণ তাঁর কাব্যজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি পরস্পর-বিরোধী ভাবধারাও প্রকাশ করেছেন। নজরুল-জীবনের স্তম্ভবাক পর্যায়ের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এ নিয়ে তাঁকে কোন মহল থেকে কিছুপাত্রক কটুক্তি করাতেও ত্রুটি হয়নি। তবে নজরুল ‘আমার কৈফিয়তে’ তাঁর জওয়ার দিয়ে তা’ বণ্ডন করার চেষ্টা করলেও, ওরা তাঁর পিছনে সর্বদাই ফেরপালের মত লেগেই ছিলেন। ওদের দৃষ্টান্তি খুব সীমিত ছিল বনই তাঁরা নজরুলের কাব্যে অবরোহ বা আরোহের নীতিগুলোর ব্যক্তিত্ব নেষে বিস্ময়ে হতচক্ক অভিত্ত হতেছিলেন, তাঁর চেয়ে অনেক বেশী স্বর্ধী হয়েছিলেন নজরুল ইসলামের মধ্যে অসামন্ত্য আবিষ্কার করার সার্বকজীর। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন—এ বিশেষ অনাটন শ্রেষ্ঠ কবি ওয়াল্ট হাইটম্যানকে বখন তাঁর কাব্যের অন্তর্গত বস প্রদর্শন করা হল তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠেন : জীবনটাই তো একটা বস। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—জীবনের মধ্যে বখন বস রয়েছে তখন কাব্যে তাঁর প্রতিফলন হবে অনিবার্যভাবে, এতে বিম্বিত বা বিস্কৃত হওয়ার কোন কারণ নেই। এভাবে বঁরা একটি বিষয়ে গৃহীত সূত্রে অপর বিষয়ের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের এবংবিধ জাতিকে অভি আধুনিক দর্শনে বলা হয়—category mistake. অর্থাৎ যেখানে বা’ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সেখানে তা প্রত্যাশা করে সে সম্বন্ধে কোন বস্তুবা করা সে জ্ঞানির মূলে রয়েছে। স্বাভাবিক্য নীতি হিসাবে ন্যায়শাস্ত্রে বা দর্শনে শ্রদ্ধান্বিত, কাব্যজগতে তাঁর কোন স্থান নেই। কাজেই কাব্যজগতে তাঁর প্রাপ্তির আশা সেরূপ একটি জ্ঞানি ব্যাখ্যা আর কিছুই নয়।

কাব্য মানব-মানসের প্রকাশ বনই তাঁর মধ্যে। মানবজীবনের নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দাবী, সম্ভাব্য বা বাস্তবতা তাতে প্রকাশ পাবেই পাবে। গোলাপের বন্ধু গড়ে বিড়োব হয়ে যে কবি এ বিপু সম্বন্ধে আশার বাণী প্রকাশ করেন, সে কবির মানসে স্বরা গোলাপের বাখীর অশ্রুর বন্যা বয়ে চলে। কাজেই কবিগণ মানব-মানসের প্রতিনিধি বলে, তাঁদের মানসে কেবলবাত্র একই ভাবের উদয় হবে এবং তাঁরই অনুপ্রেরণার উদ্ভূত হয়ে জরা ন্যায় শাস্ত্রের বিধান অনুসারে পরিচালিত হবেন, এমন কোন দাসবৎ কোন কবিই পূর্বাঙ্কে নির্ধেয়েননি।

নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তাই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তিনি কোন ভাবের বা আদর্শের কবি নন, তাঁর সম্বন্ধে আসল প্রশ্ন তিনি বাস্তবিকই মানব-মানসের সত্যিকার প্রতিনিধি কিনা এবং সে মানসের বিভিন্ন মিকের সত্যিকার প্রতিনিধির তিনি করেছেন কিনা। তাঁর সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নকবি বা নিম্ন সাহিত্যিক হিসাবে বঁরা সাহিত্য জগতের শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন তাঁর অবদান সে-বব কবি বা সাহিত্যিকের অবদানের সব পর্যায়ের কিনা? এখানে আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে আনোচনার প্রয়োজন—এ বিশেষ মহাকাব্য বা সত্যিকার উপন্যাসে মানব-চরিত্র চিত্রনের যে সুবিধা দেখা দেয়, বও

কাব্যের মধ্যে যে সুবিধা নেই। উপাধরণ বলে বলা যায় হোমারের 'ইনিয়ড বা ওডিসি'তে মানব-চরিত্র চিত্রণের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, অথবা টলস্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীসের মধ্যে তার যে সার্থকতা দেখা যায়, ঋগ্ কাব্য বা ছোট গল্পে ভেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এতদ্বারা উপন্যাসকে এক পর্যায়ের এবং নিম্ন কবিতা ও ছোট গল্পকে অন্য পর্যায়ের সৃষ্টি বলা যায়। কোন সকল ছোট গল্প-নিবন্ধের অনেকগুলো গল্পের সমষ্টি একত্র করে যেমন তাঁর সম্বন্ধে কোন বক্তব্য করা সম্ভবপর হয়, ভেমনি সার্থক ঋগ্ কবিতার কবিতাগুলির বিভিন্ন ধর্মী কবিতার মধ্যে অনু-প্রবেশ করে, তাঁর জীবন-দৃষ্টির ব্যাপকতার সন্ধান পেতে হয়। বোপার্সার বিভিন্ন গল্পে আমরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করতে পারি। যেটি হচ্ছে এ বিশ্বের নানাবিধ নীতিতে অসামঞ্জস্যতা। অর্থাৎ তাঁর নায়ক ও নায়িকারা দুইয়ে দুইয়ে মিলে চারুই হয়। কোন অদৃশ্য এক কারণের ফলে কোথাও বা তিন আবার কোথাও বা পাঁচ হয়ে যায় না। ঋগ্ কাব্য রচয়িতাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী। তাঁর বিভিন্ন রচনার সমগ্র মনন করলে যে সমস্ত ভেসে ওঠে তা হচ্ছে মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের উপর অতি প্রখর আলোকপাত। সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে যে মানবজীবন কিভাবে অবস্থিত বিধৃত হ'চ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত যে তার জয় অনিবার্য, রবীন্দ্রনাথ তার অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টির মাধ্যমে সে আশার বাণী অস্বাভাবিক সুনীরেছেন। যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে তার তাঁর দর্শনে প্রতিভাস বলে উপহাস করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বলোদৃষ্ট কণ্ঠে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছেন। 'তুমি নব, নবরূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে করণে এসো গানে' প্রভৃতি উক্তিগত তাঁর সে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই, যা তার সুস্বা দৃষ্টির ভিল বহির্ভূত। এতদ্বারা আজকের দুনিয়া তাঁকে ক্লাসিক হিসাবে গণ্য করেছে।

নজরুল ইসলামের সৃষ্টিতে সেক্ষেপ সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। তাঁর বিভিন্ন রচনায় মানব-জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে এমন চমৎকার আলোকপাত হয়েছে, যার জন্য তাঁকে বিগুন-সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য অধিকারী বলা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে --- কাব্য বা গল্পের নায়ক নায়িকার রয়েছে একটা প্রতিনিধিত্ব মূলক representative চরিত্র। মানব-জীবনের এক একটা দিক তাতে প্রতিভাত হয়। সে প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে মানব-মানবের বৌদ্ধিক প্রবৃত্তি আত্মসংরক্ষণ। সে প্রবৃত্তিই প্রখর পন্থায় আত্মরক্ষা এবং পরবর্তী পর্যায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠা রূপে দেখা দেয়। এ সব প্রবৃত্তির আবার উপ-প্রবৃত্তিও রয়েছে। আত্মরক্ষার উপ-প্রবৃত্তি হচ্ছে বৃদ্ধিশূন্যতা, পঙ্কিলভেদের আকাঙ্ক্ষা। অচরিতা, প্রকৃতি প্রীতি, সাশ্রয়ী চরিত্র বাসনা। আত্মপ্রতিষ্ঠার উপ-প্রবৃত্তি যৌনবাসনা, বৃথ-চারী প্রবৃত্তি, পরাধীনতা, অপত্নতা ও রক্ত মেহ, রক্তা ভেদে বাসনা, পরনোদক সম্বন্ধে আগ্রহ প্রভৃতি।

আবার চেতনার অগতে বুদ্ধি, প্রকোভ ও ইচ্ছা নজির নানাতাবে আনন্দের জীবনে দেখা দেয়। বুদ্ধি সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে পরিচালনা করে এবং তার মধ্যে নিচাঁর গোল, ঐতিহ্য চেতনা, আদর্শ-বোধ প্রভৃতির অভ্যাস হয়। প্রকোভের প্রকাশ হয় ভর প্রের ক্রোধ প্রভৃতি রূপে এবং ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই আনন্দের কামনা বাসনা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এ তিনটে বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে এমন অজাতি সম্বন্ধে জড়িত যে একটিকে অপরটি থেকে তুলে বিনে থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও বাস্তব জীবনে তাদের পার্থক্য আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। বুদ্ধি থেকেই প্রকোভের উৎপত্তি, না প্রকোভই বুদ্ধির সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে বলা যুট কঠিন। বুদ্ধিকে ইচ্ছাশক্তির জনকও বলা যায় এবং তার পুত্রও বটে। নানাবিধ বৃত্তি ও

উপনৃতি এবং চেতনার অগতে নানাবিধ ভাব দেখা দেয়। সেগুলো কখনও সত্যের লাভের জন্য লাগানিত, কখনও বা বার্ষিক্যবুহাবাস, কখনও বা তার মধ্যে দেখা দেয় নানাবিধ সবল্যা। আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানব-মানস নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। কোথা থেকে এ ধর্যাবাবে মানব দেখা দিল ? তার জীবনের পরিণতি কি ? পরকাল বলে কিছু রয়েছে কিনা ? সেখানে ব্যক্তি সত্যের স্থান কি ? প্রভৃতি প্রশ্ন দেখা দেয়। এ সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত বীনাংসা কোন কালেই হয়নি এবং কোন কালেই হবে না। তবে সকল কালেই এগুলো উত্থাপিত হবে এবং সকল যুগেই জীবনের সমাধানের জন্য মানব যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

মহাকাব্যের রচয়িতাগণ অথবা মহা উপন্যাসের বা মহানটকের শ্রষ্টাগণের কর্তব্য হ'চ্ছে মানবজীবন অথবা মানব-মানস সে সব প্রশ্ন বা সমস্যা দ্বারা কি ভাবে আলোকিত হ'চ্ছে, তা মানব সমাজে তুলে ধরা। মহাকাব্যের রচয়িতা না হলেও খণ্ড কবিতা বা দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ হাকিম প্রমুখের মত নজরুল ইসলাম যে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তাতে তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যের অপর এক শ্রষ্টা বলে শ্রদ্ধার্পণ করা যায়।

৩

মহাকাব্যগণের কাব্যে জীবনের সব দিকের আলোকপাত হয় বলে তার আলোচনা নানাবিধ থেকে হ'তে পারে। যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকে, বা যে-কোন বৃত্তির আলোকে তাঁদের কাব্যের স্তরবিন্যাস হ'তে পারে। মাঝার কবি-মানসের অন্তর্গত সত্যের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ না করে, শুধু শুধু কালের ধারার অনুসরণ করেও তাঁর কবি-কর্মের বিভিন্ন স্রষ্টার আলোচনা হ'তে পারে। তবে এতে বাইরের কারণের প্রভাবই ন্যূনতম হবে। কবির মর্মবুনে যে-সব ভাব ছিল ত্রিরাশীল তার সন্ধান তো নয়ই, এমনকি তাদের বুঝবার সংকেতও পাওয়া যাবে না।

নজরুলের কবি জীবনের সর্বপ্রথম স্তরবিন্যাস করেছেন কাজী আব্দুল ওলুদ। তিনি তাঁর কবি জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম স্তরে তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকে বিদ্রোহী প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় স্তরকে বিদ্রোহী প্রকাশের পর থেকে রাজ-নৈতিক জীবনের অবসান পর্যন্ত বলে নির্দেশিত করেছেন। তৃতীয় স্তরকে তিনি তাঁর সক্রীত রচনার বিশেষ করে গজল গানের রচনার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। চতুর্থ স্তরকে তিনি বলেছেন তাঁর যোগী জীবনের পর্ব। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে এ বিন্যাসের মধ্যে একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। কারণ কোন স্তরেই তিনি একটি বিশেষভাবে বিস্তারিত হ'য়ে সে-ভাবের বাণী প্রকাশ করেন নি। প্রতি স্তরেই বিভিন্ন জাতীয় ভাব-ধারা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। তবে একথা অবশ্য সত্য কোন কোন স্তরের মধ্যে হয়ত কোন কোন ভাব প্রাধান্য পেয়েছে বলে এ বিন্যাস নিছক কাল্পনিক কোন কিছুও নয়। এজন্যই এতে নজরুলের কবি-মানসের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এতে কবি-মানসের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। এজন্যই কালের ধারাতে তাঁর স্রষ্টা যে-ভাবেই প্রকাশিত হউক না কেন, তার আদি উৎসের আলোকে তাঁর স্রষ্টা কাব্যের পুনবিন্যাসের প্রয়োজন।

১৯২০ সালে নজরুল ইসলামের উদ্বান কাল থেকে তার স্তম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত, তিনি যে রচনাসম্ভারে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তার আলোচনাপ্রসঙ্গে স্পষ্ট প্রতিজ্ঞাত হয়, তিনি আমাদের বিন্যাসমত মানব-মানসের বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করে রচনার প্রবৃত্তি হননি। এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিতে হয়ত কোন অতিশয় ভুল ভাবের প্রকাশ অতিশয় গুরুতর ভাবের প্রকাশের পূর্বে দেখা

দিয়েছে। তবে এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, তিনি অপর সকল ক্লাসিক শ্রুতির মত জীবনের সামান্যিকের উপর আলোকপাত করেছেন এবং তাতে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাদের সমাধানের ইচ্ছিতও করেছেন। এজন্যই বিশৃঙ্খলিত জীবনের স্থান লাভের যোগ্যতা হয়েছে পূর্বই বলা হয়েছে। আত্মসংরক্ষণের উপবৃত্তি হিসাবে বুদ্ধস্পৃহা, শক্তিশালিত্বের আকাঙ্ক্ষা, অহম-বোধ, প্রকৃতিপ্রীতি, সামুদ্রী হওয়ার বাসনা অত্যন্ত প্রবল। নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র মধ্যে কেবল এগুলোর অস্তিত্ব বা স্বত্ত্বিনাভ প্রকাশ পায়েনি আরও সামান্য কিছু স্বত্ত্বির সম্ভাব্য লাভের উপাধান রয়েছে :

আমি দুর্বল,
আমি ভেঙে করি সব চুম্বন;
আমি অনিরম উচ্ছ্বল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল।

[বিদ্রোহী]

মানব-মানসের বুদ্ধ-স্পৃহা এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শক্তিশালিত্বের জন্য তার প্রয়াস ও সকলভাৱ উদাহরণ রয়েছে তার নিম্নোক্ত উক্তিতে :

অগলীশুর ঈশ্বর-আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাখিয়া তাখিয়া রখিয়া কিরি
এ স্বর্গ পাতাল বর্তা।

[বিদ্রোহী]

'বিদ্রোহী'র অনেকগুলো পংক্তিতে অহমিকা বোধের প্রকাশ বিদ্যুত্তের আলোর মত ঝলম্বলো :

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা
কতু ধরণীয়ে কখি বরণীয়া, কতু বিপুল স্বঃস-ধন্যা---
আমি তিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা।

[বিদ্রোহী]

প্রকৃতি-প্রীতির চংকার নিম্নলিখিত নিম্নোক্ত উক্তিতে :

আমি কাশফনে কে শাস ফেলে যায়
নর। নদীর কূলে
ও তার হনসে অঁচল চলতে অজায়
অক্লহরের কূলে।

ঐ বাবলা কূলে নাক-ছাবি তার,
গায় পাড়ী নীল অপূর্ণাঙ্গিতার
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।

মানব-মানসে সাশ্রয়ী হওয়ার যে আদির প্রবৃত্তি রয়েছে তার চমৎকার প্রকাশ, নজরুলের চেতনার।
তিনি ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

তোমার দত্ত হস্তের বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী ?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী ?
কৃষা তুষা আছে, আছে যোর প্রাণ,
আবিও মানুষ, আবিও মহান।
আমার অধীন এ যোর রসনা, এই খাড়া গর্দান !
মনের শিকল 'ছিড়েছি পড়েছে হাতের শিকলে চান—
এতদিনে ভগবান !

[করিয়াত]

আত্মসংরক্ষণের উপবৃত্তি হচ্ছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সে আত্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন-বাসনা একটি অত্যন্ত
জোরালো বৃত্তি। যৌন-বাসনার পরিণতি সন্তানলাভ। সে সন্তানের মাধ্যমেই মানুষ অমরত্ব লাভ করতে
চায়। এ যৌনবাসনার প্রকাশ কবির ভাষায় অনুপম রূপ পরিগ্রহ করেছে :

সরি পাতিস্নে শিকাতলে পশুপাতা,
সরি দিস্নে গোলাব-ছিতে বাসনে মাথা !
যাব অন্তরে ক্রন্দন
করে চুপি বহন
তারে হরি চন্দন
কম্বলী মালা --
সরি দিসনে লো দিসনে লো, বড় সে ঘালা !

[কালভনী]

আত্মপ্রতিষ্ঠার উপ-প্রবৃত্তির মধ্যে যুগচাৰী প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রকটমান। এ প্রবৃত্তিই মানুষকে অনেক
সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য উৎসুক করে। এ প্রবৃত্তিই রয়েছে মানবতাবাদের মূলে
কার্যকরী। নজরুলের ভাষায় এ প্রবৃত্তিই দান মানবতাবাদের প্রকাশ অনন্য—

গাহি সারোব গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রীষ্টান।

[সারাবাদী]

তেরি পদাৰ্পণরত সৰছে তাঁর অভিমতে রয়েছে সম্পূর্ণ অভিনবত্ব :

সিদ্ধি ঘাটের সারা দেহ-মন মানীর বনভারসে
এই ধরণীর তরণীর ঢাল হবে তাহাদেরই বেশে।
তারি পদরত্ন অঙ্কনি কবি' বাণায় নইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি খাব পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।

[কুলি-বজ্র]

অপত্তা বা রক্ত স্রোতের স্রষ্টা নির্ধারণ রয়েছে তাঁর কাব্য-চেতনায়। রক্ত-স্রোত থেকেই স্বদেশ ঘেঁষে
ফটি। স্বদেশ প্রেম থেকেই স্বাধীনিকতা এবং অপর আশ্রিত কর্তৃক শাসন ও দোষণ থেকে মুক্তি
লাভের উদ্যম বাসনা দেখা দেয়। নজরুল-কাব্যে এই চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট :

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল বেলা ক্রাইবের শব্দর।

বাঙালীদের জাতীয়তাবাদের সূচনায় তিনি কী বসিষ্ট করেই বাঙালীর খুনের উল্লেখ করেছেন।
প্রকৃতির বা মানব-মানসের রহস্যভেদের বাসনা মানুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা অপর লাভের জন্য
উৎসুক এক সহজাত প্রবৃত্তি। নজরুলের অসংখ্য কবিতায় তাঁর প্রকাশ রয়েছে :

ভয়ভো ভোয়ার পানো দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুকে যনের সবুজ দেখা ॥

ঐ স্তম্ভের গাঁয়ের মাঠে,
আলের পথে বিজন ঘাটে;
ভয়ভো এসে বুচকি ফেলে
ধ'রবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ নীলের ঐ পহন-পায়ে ঘোঁটা-দ্বারা ভোয়ার জড়য়া,
অন্যে খবর গোপন-শ্রুতি দিক্-পারের ঐ লবিন হাওয়া ॥

[আশা]

পরলোক সৰছে তথা সংগ্রহের আগ্রহ মানব-জীবনের অপর এক সাধারণ অন্তর্গত প্রবৃত্তি। নজরুলের জীবনে
তাও ছিল ক্রিয়ামূল। তাঁর কাব্য-জীবনে এ প্রবৃত্তির রূপও একাধিকবার দেখা দিয়েছে :

জানি না'ক আত্ম তুমি কোন নোকে বহি'
তুলি আমার গান, তে কনি নিবটী।
কোথা কোন জিজ্ঞাসার অসীম সাঁচারা,
প্রতীকার চির-রাশি চক্রে, সূর্য্য, তারা,
পাখায়ে চলেছে একা অসীম বিরহে ?

[গোকুলনাথ]

সহজাত প্রবৃত্তির ভর পায় হয়ে মানুষ শৌছে বুদ্ধি, প্রকোভ ও ইচ্ছাশক্তির ভরে। বুদ্ধির ভরেই দেখা দেয় ঐতিহ্য চেতনা বা পূর্ব পুরুষদের ব্যক্তিসত্তা বা কীর্তিকলাপের প্রতি শ্রদ্ধা। ঐতিহ্য চেতনা নানাজায়ে দেখা দিতে পারে। বর্ষ-সংক্রান্ত ঐতিহ্য-চেতনা দেখা দেয় কোন বিশিষ্ট বর্ষের মহাবানবদের প্রতি শ্রদ্ধায়। বর্ষ-নিরপেক্ষ ঐতিহ্য চেতনা স্বদেশের বীর পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধায় ব্যক্ত হয়, অথবা স্বদেশের সৌরব কোন কীর্তমান পুরুষ বা নারীর প্রতি ভক্তিতে অা আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশের কীর্তি সহজে আত্মশ্রাব্য সে ঐতিহ্য চেতনারই এক প্রকাশ।

নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব বেড়াবেই হঠক না কেন, 'শান্ত-ইল-আরব' কবিতার সর্বপ্রথমে তিনি বাঙালী পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর পর 'খেরাপারের তরবী', 'কোরবানী', 'মোহররর' প্রভৃতিতে তার বীর্য ঐতিহ্য-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রাসঙ্গিক হিসাবে এখানে উল্লেখ করা যায় :

'জুলফিকার', আর 'হারদরী' হাঁক হেথা আজও হজরতু আলীর—
শাভিল আরব। শাভিল আরব॥ জিন্দা রেখেছে তোবার তীর।

[শান্ত-ইল-আরব]

আবুবকর, উসমান উমর আলী হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরবার, নাই ওরে নাই ভর।
কাঙারী এ তরীর পাকা মাঝি দালা,
দাঁড়ি বুখে গারি গান—লা-শরিক আল্লাহ্।

[খেরাপারের তরবী]

নজরুল ইসলামকে প্রায়ই অপবাদ দেওয়া হয় তাঁর কাব্যে বা জীবনে কোন দর্শন বলে ওঠেনি বলে। সে অপবাদের জীবন্ত প্রতিবাদ হিসাবে নজরুল-মানসের বিশুদ্ধদর্শনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

আবার আপনার চেয়ে আপন বে জন
বুঁজি ভারে আমি আপনার
আমি ওনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আবারি ডিরাঙ্গী বাসনার।

আবারই হচিত্ত কাননে বলিয়া
পরানু পিরারে বালিকা হচিত্তা,
সে দালা সহসা দেখিনু জালিয়া
আপনারই পলে গোলে হার।

[আপন পিরালী : হুয়ানট]

ঐক্যবাদের সঙ্গে পরবাসীর একত্ব বন্ধন সম্বন্ধের বর্ণনা বিশু সাহিত্যে বিবল।

এ পরবাসীর স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলছেন :

আমি জাই আপা বাউল, আমার দেউল
আবারি এ আপন পেহ—
আবার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুখর
অন্তরে মন্দির পেহ।

[মন-নীতি]

এ বেহেরই মতো যে সে প্রাণের ঠাকুর নিত্য তার মীলার মত রয়েছেন,—এ সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ :

এ বেহেরই রঙ মহলায়
বেলিছে মীলাবিহারী
মিখা মায় মর এ কারা
কাটার হেরি ছায়া জারি।

[ওল্‌বাগিচা]

সে পরবাসীর রূপ ক্রমে কবির নিকট স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে—

যদি কুল হয়ে কুটি তরু পাখে
সে যে পল্লব হয়ে বিরে রাখে
যদি একাকিনী চলি বনভলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।

সে সত্তার পরব পরিচয় কবি পেয়েছেন। জাই নিঃসন্দেহে বলছেন :

দেবিরাছ সেই রূপের কুহাবে, গড়িছে যে এইরূপ ?
রূপে রূপে হয় রূপারিত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ।
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কারা
সুকাতে আপন বাবুরী যে জন কেবলি রচিছে^{*} মারা।

[অভেদন : নতুন চাঁদ]

বুড়ি ব্যতীত প্রকৃত ও ইচ্ছাশক্তিও আবারের জীবনে নানাতাবে দেখা দেয়। প্রকৃত প্রকাশ পায় আশক্তি, জ্ঞান, ভর প্রভৃতির মাধ্যমে। নজরুল তাঁর জ্ঞান প্রকাশ করেছেন—ইংরেজদের ভা'পোয়া গ্রীক ঘের বিক্রেতে। প্রথম মহাসমরের পেনে তুঁকি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে প্রতিবেশী গ্রীকগণ স্ফূর্ত

প্রভৃতি স্থানে তুর্কিদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করতে বাধ্য করে। এই দারুণ অন্যায় দেখে উদ্বেজিত হয়ে নজরুল ইসলাম তুর্কি বীর আনোয়ার পাশাকে সম্বোধন করে বলেছেন :

আনোয়ার ! আনোয়ার !
 দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হামো, আর
 নেস্ত-ও-দাবুদ কর, কারো বড় আনোয়ার !
 [আনোয়ার]

ইচ্ছাশক্তির দূর্বাস্ত প্রকাশ রয়েছে নজরুল ইসলামের অল্প বিস্তর সব কবিতাতেই :

ওরে আয়।
 ঐ মহাসিদ্ধুর পায় হাতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
 ওরে, আয়।
 ঐ ইসলাম ডুবে যায়।
 যত শয়তান
 যারা মগধান
 জুড়ি' খুন তার পিরে হাজার দিয়ে ভয়-গান শোন গায়।
 [রণ-ভেরী]

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানবজীবনের তথা মানবমানসের এমন কোন দিক নেই যাতে নজরুল ইসলামের দৃষ্টি পতিত হয়নি, বা তাঁর সম্ভাব্য বিধানের জন্য নজরুল ইসলাম কোন আনোকপাত করেননি। এ কথা অবশ্য সত্য যে বান্দীকি, ব্যাস বা হোমারের মত একটা বিরাট যুগের মধ্যে অবসিত মানব মানবীর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে তাঁদের জীবনে কার্যকরী কোন ঐতিহ্য-চেতনা তিনি প্রকাশ করেননি। তবে তাঁর বিশ্বাসহীন সৃষ্টি জীবনের নানা পর্যায়ে মানব-মানসের নানাবিধ বঞ্চিত অংশ নিয়ে তিনি রীতিমত ভেবেছেন এবং সে চিন্তনের ফলে অনেক বড়ো প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর কবিতার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন।

এগুলো কালের ধার অনুসারে বিন্যাস করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে তিনি সত্যিই একজন মহাকাবি; এবং বিশু-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাওয়ার যোগ্য। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্বকাল নির্বাক ও শুষ্ক জীবন যাপন করে তাঁর অতি আদরের মানির মায়ের কোলে আবার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর কাব্য পার্শ্বোদগী ব্যতীত নব-জীবনের উদ্দীপনার সেতে উঠেছে। তবে তাঁর কাব্যকে অনুবাদের মাধ্যমে বিশু-সাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার আশ্রয় পর্যন্ত কোন চেষ্টা হয়নি। এটা আমাদের পক্ষে একটা মহাকলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মজলুম-সাহিত্য-সমালোচনার ধারা

রফিকুল ইসলাম

মজলুম সাহিত্যালোচনার সূত্রপাত 'মোসলেব ভারত' পত্রিকার ১৩২৭ সালের তৃত্ত সংখ্যায় প্রকাশিত মোহিতাল মজলুমের পত্রটি থেকে। উক্ত পত্রিকার আশ্রয় সংখ্যায় প্রকাশিত মজলুমের 'বামন প্রান্তের পরাব' এবং শ্রাবণ সংখ্যায় 'খেয়াপায়ের তরবী' কবিতা দুটি মোহিতালমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তৃত্ত সংখ্যায় পত্রাঞ্জে মোহিতালমের দীর্ঘ আলোচনাটি প্রকাশিত হয়। মোহিতালম পত্রিকা-সম্পাদককে লিখেছেন:

আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া অত্যন্ত ও বিগায়ে উৎকর্ষ হইয়াছি... কিন্তু তাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশ্চর্যিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক ছাটিলদার কাজী মজলুম ইসলাম সাহেবের কবিতা।... আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙালির সারস্বত রূপে স্বাগত সন্মান জানাইতেছি... ..

মোহিতালমের এই আলোচনাকে আনন্দ সাহিত্যে মজলুম সমালোচনার সূচনা বলতে পারি। এই সময় থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত মজলুম জীবন ও সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে তিনটি পর্ব ভাগ করা যায়।

মজলুম সমালোচনার প্রথম পর্ব ১৩২৭ থেকে ১৩৪০ সাল (১৯২০-৩৩ খ্রি:), দ্বিতীয় পর্ব ১৩৪১ থেকে ১৩৫৪ সাল (১৯৩৪-১৯৪৭ খ্রি:) বেশ বিভাগের সময় অর্থাৎ। তৃতীয় পর্ব ১৩৫৫ থেকে ১৩৭৭ সাল (১৯৪৮-৭০ খ্রি:) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত। মজলুম-চর্চায় প্রথম (১৩২৭-৪০ সাল) বা সূচনা পর্বের বৈশিষ্ট্য মজলুম-সাহিত্যের যথার্থ সমালোচনার অভাব, এ যুগ অপ্রিয়োক্তির যুগ, প্রবাস বা নিষ্পার প্রাচুর্যে এ পর্ব ভারাক্রান্ত। এ সময়ে মজলুমের অনুপ্রিয়তা (সাহিত্যিক ও রাজ-নৈতিক উভয় কারণেই) এবং মজলুম-রচনার অসম্পূর্ণ কাঁচিতি (কোন কোন রচনা বাজেরাষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) কেবল মাত্র ক্রিয়াক্ষমতাই পরিণত হয়নি সে-কালের বহু কবী ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকথারও উপাধান হয়েছে। আর মজলুম-নিষেধ ও-বিকল্পতার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে 'শনিবারের চিঠি', 'ইসলাম বর্নন', 'মোসলেব বর্নন' প্রভৃতি প্রায় পত্রিকার। বঙ্গবন্ধু হিমু, মুসলমান এবং শ্রাবণ এই তিন সমগ্রদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন মজলুম। তবে স্ব-সমাজের গোঁড়া ও বর্ষাক্ষেপের আক্রমণের তীব্রতা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে আবুল কালাম শাহমুহীন দায়িক 'সংগীত' পত্রিকার

দ্বিতীয়-বর্ষ। | ১৩৮৪

মজলুম একাডেমী পত্রিকা | ১০৫

১৩৩৩ সালের পৌষ সংখ্যার 'কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান' প্রবন্ধে ফোঁড়ের সঙ্গে লিপিতে লেখা হয়েছিল,

...এই বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত জগতের কোথাও বোধ হয় কাব্যকে বর্ন, সবাছ, সভ্যতা ইত্যাদি বাপকাঠিতে যাচাই করিবার উদ্ভট প্রয়াস হয় নাই।

...নজরুল ইসলামের কাব্য সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অনৈসর্গিকতার ধৃয়া উঠিয়াছে, ইহাকে আমরা প্রবুধ কাব্য-উপভোগের ফল বলিয়া মনে করি না বরং কাব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণার অভাবের নিদর্শন বলিয়া বলিয়া লইতে বাধ্য হই।...

...নজরুল ইসলাম বাঙ্গালার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙ্গালী জাতি। সুতরাং এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় প্রকাশ উভীর ছাপই পিতে হইবে, নতুবা রচনা সহজ ও সুলভ হইবে না।

নজরুল-চর্চার প্রথম পর্বে নজরুল-'সাহিত্য'-বিচার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বাজ, বিত্বপ, কুৎসা ও নিশার নামাত্তর, এ পর্বে 'কল্লোল' ও 'সংগীত' পত্রিকা নজরুল-সম্বন্ধে সক্রিয় ছিল। কলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

নজরুল-সাহিত্যের বর্ধাধ আলোচনা শুরু হয় নজরুল-চর্চার দ্বিতীয় পর্বে (১৩৪১-৫৪ সাল)। মাসিক 'সোহাগদী' পত্রিকার ১৩৪১-৪২ সালে চার সংখ্যায় মুজিবুর রহমান খান চারটি প্রবন্ধে নজরুল-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করেন, এই সময় থেকে সাহিত্য সমালোচকেরা গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে নজরুল-সাহিত্যের মূল্যায়নে প্রতী হন। কাজী আবদুল ওসুদের প্রবন্ধাবলী-'নজরুল ইসলাম', 'প্রতীক প্রীতি', 'কাহানে করি না কুণিন' এবং হুমায়ূন কবীরের 'বাঙলার কাব্য' (১৩৪৫), বুদ্ধদেব বসুর 'An Acre of Green grass' (১৩৪৫) প্রকাশিত হয় এই পর্বে। হুমায়ূন কবীর এবং বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থে নজরুল-সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৫১ সালে আধুনিক বাংলা কবিতার মুখপত্র 'কবিতা'র বিশেষ 'নজরুল-সংখ্যা' প্রকাশ ও একটি উদ্দেশ্যবোগা ঘটনা। আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত 'কাব্য বালক' (১৩৫২) সংকলনের ভূমিকাতেও নজরুল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা ছিল। নজরুলের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনী 'নজরুল জীবনী' রচনা করেন কবি আবদুল কাদির, যা 'সংগীত' পত্রিকার ১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কাজী আবদুল ওসুদের পূর্বোক্তিত ডিনটি প্রবন্ধ এবং আবদুল কাদিরের 'নজরুল-জীবনী' 'নজরুল প্রতিভা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। আবদুল কাদের 'বিরোধী কবি নজরুল' (১৩৫৪) দেশ বিভাগ পূর্ব যুগে পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত নজরুল-সাহিত্য আলোচনার একমাত্র প্রয়াস।

নজরুল-চর্চার তৃতীয় পর্ব দেশ বিভাগের সময় থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশ বিভাগের পরে বাংলা সাহিত্য চর্চা কলকাতা ও ঢাকা উভয় স্থানকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়, স্বাভাবিকভাবেই এই পর্বের নজরুল বিচারে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে দৃষ্টান্তীয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

নবকল-চর্চায় আলোচ্য পর্বে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুই শ্রেণীর আলোচনার প্রাধান্য দেখা যায়, নবকল-সৃষ্টিকথন এবং নবকল-সাহিত্যের বুনায়ন। এই পর্বে পূর্ব বাঙালির নবকল-চর্চায় চাষী বিষয়ের উচ্চ আয়োগিত হয়েছে, প্রথমতঃ বাঙালির বুনলমানের নব জাগরণে নবকলনের অবদান, দ্বিতীয়তঃ উপবহাদেশের আত্মাঙ্গী আন্দোলনে নবকলনের ভূমিকা, তৃতীয়তঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ইঙ্গলান্ডী ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করার নবকলনের সার্থকতা চতুর্থতঃ আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বারায় নবকলনের বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ।

মুহম্মদ বকর সাহিত্য-চর্চা (১৯৬১), হাবিবুন কবীরের 'বাঙালি কাব্য' (১৯৬৯), আব্বাসউদ্দিন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (১৯৬১), রবীন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্য বিচিত্রা' (১৯৬১), জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' (১৯৬২), নারায়ণ চৌধুরীর 'সঙ্গীত পরিক্রমা' (১৯৬২), বাবোপুর সিরের 'বাংলার গীতিকার' (১৯৬৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' (১৯৬৩), শুভস্বর বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতি' (১৯৬৪), সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন 'কবি নজরুল' (১৯৬৪), দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৬৫), সুকুমার গেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ বর্ষ ১৯৬৫), সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত নজরুলের 'রুহাইয়াত-ই-উর-র-খৈয়র'-এর ভূমিকা (১৯৬৬), অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রানুগামী কবি সমাজ' (১৯৬৬), কেদার ভট্টের 'কুমদরহনের কাব্য বিচার' (১৯৬৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসুদেবের 'পত্নীকীর কবি' (প্রকাশ তারিখ নেই), সুনীলকুমার ভট্টের 'নজরুল চরিত্র বানন' (১৯৬৭), রবীন্দ্রনাথ রায়ের 'বিবেকানন্দ কবি ও নাট্যকার' (১৯৬৭)।

আলোচ্য পর্বে পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল-চর্চা। প্রধানতঃ পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধ, তবে কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল-স্মৃতিচারণ হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহে: জগীষ উদ্দীন-এর 'বাঁদের দেখেছি' (১৯৫৯), খান মুহম্মদ বইনুদ্দীনের 'সুগ-সুটো নজরুল' (১৯৬৪) বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'নজরুলকে বধন দেখেছি' (১৯৬৬), আব্বাসউদ্দিন আহমদের 'আমার নিলী জীবনের কথা' (১৯৬৮), স্বকী জুলফিকার হারদাবের 'নজরুল জীবনের শেষ অব্যায়', (১৯৭১) এবং সৈয়দ আলী আশরাফের 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অব্যায়' (১৯৬৭)। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত নজরুল সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ (পূর্বাঞ্চ বা অংশঃ), কাজী আবুল হুসেইন 'নজরুল প্রতিভা' (১৯৫৫) শিবপ্রসন্ন সাহিত্যীর 'নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৬০), সৈয়দ আলী আহমদের 'নজরুল ইসলাম' (১৯৬১), মুহম্মদ এনাবুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪), মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহমদের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫), কাজী মোতাহার হোসেনের 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' মোতাহার হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা', (১৯৬৫), পাকিস্তান পাবলিকেশন প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন 'নজরুল পরিচিতি' (১৯৬৬), আহমদ রফিক 'শিল্প ও সংস্কৃতি জীবন' (১৯৬৬), বীর আবুল হোসেন সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন 'নজরুল সাহিত্য' (১৯৬৭) কাজী আব্বাসউদ্দিন আহমদের 'সাহিত্যের পরিধি' (১৯৬৭), ডঃ বহাউল ইসলামের 'সাহিত্যের পথে' (১৯৬৭) আবুল কজলের 'শিল্প ও সাহিত্য সাধনা' (১৯৬৮), আব্দুল কাদের সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' (১৯৬৮), মোহাম্মদ মাহকুমুরাহ 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৭০), হাসান হাকিমুর রহমানের 'আধুনিক কবি ও কবিতা' (১৯৭২), আতাউর রহমানের 'কবি নজরুল' (১৯৭৫), মোবাসের আলীর 'নজরুল প্রতিভা' (১৯৭৬) এবং শাহাবুদ্দীন আহমদের 'শব্দ-বানুদী নজরুল ইসলাম' (১৯৭৭)। আলোচ্য পর্বে নজরুল সম্পর্কে প্রকাশিত দুটি ইংরেজী গ্রন্থ মিলানুর রহমানের Nazrul Islam (১৯৬০ খ্রী:) এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'Introducing Nazrul Islam' (১৯৬৫)। নজরুল ইসলামের রচনাপটী সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থ এ পর্বে প্রকাশিত হয়, রফিকুল ইসলামের, 'নজরুল নির্দেশিকা', (১৯৭৬) এবং সাজিদা সুলতানার, 'নজরুল অনুশ্রুতি' (১৯৭৬)।

১৯২০ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ, এই পঞ্চাশ বৎসরে নজরুল জীবনী ও সাহিত্য-চর্চায় যে সংক্ষিপ্ত ক্ষণেরও নির্দেশ হল তার সূচনা পর্বে (১৯২০—৩০ খ্রী:) নজরুলের সাহিত্য অতি প্রাচীন বা নিম্নিত হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বে (১৯৩৪—৪৭ খ্রী:) নজরুলের জীবনী রচনা ও সাহিত্য সমালোচনার গঠনমূলক

প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এ পর্বে জীবনী রচনার আকবুল কামির এবং বাংলা সাহিত্যে নজরুলের স্থান নির্দেশে কাজী আকবুল ওসুল, জবাবুন কবীর, বুচ্চসেব বসুর আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য বর্ডমান, পরবর্তী কালের গবেষণা ও আলোচনার বৈশিষ্ট্য সূত্রসমূহ এই সব আলোচনার মধ্যেই নিহিত ছিল। নজরুল আলোচনার তৃতীয় বা শেষ বিভাগোত্তর পর্বে (১৯৪৭-৭০ খ্রীঃ) একদিকে যেমন স্মৃতিকথার ভীড় অপর দিকে তেমনি নজরুল ইসলামকে সামগ্রিক বা ঐতিহ্যভাবে মূল্যায়নের প্রয়াস পরিলক্ষিত। এ পর্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান করেছে বুজুফর আহমদের নজরুল-স্মৃতিকথার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ। বলা বাহুল্য বুজুফর আহমদের নজরুল-স্মৃতিকথা ছাড়া সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ নজরুলজীবনী রচনা, নজরুল-সাহিত্যের বর্ষা সমালোচনা কিংবা নজরুলের প্রকৃত মূল্যায়ন উক্তস্মৃতীপত্রের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। আলোচ্য নজরুল ইসলামের কবিতার রস বা শিল্প বিচারের কিছু আন্তরিক প্রয়াস হয়েছে কিন্তু সৈয়দ আলী আহসানের ‘নজরুল ইসলাম’ গ্রন্থ ছাড়া আর কোম গ্রন্থে নজরুলের কবিতার সাহায্য করা পড়েছে বনে বনে হয় না। মূল্যায়ন বিভিন্ন গ্রন্থে নজরুলকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা হয়েছে কিন্তু নজরুলের স্রষ্টিকে সবকালীন দেশ, কাল, পৃথিবী ও বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের ধারায় স্থাপন করে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। নজরুলের মৃত্যুর পরে নজরুল জীবন ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক মূল্যায়নের সবর উপস্থিত হয়েছে।

স্বত্বিকথা

নজরুলের 'জুলফিকার' ও 'বনগোষ্ঠি'

মাহবুবুর রহমান খান

বাঙলা ১৩৩৯ সনের প্রথম দিনকার কথা। তখন বাঙলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের এক মাত্র বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্র 'দৈনিক জুলফিকার' বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা তিন জন একই পথের সহযাত্রী, মরহুম কবি আশরাফ আলী খান, মরহুম মোহাম্মদ কামের ও আমি, কলিকাতার ৩৬নং আপার সার্কুলার রোডের তৎকালীন স্কিমিয়া হোটেলের উপর তলায়, একই ঘরের বাসিন্দা ও রেকার। আমাদের পাশের ঘরে থাকিতেন তৎকালীন সাপ্তাহিক 'হানাকী' পত্রের সম্পাদক মরহুম চৌধুরী শামসুর রহমান।

সেই সময় আমাদের পরিচিত কতক সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি আমাদের দ্বারা—অবশ্য আমাদের অন্তর্ভাবী—, জাহাদের ছোট বাট সাময়িক সমস্যার সমাধান করাইয়া নিতেন। কেহ ~~জাহাদের~~ সভাসমিতির মানপত্র লিখাইয়া নিতেন, কেহ জাহাদের বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করাইয়া নিতেন, কেহ কোন বইয়ের পুস্তক সংশোধন করাইয়া নিতেন; আবার কেহ বা কবি আশরাফ আলীকে দিয়া কবিতা লিখাইয়া, জাহার ঘরের মাঝে মাসিক পত্রিকার ছাপিতেন—, ঘরের বিবাহের সুবিধার জন্য।

আমরাও কিছু বনে করিতাম না। বিনা কাজের হটগোলে সবর যদি কাটিয়া যায়, কতি কি? এই কাজের পারিশ্রমিকের জন্য আমাদের ডরক হইতে কোন চাহিদা ছিল না। কোন দিন অবাচিত ভাবে বড় জোর চা আর কিছু নাশত। আর্থিক অনুবিধার থাকিয়াও টাকা পরসার ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বত্ব বিপন্ন করিয়া কিছু করি নাই আমরা।

এই সবর আমার পরিচিত এক বন্ধু—মাহবুব-উল-আলম,—জুলফিকার অফিসেই জাহার সহিত প্রথম পরিচয়—, এক দিন আমাদের আন্তরিক আশিরা, পরের দিন আমাকে জাহাদের বেনীরাপুকুর অঞ্চলের গোলাব ছোবহান দেখাইয়া বাড়ীতে পুপুর বেলায় খাবার দাওয়াত করিলেন। বন্ধু সময়ে তিনিই আমাকে দিয়া যাইবেন, জাহাও বলিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঙ্গালীদের পক্ষ, বন্ধুর একান্ত আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

ব্রিটিশ আমলের অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক ইনস্পেক্টর অব রেভিনিউ-এম, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহবুব। চটগ্রামে জাহাদের বাড়ী। তখনকার সবর আমাদের বড় বেবেয়ালা মাহবুব।

জন্মের মূর্ত বন্ধু সময়ে মাহবুবের সাথে জাহাদের বাসার হাজির হইলাম। মাহবুব পরিচয় করাইয়া দিল, জাহার সহপাঠী বন্ধু বদরুজ্জোজা সাহেবের সহিত। তখন আমরা তিন জনই মরহুম, নওজোজা ও অকুতসার। বদরুজ্জোজা সাহেব মরহুম বাঙ্গালার আহছানউল্লা এ-ডি-পি-আই,

সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। বের্ব কলিনাভুনেগার স্বামী, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী জজ
শমসুজ্জোহা খান বাহাদুর সাহেবের প্রথম পুত্র। পার্শ্ব সার্কানে জাহানের বাড়ী। পরে অবশ্য
আমেকদারই আমাকে সেই বাড়ীতে বাতায়ন করিতে হইয়াছে বিশেষ বিশেষ কারণে।

সেদিন ছিল রবিবার। বাবার টেবিলে নানা প্রকার আলপ আলোচনার পর, আমার সঙ্গে বাহাদুর
আমাকে বলিল,—“কলকাতা আমার বুঝে কিছু থাকি ও সহপাঠি। আমাদেরই বড় কলেজের
পড়া ছাড়িয়া, ১৫নং কলেজ ভোয়াবে, আলখাট হলের নীচের তলায়, “এম্পায়ার বুক হাউস” নামে
একটি খইরের স্টোকাই খুলিয়াছে। জাহার একান্ত ইচ্ছা, খাতনামা উক্ত মুসলমান সাহিত্যিক ও
কবিদের কিছু কিছু কবী সর্বাঙ্গীন স্থল ও উন্নত রুচি সহকারে প্রকাশ করা। এই বিরুদ্ধের
পরিকল্পনাতে আছেই। তুমি ওকে কিছু সাহায্য কর।”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“তুমি আমার সম্বন্ধে জান, জাহার বন্ধুকে সাহায্য করার বড় আমার কি
যোগ্যতা আছে, খই ছাপান বিষয়ে। দৈনিক ছোলভানের শেষ পর্বায়ে আমরা তিনজন উক্ত পত্রিকার
সম্পাদনা বিভাগ পরিচালনা করিয়াছি মাত্র, এখন উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য কোথাও চাকরীর
অন্যা উদ্দেশ্য হই নাই। পাবলিকেশন ব্যাপারে আমার কি অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে? আর কল-
বিরুদ্ধের জ্ঞানও আমার নাই। আমার পুঁজি কতটুকু—জাহা তুমি জান।”

এমন সময় কলকাতা সাহেব বলিলেন,—“আমি বাহাদুরের দিকট আপনায় বিষয় সব শুনিয়াছি।
আপনায় নিজস্ব পুঁজি কতটুকু আছে, জাহাই আমার যথেষ্ট। আমিও পুঁজিপতি নই।” এই বলিয়া
হাসিতে লাগিলেন।

বাহাদুর বলিয়া উঠিল,—“এখন আর কি? আপাতকাল হইতেই যোগ দাও। আমি জাহাকে জেতার
কিনা হইতে সজে করিয়া কলেজ ভোয়াবে দিয়া যাইব। আর কোন আপত্তি করিও না। প্রকাশনা
ব্যাপারে কি করিতে পার আর না পার, পরে দেখা যাইবে। আমি চাই তুমি ওর সাথে থাক।”

দ্বীতির বীষন বোঝানে, সেখানে আর কথা চলে না। জাহার আমাকে কি কি করিতে হইবে জাহার
কোন ফিরিতি নাই। উদ্ভিদের প্রভাবে সন্ততি জাপন চাড়া আর কোম উপায় রহিল না।

ইহার পর বাহাদুর বলিল,—“আমাদের নীচের তলায় জাহার অন্য বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু আছে।
নীচে থাকেন পারস্য সম্রাট কর্তৃক নির্বাসিত পারস্য দেশের অমাত্য প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক
মেজা আগা হইদুল ইসলাম। কর্তবানে তিনি বদ্ধ। জাহার সম্পাদনার ও কর্তৃত্বে এখন হইতে
“বাকুল বক্তিস” সাপ্তাহিক পত্রিকা কারনী জাহার ছাপা হইবে। এই পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে জাকবোর্গে
পারস্যের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন রাজনৈতিক বহনে সরবরাহ হইবে। জাহার কোন পুত্র সন্তান নাই।
হুইট মুরে। বড়টির নাম শেরব হইজলা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কারনীতে
এক-এ পৌর মেজালিট। তিনি নিজস্ব পত্রিকা সম্পাদনার সর্বপ্রকারে সহায়তা করেন। প্রেস, অফিস
এবং পরিব্রাজকের বানসান একই জাহার কেন্দ্রীভূত, জাহানের নীচের তলায়।”

বাহাদুরের কথা অনুযায়ী আমরা নীচে গিয়া পেলাম, আগা সাহেবকে পেরিলাম। পারস্য দেশের
পারস্য শাসন পদ্ধতিতে বক্তব্যের অপর্যবে, রাজ-রোয়ে নির্বাসিত বংশে উক্ত জাহার আগা সাহেবকে
অবস্থা অভিবাসন জাপন করিয়া। অভিবাসন সত্তে জাহার নির্দেশ অনুযায়ী জাহারই পাশে আসন
গ্রহণ করিলাম। কিছুকণ কর্তব্য হইল পারস্যের রাজনৈতিক বিষয়ে। কী ও লীর্ষ সেই
বক্তব্যে নির্বাসিত অস্তিত্ব কবী আগা হইদুল ইসলাম। বংশ ও বংশবাহী মুসলমান

উন্নতি কামনার অপরাধে সম্রাট কর্তৃক বিদেশে নির্বাসিত হইয়াও বুদ্ধি-ভিত্তিক অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করিতেছেন, কলিকাতা হইতে নিজস্ব কাগজ 'হাবলুল বতিস'-এর মাধ্যমে পাঠসোজ জনগণের মধ্যে। Plain living and high thinking এর বাস্তব প্রতীক প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রদ্ধার মাথা নত হইয়া আসিল।

[পরবর্তীকালে, কলিকাতার আদা হইদুল ইসলাম সাহেবের মৃত্যু হয় এবং সৌহারদ পোহতানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বর্তমান ইরানের শাহান শাহের শিভা শাহ্ পাহানডী ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করার পর, আদা সাহেবের কবর, উক্ত পোহতান হইতে উঠাইয়া, সেন্সান ট্রেন বোলে ইরানে নিয়া একত্রিণ বার ভোপৎবনি সহকারে রাজোচিত সম্মানের সহিত পুনরায় সমাধি করা হয়। কেগন হইয়জাদা ল' পাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে বুদ্ধিভীষী রূপে ওকালতি করার সময় তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্ডার ম্যান পদেও নিযুক্ত হন। রংপুর জেলার অন্তর্গত গাউবাজার অধিবাসী আর্থ-সি-এস নূরুন্নাহী সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আদা সাহেবের কমিট মেয়েও ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারগী ভাষার এম-এ পোন্ত যেভালিট। তিনি বিবাহের পূর্বেই কলিকাতায় মাথা যান।]

সম্ভার বাগান ফিরিয়া কবি আশরাফ আলী খান ও কায়েম সাহেবকে সব বলিয়া। কলিকাতায় তখন সামান্য করেকাট বাতীত অন্য কোন উন্নত ক্রটির মূলনির প্রকাশনালয় ছিল না। বাজিত কলিম্পশু নিখিত এফজম মুললমাম মুলক উন্নত শ্রেণীর কই প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন ইহাই ছিল সেই রায়ে আমাদের আলোচনার নিয়মবস্ত।

পরের দিন দুপুর বেলায় সাহবু আসিয়া হাজির। তাঁহার সহিত কলেজ ছোয়ারে চলিলার মৃতম কর্ভলে। বেশ ভাল দোকান। পবিত্রকার পরিচ্ছন্ন উন্নত ক্রটির পরিচায়ক। ছব সাতজম কর্ভারী, একজন বিহারী দারোয়াদ। আদার অন্য এক ভিনু টেবিল ও চেয়ার—স্বাভিকারীর আসনের পাশে নির্ধারিত রাখাছে। কতকগুলি আলোচনার পর সাহবু চলিয়া গেল। কি কি কাজ করিতে হইবে আমাকে তাহাও ভাবিয়া পাই না। কৌতুহলী বনে দোকানে যাছা যাছা দেখিবার দেখিয়া মিলায়।

সম্ভার পর দারোয়াস বাতীত আর সব কর্ভারী চলিয়া গেলেন, বদকদোআ সাহেব নিরিবিলিতে পুস্তক বাসগায় সংক্রান্ত আলোচনার পর বলিলেন, “কবি মজরুল ইসলাম সাহেবকে পাঁচ শত টাকা দিয়া—ছিলার—“জুলুকিকার” নামে তাঁহার একখান বই প্রথম সংস্করণ দুই হাজার কপি ছাপার অন্য—প্রায় দুই তিন মাস পূর্বের কথা। মদ্যাবধি তাঁহার নিকট হইতে উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই আমার পক্ষে। কবি সাহেব বেগালী মানুষ; সব সময়ই ক্রায়োকন কোম্পানীতে গান দিয়া বাস্ত থাকেন। প্রাতঃকালে বাসা হইতে চলিয়া যান, রাতি নর দশটার কিরেন। অনেক রায়ে বেকর্ড কোম্পানীর অফিসের কাজ শেষ হয়। আমি নিজেও দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াছি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে কিন্তু পারি নাই। অন্য কর্ভারী ছাড়াও কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোন কল হয় নাই।

“সাহবুয়ের নিকট গুনিরাছি আপনার সহিত কবি মজরুল ইসলাম সাহেবের অনেকদিন পূর্ব হইতেই বন্ধিত পরিচয়। আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করুন। এখন কয়েকমাস পুস্তক প্রকাশকদের অবসর সময়। এখন এই বই বাহির করিতে না পারিলে, টেকস্ট বই বোম্বের সময় আর সময় হইয়া উঠিবে না।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য উদীয়মান সাহিত্যিকদের নুতন বই প্রকাশ করার ইচ্ছাও আমার আছে। তাঁহাদের বইও ছাপার ব্যবস্থা করুন। আমার প্রতিষ্ঠান নুতন, ইহাকে সমীচীন করিয়া তুলুন। উপযুক্ত লোক অভাবে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বর্তমানে সবেমাত্র কলকাতা করিন সাহেবের 'নারী মজলু' ছাপিয়াছি। ইহা অতি পুরাতন বই। আমি চাই প্রতিষ্ঠান নুতন লেখকের বইয়ের আদ্যপ্রকাশ। আমাদের সমাজে খুব ভাল ভাবে ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।"

আমি প্রতিউত্তরে বলিলাম,— "বই প্রকাশের ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। মজলু ইনসান সাহেবের বাসার অনেক দিন হয় বাই নাই, বিশেষ করিয়া দৈনিক ছোনডান বন্ধ হইবার পরে। তবে লোক মরকত ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁহার বোঁজখবর রাবি যাত্র। এখন তিনি হিজ হাস্টার ভয়ে ও বেসীকোন কোম্পানীতে গান রেকর্ড করার ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন আমি।"

তিনি বলিলেন, "আমার লোক দিনের বেলায় তাঁহাকে বাসায় পায় না। রেকর্ড কোম্পানীতে গেলেও তাঁহার সহিত কথা বলার সুযোগ হয় না। আমার নতুন পোকান, শীশু জাহার একখানা বই প্রকাশ করা আমার একান্ত প্রয়োজন। আপনি একটু পরিশ্রম করিয়া বইখানা শীশু বাহির করুন। এই জমাই আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

উত্তরে শুধু বলিলাম, "খোলা হাকেক, দেখা যাউক কি করা যায়।" ইহার পর আরও অনেক কথা-বার্তার পর অনুরান রাত্রি দশটার পর পোকান বন্ধ করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম।

বাসার আগিয়া সমস্ত কথা আশ্রয় সাহেব ও কাসের সাহেবকে বলিলাম। বহু বিবরণের আলোচনা হতে দ্বিধা সিদ্ধান্ত হইল যে, শীশুই "জুলুকিয়ার" বই বাছির করিতে হইবে।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই কাণ্ডী মজলু ইনসান সাহেবের শায় বাজার অফিসের সীতাদাখ দেউনের বাসায় উপস্থিত হইলাম। কবির বিশুদ্ধ পুরাতন ভূতা রামা আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাবু, এত দিন পরে দেখা দিলেন।" তাঁহাকে বাহা বলার বলিঞা, কবি সাহেবকে আমার সান্নাধ্য দিবার জম্মা নির্দেশ দিলে, রামা আমাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। এই বসার ঘর আমার অপরিচিত নয়।

প্রায় ত্রিশ মিনিট পরে কবি সাহেব নীচে নামিয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— "আরে, বাহকু এত দিন পরে। কত দিন জোয়ার কথা মনে করেছি কিন্তু জোয়ার সাক্ষ্যই দেই। এখন কি কর? কোথার থাক? দেখা কর না কেন? আমি, দৈনিক ছোলডান আছি।"

বহু জিজ্ঞাসার একত্র সমাবেশ। আমি কবি সাহেবকে সম্পূর্ণ অভিযান পূর্বক বলিলাম,— "দৈনিক ছোলডানেই ছিলাম। কয়েক মাস হয় ছোনডান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সার্কুলার বোডের আগের বাড়ীতেই আছি। আপনি বর্তমানে গান রেকর্ডিংয়ে ব্যস্ত আছেন বলে আপনার সময় নষ্ট করতে আসি নি। আপনার সব ধরই রাবি। অনেক বছর অনুরোধে বর্তমানে কলেজ কোয়ারে "এম্পাটার বুক হাউসে" বোপ দিয়েছি।"

বলিলেন,— "দেখানে তুমি কি কাজ করবে?"

বলিলাম,— "এই লাইমের কাজতো ভেমন কিছু আমি না। তবে প্রতিষ্ঠানের মাসিক বঙ্গবন্ধো সাহেব একজন মাজিত চরিত্রসম্পন্ন ভরস্ব বুঝক। বইয়ের পোকান শিক। প্রতিষ্ঠানের অগত্যসে, অজ কলে কোন আপত্তি করি নি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ভাল বই প্রকাশ করা।" তিনি আমার কথা শুনিয়া খুব খুশী হইলেন। বলিলেন, "বেশ করেছ। বর্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের খুব অভাব রয়েছে কলকাতায়। অনেক সাহিত্যিক তাঁর প্রকাশকের অভাবে তাঁদের বই ছাপতে পারছেন না।"

এবং সবার বাসা পাশাপাশি ও চা নিগা হাজির। উভয়ে পাশাপাশি পর্ব শেষ করিলাম। কহদিন পর কবি সাহেবের সহিত একত্রে পাশাপাশি খাইলাম। কিছুই ভুলি নাই। এরপর আমি বলিলাম,—“আপনার নাকি এশ্বারীর বুক হাউসকে ‘জুলুকিয়ার’ নামে একখানা ইসলাহী গানের কই পোকার কথা ছিল হাশীর জন্ম, কিন্তু এখনও সেই কার্য পাওনিশি পার নি। কর্তৃপক্ষ আপনার কই থেকে কই বইয়ের কপি মেঝার দান্নির আনাকে দিয়েছেন।”

উভয়ে বলিলাম,—“বসে হয়েছে। সে অনেক দিনের কথা। তাঁরা আমাকে টাকাত ‘নিজাচ্ছেন। জীবপন্ন এপর্বত কেউ কপি নিতে এসেন না। আমিও কাজের ভিত্তি এ বিষয় ভুলেই গেছি। বর্তমানে আমার একটুও কুরসত নেই। কেবল রবিবার দুপুরের পর বাসা হতে একটু কেবাই। সেদিন আমার ওদের পোকার বন্ধ থাকে। এখনই গাড়ী আসবে আমাকে নিতে আর হাত প্রায় দশটা এগারটার সময় বাসান পৌঁছে দেবে। তোমরা আন, আমি এক। অভাবের পাহাড় আমার চারদিকে মাথা উঠু করে রয়েছে। এখানমেই আমি দুর্বল।

“যে দারিদ্রপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছি, সর্বাত্মক সঙ্কলতার সাথে তার পরিসরাতি প্রয়োজন। হিংস্রটে সমালোচকের ভাে অভাব নেই। সব সময় আমাকে রেকর্ড তৈরীর গানের মহড়া-বজলিসে থাকতে হয়। ওখানমে বসেই গীতও রচনা করতে হয়। আরও অনেক কিছু। তা’হাড়া বিভিন্ন মহলের মানুষের ভিত্তিতে লেগেই আছে। অগাধত ভবিষ্যতে সমাজ এর বর্ধনা বুঝবে।”

আমি বলিলাম, “তাদের লোক এসে আপনার বাসার কোন দিনই আপনাকে পার নি। হিংস্রট ভয়েল অকসিগে গিরেও আপনাকে পার নি। অবশ্য দশটা এগারটার আগে কোন দিনই আসে নি তারা।”

আমার কথা শুনিয়া কবি সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “ওরা বোধ হয়—কোম্পানীর অকসিগে গিরে থাকবে। যেখানমে আমাদের গানের মহলা-বজলিস সেখানমে পৌঁছতে পারেনি। বাইরের লোক অসেকেই সে যাবগার ঠিকানা জানেনা। শিল্পীদের নিয়ে যখন রেকর্ডিং-এর বিভিন্ন জয়ের মহলা চলে, তখন বাইরের কোন লোককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ভুলি যখন ওখানমে যোগ দিচ্ছে, বই শীঘ্রই খের হবে। আমার পেছমে লেগে না থাকলে, তা’ও সম্ভব হবেনা। দু’ তিন দিন পর পর আমার থেকে, কিছু কিছু লেখা নিয়ে যাবে। একত্রে বইয়ের সব কপি দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না বর্তমানে। মহলা-অকসিগে যেয়ো। আজ আর কিছু হবে না। আগামী রোজবারখানা দশটা দশটার সময় আমার এখানমে আসবে, কিছু কপি নিয়ে যাবে।”

এই সময় প্রায়োজন কোম্পানীর গাড়ী আসিয়া হাজির হইল। ড্রাইভারের সাথে আছে কোম্পানীর লারোয়ান, বিরাট দেহধারী জোয়ান হিন্দুস্থানী দশরথ। অবশ্য কবিই তাহার পরিচয় দিলেন। ইহা পর কবি সাহেবের নিকট হইতে বিদায় নিগা স্বাক্ষর মানিয়া আসিলাম।

পূর্ব নির্ধারিত তারিখমত, রবিবার বেলা দশটার সময় কবি সাহেবের বাসার পৌঁছিলে, বাসা আমাকে বলিল—“আজ উপরের ঘরে বসতে হবে।” এই বলিয়া আমাকে ভিতরের ঘরে দিয়া খেল এক ডখার আমাকে বলিতে নির্দেশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের বেগেতে আমার সমস্তরক একজন ডক্টর যুবক একাকী বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে আর কোন দিন দেখি নাই। হিন্দু না মুসলমান ওহাও বুঝিতে পারিলাম না। শোশাক ভাে তখনকার দিনে সকলেরই এক প্রকার। তাঁহাকে সবতরকও করিলাম না, সন্তানিত।

দিনার না। উত্তরে আবার পৰ্য্যায়ের দিকট অজানা। অনেককণ আবার চূপচাপ বসিয়া আছি। কেহ কাহার সহিত কথা বলি না।

উপর তলার দর হইলেও সেখানে কোম অস্বাভাবিকত্বের আভাস নাই। ঘেঁষেতে বায়ুরের ঢালা বিহীন। টেমিল, চেয়ার, চৌকি ইত্যাদির কোম বাসাই নাই। এককোণে কিছু বিহীন ও বালিশ জড় করিয়া রাখা হইরাছে। আর আছে একটি হারমোনিয়ার। কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মিনিট পর কবি সাহেব ঘরে প্রবেশ করিলে আবার উত্তরে পাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। যশে হইল স্নান করিরাছেন। শাঁকড়া চুল, গায়ে সাদা কতুয়া, পরনে বকরের মৃতিকাপড়। আবাদিরকে বসিতে বলিয়া ডিমি নিজেও বসিলেন।

আমাকে বলিলেন,—“তুমি ওকে চেন? ওর নাম আব্বাসউদ্দীন। গ্রাম্যকন বেকর্ডে যে আব্বাস-উদ্দীনের পান শুনেছ,—ইনিই সেই উদ্দীনের কণ্ঠকিন্ধী আব্বাসউদ্দীন। এখানে আমার যে চার-খানা ইনলারি পান বেকর্ড হবে জাও ও গাইবে।

আব্বাস উদ্দীনকে বলিলেন, “তুমি জো ওকে চেন না। ওর নাম বাবুজুর রহমান। আমার কনুজ তক্ত, সোদর প্রতিম। দৈনিক ছোলভানের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে এম্পারর বুক প্রভিন্সের অন্যতম কর্মকর্তা। ‘জুলফিকার’ নামে আমার যে নুতন বই বের হচ্ছে, জা’ ওরাই ছাপবে।”

তখন আবার হাসিমুখে দুইজনই দুইজনের হাত চাপিয়া বসিয়া, উত্তরে উত্তরকে অভিবাদন করিলাম। এই দিনই আব্বাস সাহেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তাঁহার পর আমাদের মধ্যে অনেকবার অনেক কথাই হইরাছে।

পরে কবি সাহেব বলিলেন,—“আব্বাস, তুমি আমার যে-চারখানা ইনলারি পান, এখানে বেকর্ড হবে, সে চারখানা পান গেয়ে ওকে শুনিব পাও।”

প্রতি-উত্তরে, আব্বাস সাহেব বলিলেন,—“আজ আমার গলাটা ভাল নাই, ঠাণ্ডা লাগিরাছে।”

অনেকখণ্ড আমার ভাক পরিল। রাতা হাজির হইলে, কবি সাহেব লবঙ্গ সহযোগে গরম হালুয়া তৈরী করার নির্দেশ দিলেন।

বর্ণন স্ট্রেট বেরাই উত্তম হালুয়া হাজির হইল, তখন আব্বাস সাহেবের সমস্ত গলা, মুখ না হইয়া আর বার কোথায়। গরম হালুয়া গলাধঃকরণ হইবার পর, একে একে চারখানা পান আব্বাস সাহেব তাঁহার উল্লভ কণ্ঠে গাইয়া শুনাইলেন। পান চারটির প্রশংসাটম—বাক্যক্রমে : সাহাবাতে কুটলোরে যে বজ্রিন শুল লীলা, খোলায় প্রেবের শাহান পিরে, ইসলাবের ঐ সওদা লরে, ওরন রবজামের ঐ যোবান শেবে।

অতঃপর অনেককণ দানা প্রকার আলোচনার পর কবি সাহেব আমার হাতে দিলেন দুইখানা বহুত লিখিত খাতা, ‘জুলফিকার’ বইয়ের পাণ্ডুলিপি, একখানা ইনলারি পানের আর একখানা বিভিন্ন প্রকার পানের একত্র সমাবেশ।

কবির বহুত লিখিত এই দুইখানা খাতা বাতলা একাত্তেবীতে সংবন্ধিত আছে। দুই খানাই একসার-সহিত বুক।

ডিমি আরও বলিলেন,—“তিন দিন পর বেলা বায়টার সময় হ্যাগিগন রোডের বেরাকোন কোম্পানীর অফিসে যাবে। তখার আমার বোজ করলে আমাকে পাবে। আরও কপি দেবে। এতাবেই

বইয়ের অবশিষ্ট কপি নিতে হবে।” আব্বাস সাহেব রহিতা গেলেন। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় দিয়া বাসার কিরিলার।

পরের দিন লোকানে বলকুন্ডাজা সাহেব বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া খুশীতে ভরপুর। নূতন আজিকে ও ভাবধারায় ইসলামী গানের অতুত অঙ্গরূপ সমাবেশ। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া অনেককণ পর্যন্ত কাজী মজরুল ইসলাম সাহেবের বিভিন্ন রচনা রীতি ও মনুষ্যী কাব্যপ্রতিভার বিষয় আলোচনা করিতে আমাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল।

পূর্ব নির্দেশ মত, যথা সময়ে বেগাকোন অফিসে যাইয়া, রাত্তার অপর পায়ে, যে বাড়ীতে গানের মহলা হয়, সেই বাড়ীর দরওয়াজার দারোয়ানের হাতে কবি সাহেবকে দিবার জন্য আমার নাম লেখা একটু কাগজ দিলাম। দারোয়ান অন্য একটি লোককে ডিউর হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া কাগজখানা কবি সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিল। আমি দরওয়াজার বাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পর, কাগজখানা হাতে করিয়া কবি সাহেব বয়ঃ দরওয়াজার দ্বারি। গারে সাদা কতুয়া, পরনে ধুতি, খালিপায়ে দণ্ডায়মান। কবি সাহেবকে দেখামাত্র দরওয়ান বাঁড়া হইয়া সালান দিল। আমাকে দেখাইয়া দারোয়ানকে বলিলেন,—“ইনি বরম এখানে আসবেন, তাকে বাধা দিও না।” তিনি আমার কাছেই আসবেন।” ‘জি, হজুর’ বলিয়া দারোয়ান পুনরায় তাঁহাকে সালান দিল। আমাকে দিয়া তিনি—নীচের তলার দর পার হইয়া, উপরের তলার কয়েকটি দর অতিক্রম করিয়া—গানের আসর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে আমাকে দেখিয়া উপস্থিত শিল্পীবৃন্দ, নারী ও পুরুষ, আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমাকে বিজ্ঞানায় কবি সাহেবের পাশে বসিতে নির্দেশ দিয়া, সকলের নিকট আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশে আমি ছানার জানাইলাম। আমার বিষয় তাঁহাদের নিকট যাহা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি লজ্জার মাথা মত করিয়া রহিলাম। সর্বত্র বিবাক্ত আমি—ইংরাজী—১৯২৪ সনের কেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সহিত পরিচয় হইবার পর হইতেই তিনি কেন যে আমাকে অতটা মেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাহা ভাবিয়া পাই না। হাজার শুকুর আমার দরগায়। অবশ্য আকসোস তিনি আমাকে যে চক্ষে দেখিতেন, সেই অনুপাতে আমি তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারি নাই।

বিশিষ্ট নর-নারীর একত্র সমাবেশ এই গানের মহলা। উপস্থিত ভ্রমরগুলীর মধ্যে সেইদিনকার জন্য একমাত্র আব্বাসউলী সাহেবই আমার কয়েকদিন আগের পরিচিত ব্যক্তি। মহলা-কক্ষ মধ্যে ঢানাই বিছানা—বসিবার অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। একটু পরে হাস্যোদ্দীপক ও বুড়ীদীপ্ত হাসিকতার পরিবেশে গানের মহলা আরম্ভ হইল। বিভিন্ন শিল্পীদের গানের মূর ঠিক মত হইতেছে কিনা, বাস্তবিক ঠিক মত গানের সহিত সংযোজনা রক্ষা করিতেছে কিনা, সেই সব দিকে কবি সাহেব সজাগ। ইহা ব্যতীত শিল্পীদের সাথে বসাদাপ করাও অন্যতর কাজ। যাহার মহলা শেষ হইয়া যাইতেছে, তিনি চলিয়া যাইতেছেন, আমার আর একজন মহলা আরম্ভ হইতেছে। এইভাবে প্রায় তিন চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে চা-পান পর্বও করেবার হইয়া গেল। আমি, হংসরম্ভে বক বখা চুপ-চাপ বলিয়া রহিয়াছি। হঠাৎ কবি সাহেব আমার দিকে ডাকাইয়া, যেন এতক্ষণ আমার বিষয় তাঁহার খেয়ালই ছিল না, বলিলেন, “তুমি অনেককণ ব’লে আছ।” এই বলিয়া কাগজ কলম লইয়া, বুকের নীচে একটি বালিশ নইয়া বিছানার শরন করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি গান লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। আমার তিন দিন পরে আসিতে নির্দেশ দিলে আমি তাঁহাকে সালান দিয়া

চলিলা আশিকান।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথ্য আরও হৈ-হুলা ও গান বাজনার বিভিন্ন প্রকার হঠাৎকালে ডিবি কি করিয়া এতগুলি ইসলামী গান রচনা করিলেন, ইহা বাস্তবিকই বিশ্বাসের বিষয়।

তিন দিন পর বধাসময়ে গানের সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া দেখি—তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিন ওস্তাদ জব্বারউদ্দিন খান সাহেব আসিয়াছেন। বীণা, সারোজী, এসবাজ, ডবলা ইত্যাদি বাদ্যের মহলা চলিতেছে। তিনি সমস্ত ইসলামের গানের ওস্তাদ। অবশ্য কবি সাহেবই আমাকে সুমনস্কী জব্বারউদ্দিন সাহেবের বিষয় আদ্যোপাত্ত বলিয়াছেন। কিছুক্ষণ গানের মহলা চলার পর বেগাকোন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী জে, এম, ঘোষ মহাশয় আসনে উপস্থিত হইলেন। জনসা বহু করিয়া উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। কবি সাহেব, খান সাহেব ও অন্যান্য বিলাপীদের সহিত রেকর্ডিং-এর কাজের অগ্রগতির বিষয় আলোচনা অত্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি চলিয়া গেলেন। আমি তথ্য আরও অনেকক্ষণ অবধান করার পর, কবি সাহেবের পক্ষে সেই দিনকার বড় আশাকে কোম কপি দেওয়া সম্ভব হইল না বিধায়, তাঁহার নির্দেশ বড় চলিলা আশিকান।

তাঁহার কথা বড় তথ্য বাইতায় ঠিক বড়ই। কোন দিন কিছু লেখা দিতেন, আবার কোন দিন, সারাদিন তথ্য আমল কোলাহলে কাটাইয়া দিয়া শূন্যহাতে কিরিয়া আসিতাম। অবশ্য কলেজ ছেড়ারই আলবার্ট হল হইতে হ্যারিশন রোডের বেগাকোন কোম্পানীর অফিস সন্নিবিষ্টেই ছিল। এইভাবে প্রায় দশ দুই রেকর্ডিং-এর জনসার বাজারাতের ফলে, জনসিকারের পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইল।

বই প্রেসে দিবার সময়, ইসলামী গানগুলি প্রথম দিকে দেওয়া হইল। প্রায় তিন কর্মী কলোজ হইয়া বর্ষদ গ্যালি প্রস্তুত আসিল, তখন বাজার প্রথম করিয়া রাখিয়াছে। এইসব ইসলামী গানগুলি দিয়া একটি ডিস্ক বই করা যায় কিনা। কিন্তু এই জাতীর গানের সংখ্যা কম। ইহা বাতীত বইও দুইটা হইয়া যায়। এই বিষয়ে অক্ষমতা সাহেবের সহিত বিভিন্ন সুবিধা ও অনুবিধার বিষয় আলোচনা করিলাম। সিদ্ধান্ত হইল, কবি সাহেবের সম্মতি লইতে হইবে। এই কাজের ভারও আমার উপর বড়িল।

কিছুদিন কবি সাহেবের ঘন সংসর্গে থাকার ফলে আমার নিজের চিত্তাধারও কিছু পরিবর্তন ঘটনা-ছিল। আমার প্রতীতি অনুযায়ী যে এই পাণ্ডুলিপি দিয়া দুইটা বই করিলে কবি সাহেবের সম্মতি পাইতে আমার খুব অনুবিধা হইবে না। বইয়ের প্রস্তুত আশাকেই দেখিতে হইবে—তাঁহার নির্দেশ, তিনি শুধু প্রিন্ট অর্ডার দেখিয়া দিবেন।

প্রচার প্রেসের স্বত্বাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ বাচস্পতি মহাশয় ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। আমার পরিচিত জন। তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলা কলোজ ডাঙিয়া এক পৃষ্ঠাকে দুই পৃষ্ঠা, এক লাইনকে দুই লাইনে ভাগ করিলা, প্রত্যেক লাইনের পর বেশী করিয়া স্পেস দিয়া, ইসলামী গানের চারি কর্মীর একখানা বই বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলাম। বইয়ের মূল্য এক টাকা। কিন্তু ইসলামী গানে শেষ পর্যন্ত চারি কর্মীর পুরা হয় না বলিলা অন্য তিনটি গান শেষ পৃষ্ঠার সংযোগ করিলা টাইটেল শেষ সহ সেক আপ শেষ করা হইল।

বইয়ের সন্ধান করা প্রস্তুত দিয়া কবি সাহেবের বাসার তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি আদ্যোপাত্ত দেখিলা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “একি করেছ? অবশিষ্ট লেখাগুলো কোথায়?” আমি প্রতি-উত্তরে

সন্ধ্যোচের সহিত বলিলাম, “আপনার ইগলারী গানের কোন ভিনু বই নাই। আমার খুব ইচ্ছা ইগলারী গানের একখানা বই হউক। বর্তমানে এই গানগুলি অসমসাধ্যরূপে প্রচলিত করছে। আপনি সম্মত হলে, অবশিষ্ট গানগুলি দিয়ে আর একখানা গানের বই বের করব। এই পরিকল্পনার জন্য আমিই দায়ী। বদরুদ্দোজা সাহেব বলেছেন, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করা হবে না।” কবি আমার বক্তব্য শুনিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি ভরে অপর্যায়ী হইতাম। নীচু করিয়া রহিলাম। একটু পরেই তিনি হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“তোমার পরিকল্পনা ও সাহসকে ধন্যবাদ। তুমি যে আমার ইগলারী গানের বিষয় এতটা চিন্তা করেছে, আমি কিন্তু এতটা ভাবিনি। আমার কাছে আগে বললে শেষের তিনটি নতুন গান লিখে দিতুম।”

আমি তাঁহার কথায় সাহস পাইয়া মাথা তুলিয়া বলিলাম,—“আপনার সবরের খুব অভাব। এ ছাড়া বই ছেপে বের করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। এই পুস্তক আমি তিনবার দেখেছি। শেষের চাইপও আটক হয়ে রয়েছে। ফর্ম সব প্রস্তুত। আপনি বেহেরবানী করে একবার দেখে দিলেই, আগামীকাল ছাপা আরম্ভ হবে। তারপর বই বাঁধাই হতে দোকানে উঠতে যে ক’ দিন দেরী।”

হাসিতে হাসিতে পুস্তকের পাতা উলটাইয়া তিনি শুধু বইয়ের বেক-আপই দেখিলেন এবং বলিলেন, “বইয়ের নাম যে অন্য ‘জুলফিকার’ রেখেছিলাম তা’ তুমি ওলটপালট করে দিয়েছ। পুস্তকের গানের একত্র সমাবেশ। তোমার দেখা আমার বইয়ের পুস্তকে তুল থাকবে না, তা’ জানি; কিন্তু যেদিন পুস্তক দেখে দিও।”

এই সুযোগে আমি বলিলাম,—“জুলফিকার’ ছাপা হইলেই অবশিষ্ট গানগুলি প্রেসে দিয়া দিব, আপনি এই বইয়ের নামকরণ করিয়া দিন। বাহাতে দুইটি বইই নীচু আত্মপ্রকাশ করে।”

একটু চিন্তা করিয়া এই বইয়ের নাম রাখা হইল “বদরুদ্দোজা”। আমি প্রকৃত চিন্তে হাতের লক্ষ্যে আসিলাম, তাঁহার বাসা হইতে। দোকানে আসিয়া বদরুদ্দোজা সাহেবকে সব কথা বলিলে তিনি আমার হাতে হাত মিলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, “বদরুদ্দোজা কাজ করিয়াছেন। এক বইয়ের পরিকল্পনা দুই বই হইয়া গেল। আপনি সা হইলে এই কাজ অনেক দায়ী সম্ভব হইত না। আমার দায়িত্ব দরই। আমিও ভয় করিয়াছিলাম কবি সাহেব না স্বীকার করিয়া বসেন।”

কয়েক দিনের মধ্যেই জুলফিকার বাঁধাই হইয়া যবে আসিল। দশখানা বই নিজে কবি সাহেবকে দিলাম। বইয়ের অঙ্গগোষ্ঠ্য দেখিয়া আত্ম-ভোলা কবি খুশীতে ডরপুর। তারপর ‘বদরুদ্দোজা’ চারি কর্দার পুস্তক দেখিয়া যেম খুব আশ্চর্য হইয়া গেলেন। বলিলেন,—“এত জটিলতা চারি কর্দার করে কেমনে?” আমি বলিলাম,—“এই বইয়ে আপনার বর্তমান সবরের একটি কটো দিতে হবে।

এখন থেকে কটো ব্রুক করে না রাখেন বই বের হতে দেরী হবে। সাত কর্দার বই বের করব।” বলিলেন, “তুমি দেখছি সাহেবদার। তোমার আমার একেবারে মাঝার চাপলো কেন? বর্তমান আমার কোন বইয়েতো আমার ছবি থাকে না। বইয়ের বাসাতে তুমি যা ক’রছ, তা’ তোমার মালিকের নির্দেশ মত, না তোমার বেহাল মালিক?”

আমি বলিলাম,—“বই প্রকাশনা বিষয়ে আমি যা ক’রি, তাহাতে তিনি কোন আপত্তি করেন না।”

হাসিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা, কটো তুলে রাখো। পাঁচ ছয় দিন পরে এসে।”

‘বদনীতি’ চার বর্ষা ছাপার পর দেখি, আরও পাঁচ ছহাট নুতন গান না হইলে, টাইটেল সম্বন্ধে নাড় কৰ্মা পূৰ্ণা হয় না। কবি সাহেবকে বাগার বাইরা আরও পাঁচ ছহাট গানের দরকার জানাইবার।

ডিমি বলিলেন,—“বর্তমানে বেগাকোন কোম্পানীর যেকড়ি বড় আছে। এই বাসে হিচ বাটার ডব্বের কোম্পানীর যেকড়ি হচ্ছে। তুমি চিংপুরে ঐ কোম্পানীর গানের বহলা অকিলে ডিন দিন পর বাবে।” তাঁহার নির্দেশ বড়, চিংপুর অকিলের টিকানায় গেলেন, দেখি, দরওয়াজার কোম্পানীর দারোহান দরবর বসা আছে। আমি তাঁহাকে কবি সাহেবের কথা বলিলে সে আমাকে ডিন ডিনার নিয়া গেল। তখন বেলা দুই ঘটিকা। দেখি একটি ছোট ঘরে কবি সাহেব অন্য একজন লোক সহ বসিয়া আছেন। তখার অন্য কোন লোক নাই। আমাকে দেখিয়া ডিডরে আসিতে বলিলেন। আমি তাঁহানিকে সালান দিলাম এবং ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। আমি তখার বসিলে কবি সাহেব আমাকে বলিলেন,—“বাহকুজ, তুমি একে চেন? ইনি খ্যাস-সকীড বিশারদ, কে, বল্লিক। ডবে কে, বল্লিক আর নাই। এখন হইতে ইনি কাসেম বল্লিক।” তাঁহার নিকট আমার পরিচয় হইল আমি কবির সোদর প্রভি। আমি আবার বল্লিক সাহেবকে সালান দিলাম। কবি আরও অনেক কিছু বলিলেন আমার বিষয়, যদিও আমি এসব কথা উপযুক্ত নই। অস্বাচ্ছন্দ মেহের এক অপূর্ব পরাকাষ্ঠা।

বল্লিক সাহেবকে দেখিলাম। দীপ্তিরাম বুধবওল। মাখার কোঁকড়ামো চুল। তেজোদীপ্ত চাহনি। উন্নত নাসিকা। দীর্ঘদেহী সুপুঙ্খ। পরিধানে বৃত্তি, গারে সাদা টুইলের সাট।

জুলফিকার ও বদনীতির ছাপাস ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে কিমকণ আলোচনার পর কবি সাহেব কয়েকটি গান, তাঁহার নিজস্ব একখানা ছোট কবিতা, যাহা বদনীতিতে ছাপা হইয়াছে, তাঁহার গানের ওস্তাদ মুর মত্ৰাট জবির উজ্জিম খান সাহেবের মাঝে “বদনীতি”র উৎসর্গ পত্ৰ, আমার হাতে দিলেন। এই বইয়ে আর কোন গানের দরকার হইবে না, তাহাও জানাইয়া দিলেন। এখন সময় চা ও মাসুতা হাজির হইল। আহার অন্তে তাঁহানিকে সালান জানাইয়া চলিয়া আসিলাম।

‘জুলফিকার’ বাহির হইবার প্রায় এক বাস পরে, মজলল ইসলামের নুতন ছবি সম্বলিত “বদনীতি” প্রথম সংস্করণ, লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করিল।

‘জুলফিকার’ ও ‘বদনীতি’ প্রকাশ করা উপলক্ষে, উক্ত পুস্তকব্ধের পাণ্ডুলিপি কবির নিকট হইতে সংগ্রহের সময় মধ্যে, তাঁহার নিকট বস বস বাতায়ানের উপলক্ষে, তৎকালীন বক্ত বাঙলার প্রখিতবশা সাহিত্যিক, সঙ্গীত কলা-বিদ, বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ও সাংবাদিকদের সহিত আমার পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটে। ইহা বাতীত মজললের “কবির আশপাশ” ছাপার সময়, প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধনী মজলিলে যোগ দেওয়ার অনেক শিক্ষাবিদ জ্ঞানীওণী ও সত্যিকারের আলোর সাহেবদের সহিত পরিচিত হইবার সংযোগ ঘটে। এই দিক দিয়া নানা আমি—নিম্নের ডায়ালগ।

যাতপ্রতিযাত্তে অর্জিত, স্মৃতি-কিস্মতি-জড়িত জীবনের অন্তরেবার পৌছিয়া তুলি নাই তাঁহাদের কথা।

“জুলফিকার” ও “বদনীতি” ছাপা হইয়া বাজারে বাহির হইবার কয়েকদিন পর, বদরোহোজা সাহেব এক দিন আমাকে ছয় ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ একখানা গানের খাতা আমার হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“ইহা আপনাদের কাছে লাগিবে। সাবধান বড় রাবির দিবেন।” ডিমি ও আমি তখন উভয়েই সমবয়স অবিবাহিত যুবক। পাঠ্যর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া হস্তাকর দেখিলাম

বিশেষ করিয়া দুইটি লেখার প্রতি বিশেষভাবে দুই নিক্ষেপ করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি। খাঁজর গ্রন্থের পৃষ্ঠা হইতে কবি মজরুল ইসলাম সাহেবের সহস্র লিখিত কবির 'বুলবুল' কইরের নব্বাট গান। তার পরের পৃষ্ঠা দুইটিই আমার ডাবাড়রের প্রধান উৎস। কবির হত্যাকরের পরে অকণা অন্য-কোঁকর হস্ত লিখিত আরও কিছু গান ও কবিতা আছে।

গ্রন্থের পৃষ্ঠা হইতে যে কয়টি 'বুলবুলের' গানের সমাবেশ জায়া হইল :

- ১। বদিয়া নদীকূলে ; ২। নিশি জোর হ'ল আগিয়া ; ৩। কেন উচাটন বন-পর্যাপ ;
- ৪। পরদেশী বঁধুয়া ; ৫। এ বাসি বাসরে ; ৬। কে বিদেশী বন-উদাসী ; ৭। কেন কঁদে পরাণ ; ৮। এত জন ও কাজল চোখে ; ৯। করুণ কেন অকুণ আঁধি।

এই কয়টি গানের পরের পৃষ্ঠায়, কবির নাম ও তারিখ সম্বলিত আর দুইটি কবির সহস্র লিখিত চারি লাইনের কবিতা,—যাহা আমার মনে আনোড়ন স্বষ্টি করিয়াছে, জাহার অনুনিপিও দেওয়া হইল :

সুন্দর বেশে নৃত্য আমার আসিলে কি এত দিনে ?
 বাজালে দুপূরে বিদায় পু'রবী আমার জীবন বীণে।
 ভর নাই রাণী রেখে গেনু শুধু চোখের জলের লেখা।
 রাতের এ-লেখা শুকাবে প্রভাতে—চলে যাই আমি একা।
 ২৩-২-২৮ কবি
 রাত্রি ১টা ২৫ মিনিট।

দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন,
 উর্ছে তোমার প্রহরী দেবতা,
 মরো পাঁড়ারে তুমি ব্যাখাছতা,
 পারের ডানার নৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ ?
 ২৪-২-২৮
 প্রভাত।

সেই খাঁজর এই দুইটি কবিতার পরের পৃষ্ঠায়, অন্য লোকের হস্ত লিখিত যে দুইটি কবিতা ; জাহার অনুনিপিও মিস্ত্রে দেওয়া হইল।

তোমারে বা দিয়েছি, তোর
 পেয়েছ বিশেষ অবিকার।

হেথা বোর ডিলে ডিলে দাম,
করুণ বুহুর্ভুগলি গুণে ডরিয়া করেছ পান
হৃদয়-অঙ্গলি হ'তে বন।
ওখো ডুরি নিকরন

হে ঐশ্বর্যবাদ।

তোমারে বা দিয়েছি, সে তোমারি দাম
গ্রহণ করেছ বড, ধনী ভড
করেছ আমার।

হে বডু, বিদার।

হে বডু, বিদার।

এই কবিতার পরের পৃষ্ঠা

তোমায় কিছু দেব বলে
চায় যে আমার বন
নাটক তোমার থাকল প্রয়োজন।

গানের খাতায় কাঁহাও নাম নাই। কে যে-এই খাতার মালিক তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। দুই ত্রয়ের নিষিদ্ধ অতি সাধারণ একখানা ছোট গানের খাতা কিন্তু তাহা আমার বনে এক মহাজিজ্ঞাসা। কবির নিম্ন হাতের লেখা কবিতার নীচে নাম ও তারিখ সম্বলিত দেখিয়া আমার অনুসন্ধিৎসু বদ চকল হইয়া উঠিয়াছিল। নিশ্চয়ই এইসব কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা। সেই ব্যক্তিকে জানাই আমার উদ্দেশ্য।

যারি বদকন্দোজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “—আপনি এই খাতা কোথায় পাইলেন? ইহার মালিক কে?” তিনি হাসিয়া বলিলেন,—“পথে বলিব। বর্তমানে উহা সবধে রাখিয়া দিল।” আরি বলিলাম,—“এখাতা আর আপনি কেনও পাইবেন না।” তিনি বলিলেন,—“আপনাকেই তো ইহা দিলাম। আমার প্রয়োজন না হইলেও আপনার প্রয়োজন হইবে।” এই কথাই কোন অর্থ বুঝিয়া পাই নাই সেই দিন।

পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে উক্ত গানের খাতা, তাঁহার হাতুজারা, মলিসিটির শায়খুজোহা সাহেবের জী,—কজিনাতুয়েগা সাহেবার। তিনি বেশ কিছু দিন কলিকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালে অবস্থ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে তাঁহার বিছানা হইতে তিনি উহা সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশ্য পরে ঐ খাতার আর বোঝ হর নাই।

শায়খুজোহা সাহেব ও কজিনাতুয়েগা লওমে থাকাকালীন সময়ে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতার পরিবেশ সৃষ্টি হইবার সুবোধ ঘটে। দেশে কিরিয়া বিবাহিত জীবনে জোহা সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেয়, আইনজ্ঞ হিসাবে।

সাবীত্রী তাঁহার। মাঝে মাঝে কোন দিন বিকাল বেলা আমার কোন দিন সন্ধ্যার পর এম্মারার বুক হাউসে আসিতেন। কোন সমর আমার মিসেস জোহা একাই আসিতেন। তাঁহার জন্য ভাল বই নির্বাচন করিয়া দিতে হইত আমাকে। ভাল বই সংগ্রহের দারিদ্র্য ছিল আমার উপর,—তাঁহার পড়ার জন্য।

আমি এম্পায়ার বুক হাউসে পুস্তক প্রকাশন বিভাগের কর্তৃক গ্রহণ করার কিছু কাল পূর্বে, কজিলাতুরেঙ্গার মারকুতই, কবি কাজী নজরুল ইসলাম উক্ত প্রতিষ্ঠানকে “জুলফিকার” নামক একখানা গানের বই প্রকাশ করার সম্মতি দিয়াছিলেন। পূর্বে ইহা আমার জানা ছিল না।

কজিলাতুরেঙ্গা সাহেবের প্রথম সন্তান প্রসবের সময় ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাকে কলিকাতার কম্পবেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তথায় নিজানিয়ান অপারেশন যোগে তাঁহাকে প্রসব করান হয়। তাঁহাকে কিছু দিন উক্ত হাসপাতালে থাকিতে হয়। ডাক্তার তখনই জানাইয়া দেন যে ভবিষ্যতে তাঁহার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

এইভাবে যে কন্যা ভূষিত হয়, তাহার নাম রাখা হয়, জুলিয়ারা নিজারের নামের সহিত সংযোগ রাখিয়া,—“জুলিয়ারা জোহা।”

তখন আমার স্মৃতি-বিস্মৃতি আর এক ভিগ্নত খুলিয়া গেল। ইংরাজী ১৯২৭ সালে আমি করটিরা কলেজের বিত্তীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। জনাব ইব্রাহীম খাঁ সাহেব তখন কলেজের অধ্যক্ষ।

বিত্তিঙ্গ জেলার সহপাঠীদের একত্র সমাবেশে কলেজ সংলগ্ন হোটেলে থাকি। সেই সময় জানিতে পারিলাম, কনটায়ার সপ্তিকটিবতী কুসুমী গ্রামের জনাব ওয়াহেদ আলী খানের কজিলাতুরেঙ্গা নামক মেয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অঙ্ক শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তখন আরও নবোদয় হইল মাসিক “সংগীতে” উক্ত মহিলায় ছবি দেবিরাজি।

আরও জানিতে পারিয়াছিলাম, কজিলাতুরেঙ্গা খানও উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য টেটু জলারশিপ লইয়া লণ্ডনে গাইবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তৎকালে, ব্রিটিশ আমলে, লাঙ্কনা দেশের সমাবিল্ল গ্রাম মুসলমান মেয়েস পক্ষে, অঙ্ক শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব-উচ্চস্থান অধিকার করা, বাস্তবিকই সমাজের পক্ষে গৌরবের বিষয়। তাঁহার প্রতিভা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

উক্ত খাঁ সাহেব তখন সবতম ওয়াহেদ আলী খান পত্নী সাহেবের ওয়াক্ফ এষ্টেটের জমৈক কর্মচারী। একদিন আমবা কয়েকজন সহপাঠী কবটিরা এষ্টেট অফিসে গিয়াছিলাম, কৃতী সন্তানের পিতা ওয়াহেদ আলী খান সাহেবকে নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য। তাঁহাকে দেখিরাছি, কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথা বলি নাই।

কোজা সাহেব এই গানের খাঁতখানা আমাকে কেন দিলেন এবং ইহা আমার কি কাজে লাগিতে পারে? এমন সময় বনে হইল ‘বনগীতি’র কোন্ পৃষ্ঠায় বেন এই ধরনের একটি কবিতা আছে। এই বই আমার হাতেরই ঢালা। তখনই একখানা বই নইয়া বইয়ের শেষ দিকে একানব্বই পৃষ্ঠায় হসিস মিলিল।

পূর্বে উল্লিখিত চারি লাইনের দুইটি কবিতার প্রথমটিকে আট লাইনে পরিবর্তিত করিয়া এর বিত্তীয়টিকে বখাওয়া চারি লাইনে রাখিয়া, মোট বার লাইনের একটি কবিতা। ইহার নিবোনাম দিয়াছেন,—গান। এই বইয়ের প্রত্যেক গান, গজন ও ভজন ইত্যাদি কবিতারও বিত্তিঙ্গ স্বর উল্লেখ করা আছে। অথচ এই গানের কোন স্বর দেওয়া হয় নাই।

প্রথম আট লাইনের পথ চারিটি বিবাহ চিহ্ন, অর্থাৎ ছোট ডাককা দিয়া কবিতাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইরাছে।

আমাদের আলোচ্য দুইটি ভিন্ন ভবিষ্যৎ কবি চারি লাইনের দুইটি কবিতার একত্র সমাবেশ—এই গানের নব স্বপারশ।

বনগীতির প্রথম সংস্করণ কাহারও মিকট থাকিলে এবং উক্ত গানের বাস্তবানা মিলাইয়া দেখিলে আমার লেখার স্বার্থাত্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে মজবুল ইসলামের হস্তাক্ষর সম্বলিত উক্ত গানের বাস্তবানা মজবুল একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে।

এক দিন মজবুলের সাহেবকে বলিলাম,—“এখন বুঝিয়াছি, কেন আপনার গানের বাস্তবানা আমাকে দিয়াছেন।”

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বনগীতির শেষের গানটি দেখিয়া খাতাটি আপনার হাতে দেওয়াই দ্বিধা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। আপনি যে আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমার আশুভুতি।”

গি-উত্তরে আমি বলিলাম, “কবি সাহেবের হস্তাক্ষর বাস্তব অন্য লেখাগুলি যে কাহার হাতের লেখা, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। আর না হব নাট আমিসলাম।”

অনুবাদক মজরুল

আবদুল কাদির

কাজী মজরুল ইসলামের লেখক-জীবনের পরিধি ১৩২৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় ২৪ বছর। সাহিত্যিকপক্ষে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা : ‘বুজি’ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬)। দ্বিতীয় কবিতা : ‘কবিতা-সমাদি’ (সপ্তপাত, আশ্বিন ১৩২৬), তৃতীয় কবিতা : ‘আশায়’ (প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬), চতুর্থ কবিতা (পাখা) : ‘চিঠি’ (বঙ্গবন্ধু, বৈশাখ ১৩২৭) এবং পঞ্চম কবিতা : ‘কালোর উকিল’ (নূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭), অথবা ‘বোধন’ (মোসলেব জার্নাল, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)। ‘আশায়’ হাকিমের একটি গজলের অংশবিশেষের অনুবাদ এবং ‘বোধন’ হাকিমের ‘মুসোকে শুন্ গুস্তা বাখ্ আরেব্ ক-কিসান গব্ মরোর’ নামক গজলের ভাবানুবাদ। ১৩২৭ কাড়িকের ‘বঙ্গবন্ধু’ে তিনি ‘রুমী’ অবলম্বনে লেখেন ‘বিশীর বাখা’। মজরুলের কবি-জীবনের সেই সূচনাতেই দেখা গেছে : মৌলিক কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে কায়দা থেকে অনুবাদের দিকেও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ।

সেই প্রথম জীবনে ইংরেজি থেকে বাংলা গদ্যে কিছু অনুবাদও তিনি করেছিলেন। ১৩২৭ বৈশাখের ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকার সংকলন’ বিভাগে ‘জননীদেব প্রতি’, ‘শিশুর খুঁটিমাটি বিশেষ’ ও ‘জীবন-বিজ্ঞান (দুঃখ-কষ্টের মহর)’ নিরোনামে তাঁর তিনটি ছোট লেখা ছাপা হয়; তার পেছা বঙ্গদীয় মধ্যে বুক্তিত আছে : “Englishman-এর Magazine Section” হইতে। এ লেখাগুলির ভাষাসৌকর্য দেখে মনে হয়, ইংরেজী মালবন্দা অবলম্বনে লেখা হলেও এগুলি ছব্ব অনুবাদ নয়। তবু মজরুলের অনুবাদ-কার্যের খতিয়ান লিখতে গেলে এগুলিরও উল্লেখ আবশ্যক।

১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠের ‘পুলাজী’তে জনাব আতোয়ার মহরান ‘অনুবাদক মজরুল’ প্রবন্ধে বলেছেন : “হাকিম এবং ওমর বৈয়ানের রুবাইগুলির অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হয় মাসিক ‘মোহাম্মদীতে —মজরুলের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে। তিনি ছইটম্যান এবং হাকিমের কবিতার অনুবাদও করেন এই সময়েই।...তিনি কোরাম শরীক এবং ‘লেওয়ান-ই-হাকিম’-এর অনুবাদ শুরু করেন প্রায় একই সময়ে।

১. মজরুলের “রুবাইয়াৎ-ই-ওমর বৈয়ান” গ্রন্থের জুটিকার সৈরন মুখতবা আলী বলেছেন : “কাজী সাহেবের প্রথম জীবনের রচনা এই কাজী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। ‘বেবার পাহাড় বেবার পাহাড়ে’র অনুদ্বর্ষণে ‘পাভিন আরব পাভিন আরব’ ঐ মূগেরই অনুবাদ।”—১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের ‘মোসলেব জার্নালে’ প্রকাশিত হয় মজরুলের ‘সাত-ইন্-আরব’,—তা অনুবাদ নয়, মৌলিক কবিতা—একটি ছবি দেখে হঠাৎ, সে ছবি বুক্তিত আছে পত্রিকার frontis-piece-রূপে এবং ছবির পবিত্র আছে পত্রিকার বেকের দিকে ১৩৯ পৃষ্ঠায়।—লেখক।

কিছু আবার যত্নের ভাবেনি। মজবুত করাচীর সেনাদিনাগে থাকতেই 'দীওরান-ই-হাকিক' থেকে কয়েকটি গজলের অনুবাদ পাঁড়ি করিয়েছিলেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'কবাইরান-ই-হাকিক' পুস্তকের 'মুখবন্ধে' বলেছেন :

আমি তবম ছুল পানিরে বুছে গেছি। সে আভ ইংরিজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আবার হাকিকের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙ্গালী পটনে একজন পাঠাবী বোনভী সাহেব থাকতেন। তাঁর কাছে ক্রমে আমি কসি কবিরের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই প'ড়ে কেলি। ...এর কয়েক বৎসর পরে হাকিকের 'দীওরান' অনুবাদ করতে আরম্ভ করি।

তাঁর 'কাব্যো আযপারা' (১৩৩৮) প্রকাশের প্রায় ১১ বৎসর পূর্বে, ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'মোসলেন ভারতে', সেই 'অনুবাদ' থেকে ছয়টি 'গজল' প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে তাঁর 'দীওরান-ই-হাকিক' : 'গজল—৭' প্রকাশিত হয়; তাতে বিবোধানন্দের নীচে বন্ধনীয় বহু লেখা আছে : "প্রথম ছয়টি গজলের কবিতার-অনুবাদ 'মোসলেন ভারতে' বেরিয়েছিল। এগুলি হুবহু অনুবাদ নয়। ভাব-অনুবাদ বলা যেতে পারে।" ১৩৩০ বৈশাখের কবীর মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকার 'দীওরান-ই-হাকিক' থেকে অনূদিত তাঁর আর একটি 'গজল' প্রকাশিত হয়। এ-সকল অনুবাদে মজবুত মূল্যের ভাব ও ছন্দ-ধ্বনি যথাসম্ভব রক্ষায় রেখেছেন। 'গজল—২' থেকে দু'ছত্র উদ্ধৃত করছি :

১	২	৩	৪
৷— — —	৷— — —	৷— — —	— — ৷—
হে বোর মুলার। তাঁদের চাঁদ মুখ তোমার মৌসম জল মেখেই,			
স্রপের জোলুস তোমার চৌলদার চিবুক গণ্ডের কুপ খেকেই॥			

এখানে প্রতি চরণে চারিটি পদ (measure) এবং শেষ পদটি অপূর্ণ; পূর্ণপূর্বে চারিটি স্বর (Syllable), তদুপাং প্রথমটি মুক্তস্বর এবং অবশিষ্ট তিনটি বদ্ধস্বর; চরণ-প্রান্তের অপূর্ণ পদটিতে তিনটি স্বর, তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি বদ্ধ এবং বিত্তীয়টি মুক্ত। উপরোক্ত চরণদ্বয়ে প্রথমের (accent-এর) একুপ পর্যাধিন্যাসের দ্বন্দ্ব 'তাঁর' চন্দ্রে কারগীর লম্ব-স্বল্প-ধ্বনির ত্রয় সঙ্গত হয়েছে। মজবুতের সুক্ষ্ম ছন্দ-শ্রুতি তাঁর অনূদিত গজলেও এনে দিয়েছে যথার গীতিধ্বার। মজবুত যেখানে ছন্দকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন তাঁকের কল্পলোকে, সেখানে বাণীর আবেশনে হয়েছে অধিকতর তীক্ষ্ণ ও প্রাণবত। উপরোক্ত 'গজল—৭' থেকে মজীর তুলছি :

মন-ববুীর লারি 'বিরহ'-ভুজগী কঁসেছিল কালো কেশ-জালে,
কেস বুনে' দিরে বেশী 'বিচ্ছেদ'-কণী চেড়ে দিলে প্রিয়ার পেশকালে।
তব এলোচুলে বারু বুনে' গেল মন আলো নিতে গেল আঁবিয়ায়ে,
ঐ কালো কেশে আমি ভালোবেসে শেষে দেশে দেশে কিরি কাঁদিয়া রে।

উপরোক্ত গজলটি মাত্রাবৃত্ত (MORAIIC) ছন্দে বিরচিত; তার প্রতি চরকের গোড়ায় একটি ত্রিমাত্রিক অতিপর্ব (hyper-measure), অতঃপর চারিটি পর্ব, তদনুযায়ী প্রথম তিনটি পর্ব ষণ্মাত্রিক এবং চতুর্থ পর্বটি চতুর্মাত্রিক। সত্যোক্ত্যনাথ দত্ত হাকেকজ' অবলম্বনে 'প্রিথা হবে পাশে' লেখেন; তার থেকেও তার ছন্দ তুলছি :

আমাদের এই প্রেরিক সমাজে আত্মর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে বোরা মগন সর্বদাই।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সবুজ কান তরি'
'অঁখি তরি' দেখি সুরার পেরালা—তব রূপ হুন্দরী।

—[তীর্থ সলিল]

সত্যেন্দ্র দত্ত (১৮৮২—১৯২২) এ অনুবাদ করেছেন প্রচলিত লঘু-ত্রিপলী ভঙ্গীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। কিন্তু এ অনুবাদে ফারসী শব্দবৈচিত্র্য ও ভাবব্যঙ্গতা কতখানি প্রকাশ পেয়েছে? আভোয়ার রহমান কি বলতে চান যে, এ অনুবাদ 'বৌলিক কবিতার মতো', আর মজরুলের অনুবাদ তাঁর অপেক্ষা 'নীলস' ?

হাকিকের সুপ্রসিদ্ধ 'আগর অঁ। তুরকে শিরাজী' গজলটির অনুবাদ বোহিতমান মজরুল (১৮৮৮—১৯৫২) করেছেন এভাবে :

শীরায়ের সেই তুরানী রূপসী
বেদরদী
যদি কোনদিন দরদ বোধে এ
সুখ-হারার,
লাল সে গজলের কালো তিলচির
বদলে গো
দিয়ে দিতে পারি সবরকম
বোখারা আর।
বেটুকু শরাব পড়ে আছে শেষ—
চালো সাকী!
বেহেশতেও সে আরগা এমন
আছে মা কি ?
রোক্তমাবাদের নীল মহরের
কিনারাটি
গুল-গলাগলি গরিটি এমন
বুসলায় ?

—(বশক-পশারী, 'হাকিকের অনুসরণে')

এ অনুবাদে চরণের পৰ্য্যায় নুল থেকে বেশি হলেও পৰ্ব্বগুলির খসিগরিমা ও বিদ্যালি
বিচিত্র ব'লে কাব্যের আবেশন হয়েছে ক্ষয়গ্রাসী। কায়নী আবহও অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এর
হৃদয় কল্যাণিক; কিন্তু প্রবোধ (Stress-এর) স্বল্প প্রয়োগে এর হৃদয় হয়েছে চটুল ও গভীর
—গভীরে যা পরম কাব্য।

শেখ হবির রহমান সাহিত্যরসের 'আবেহারা' (১৯১৪) গ্রন্থে হাকিজের দুটি গজলের
পদ্যানুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ওতে হাকিজের সুবিখ্যাত "বোতরেবে খোন্ নওদা বোগো ডাজা
কতাজা নও বদও" গজলটির অনুবাদ :

গাও হে গারক, গাও হে বধুর
নুতন নুতন ধরমে,
তুলিয়া ললিত সুমধুর সুর
নুতন নুতন ধরমে।

এ আক্ষরিক অনুবাদ (literal translation) হলেও কাব্যসৌন্দর্যে ক্ষয়গ্রাসী হয়েছে কি না
বিচার্য। ১৩৩৭ শ্রাবণের 'জয়ন্তী'তে নজরুল হাকিজের উপরোক্ত গজলটির ডাবানুবাদ করেন
এভাবে :

আরো নুতন নুতনতর শোনাও শ্রীতি গানধোয়াগা।
আরো ডাজা নাগাধ ঢালো, করো করো জয়র আলা ॥

হাকিজের 'দীওগাম' থেকে নজরুল বোট কতগুলি গজলের অনুবাদ করেন, তার সঠিক তালিকা তৈয়ার
করা বেড়ে পারে।

আতোয়ার রহমান "হাকিজের রচনার অনুবাদ" প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র বজ্রবাদের 'সম্মানপত্র' (১৮৬৪)
কাব্যখণ্ডির নাম উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বজ্রবাদের "প্রকৃত বহু উপর," "দুঃখ বিদ্যা সুখ
হয় না" প্রভৃতি পয়ার ছন্দের পদ্যগুলি তুলপাঠ্য পুস্তকে আজও সংকলিত হয়ে থাকে।
প্রথমে ১৪-পংক্তির পদ্যটির শেষ শ্লোক—

হাকিজের প্রিয় সেই অতিশু-জয়র,
যে করে সরান প্রেম সকল সয়র।
—(সম্মানপত্র, ১৫ পৃঃ)

দ্বিতীয়োক্ত ৮ পংক্তির পদ্যটির শেষ শ্লোক—

যমে ভেবে বিবর বিরহ-রিপু-ভয়,
হাকিজ। বিবুধ কেন করিতে প্রণয় ?
—[সম্মানপত্র, ৮১ পৃঃ]

বলাবাহুল্য যে, হাকিম থেকে তাঁর নিয়েই কৃষ্ণচন্দ্র বসুসহকারী এ-সকল কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাঁর বড় পৌরব “একলা যে, আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১২৭১ সালের ১লা অক্টোবর তাঁর ‘গভাব-শতক’ প্রকাশের ফলে ইরানী-কবি হাকিম বাতালী পাঠক-সাধারণের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়েছিলেন।

তাঁর প্রায় ১৩ বছর পরে (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে), ডাঃ গিরিশচন্দ্র সেনের ‘হাকিম’ (দীওয়ান-ই-হাকিমের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড,) আরপ্রকাশ করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘দীওয়ান-ই-হাকিম’ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং অধ্যাপক কাজী আকররহোমেনের ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে, —নজরুলের অনুবাদের অনেক পরে। গিরিশচন্দ্র সেনের মতো এঁরাও হাকিমের “অনুবাদ করেছেন ইংরেজী থেকে” নয়—মূল ফারসী থেকে।

২

গিরিশচন্দ্র সেনের ‘কোরান শরীফের তর্জমা’ প্রসঙ্গে আভোয়ার রহমান বলেছেন: “তাঁর (গিরিশচন্দ্র সেনের) প্রায় সমসাময়িককালেই আব্বাস আলী নামে একজন মুসলিম স্বধীও কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫—১৯১০) তিন খণ্ডে ‘কোরান শরীফ’ অনুবাদ ও প্রকাশ করেন ১৮৮১—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে; আর মওলানা মোহাম্মদ আব্বাস আলীর ‘কোরান শরীফ’ বাহির হয় তাঁর প্রায় সিকি শতাব্দী পরে—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। বাতালী মুসলমানদের মধ্যে কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক মওলানা মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২—১৯০৮); তাঁর ‘বক্তানুবাদিত কোরান শরীফ প্রথম খণ্ড’ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে; তিনি দশ পারা অনুবাদ করেন; দশম পারা ছাড়া শেষ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন। নজরুলের ‘কাব্যে আব্বাসারা’ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মোতাবেক ১৩৪০ বঙ্গাব্দে—“দীওয়ান-ই-হাকিমের অনুবাদ শুরু” করার প্রায় ১৩ বছর পরে। দু’টি নমুনা তুলছি—

বল, যে বিশ্বমিগণ, তোমরা যাহার
পূজা কর, আমি পূজা করি না তাহার।

—[মুহা কাককুন]

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম বিধা যেই?
পিতৃহীনে তাড়াইরা দেয়, ব্যক্তি এই।

—[মুহা বাউম]

এ কাব্যানুবাদ অভ্যস্ত পূর্বন। মূলের ভাবের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সংরক্ষণ করতে হয়েছে ব’লেই এর ভাষার এবং ছন্দে শৈথিল্য হয়েছে মাঝে মাঝে বারাতক।

২. নজরুলের ‘কবাইতাৎ-ই-ওমর বৈয়ান’ গ্রন্থের জুনিফার সৈয়দ মুকতদা আলী বলেছেন: “তিনি (নজরুল ইসলাম) কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ ‘আব্বাসারা’ বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হাসে সেটি প্রকাশিত হয়েছে।”—কিন্তু ‘হাসে’ অর্থাৎ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে ‘কাব্যে আব্বাসারা’র দ্বিতীয় সংস্করণ।—সেব্যক।

১৩৩৭ বৈশাখ নজরুল 'রুহাইরাৎ-ই-হাকিম' অনুবাদ শুরু করেন। তাঁর অনূদিত ১০টি রুহাই ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠের 'জয়ন্তী'তে প্রকাশিত হয়। উক্ত রুহাইদশকের কবির বহুত নিবিড় প্রতিমিপি 'নজরুল-রচনা-সত্যার' পুস্তকে শোভা লাভ করেছে। এ-ওয়েব শেষ রুহাইটি :

বু-রোভীয়ে মৌলভী কন্—

“পান করে এ শারাব বাগা,

বেবন মরে ভেমি ক'রে

গোরে পারে উঠবে তা'রা।”

ভাই ত আমি সর্বদা রই

শারাব এবং প্রিয়র নিবে,

কবর থেকে উঠবে সাথে

এই শারাব এই দিল-পিরাবা ॥

১৩৩৭ সালে কলকাতার 'শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স' নজরুলের 'রুহাইরাৎ-ই-হাকিম' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এ-পুস্তকের রুহাইগুলি “এখানে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বোহান্দী'তে—নজরুলের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে”—অন্য আভ্যন্তরীণ বহুবানের এ-ধারণা ডিঙিহীন।

১৩৪০ ক্রান্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষের মাসিক 'বোহান্দী'তে নজরুলের অনূদিত ৩৪র বৈরাবের ৫২টি রুহাই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'রুহাইরাৎ-ই-ওমর বৈরাব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রায় ২৬-বছর পরে—১৩৬৬ পৌষে, তাতে স্থান লাভ করেছে ১৯৭টি রুহাই। প্রথম রুহাইটি এই :

রাতের মাঁচল দীর্ঘ ক'রে আসল শুভ এই প্রভাত,

জাগো সাকী! সকাল বেলায় বোঁরাবি ভাঙে আবার সাথ।

ভোলো ভোলো বিবাহ-স্মৃতি। এমনি প্রভাত আসবে চেষ,

খুঁজে বোদের এইখানে কের, করবে করণ নয়নপাত।

কিন্তু মাসিক 'বোহান্দী'তে প্রকাশিত ১ নং রুহাইটির রূপ ছিল এই :

পূর্ণাশার ঐ মিহির হামে তিমির-বিদার কিরণ-স্তীৰ,

কাহ্নকসকল লাল পিরালার ধরছে বেশ বদ জ্যোতিব।

ভোরের গুহ বেলীমূলে ডাক দিবে কর বুঝাঙ্কিন্—

জাগো জাগো, প্রসাদ পেতে উয়ার ঘটের লাল পানির।

শেষেই দেখা যাচ্ছে, পরবর্তীকালে নজরুল তাঁর অনুবাদ প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করেন। রুহাইগুলি সজ্জিত করেন নুতনভাবে। যেমন, মাসিক 'বোহান্দী'তে প্রকাশিত ২ নং রুহাইটি গ্রন্থে হয়েছে ১২৮ নং রুহাই। মাসিক 'বোহান্দী'র ১৬ নং ও ১৭ নং রুহাই দু'টি হয়েছে গ্রন্থের সর্বশেষ

১৯৬ নং ও ১৯৭ নং রুবাই। গ্রন্থে কোনো কোনো রুবাইয়ের চরণ-বিন্যাসেও বদল হয়েছে। যেমন, মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত ৪ নং রুবাই গ্রন্থে হয়েছে ১৬২ নং রুবাই এবং এতে আগেকার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ যথাক্রমে হয়েছে দ্বিতীয়, চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম চরণ।

রুবাই ছন্দ:স্তবক (metrical stanza) বা পদবন্ধ বিশেষ, তাতে চারিটি পদ বা চরণ থাকে; তার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল হয়, তৃতীয় চরণ সাধারণতঃ অবিল (blank) থাকে। অধিবিশ কবি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড (Edward Fitzgerald : ১৮০৯—১৮৮৩) কারসী রুবাইয়ের এ গঠন-পদ্ধতি নজায় রেখেই ইংরেজিতে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের এক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ (free translation) বেনারীতে প্রকাশ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর Rubaiyat of Omar Khayyam প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে ৭৫টি রুবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং ছাপা হয়েছিল মাত্র ২৫০ কপি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তার সঙ্গে ৩৫টি রুবাই যোগ করে দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হয়; কিন্তু পরবর্তীকালে সে-সংস্করণের ১৪, ২৮, ৪৪, ৭৭, ৮৬, ৯৩, ৯৯ ও ১০৭ সংখ্যক রুবাই ৯টি পরিভ্রান্ত হয়। প্রত্যেক সংস্করণেই অনুবাদের ভাষায় কিছু কিছু অজস্মার্জনা করা হয়। আমরা আগে দেখিয়েছি যে, মজলল ওমরের ১ নং রুবাইটির যে অনুবাদ প্রথমে প্রকাশ করেন, পরে তার পরিবর্তন করেন। ফিটজেরাল্ডের প্রথম সংস্করণে এ রুবাইটির অনুবাদ :

Awake ! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the Stone that puts the Stars to Flight :
And Lo ! the Hunter of the East has caught
The Sultan's Turret in a Noose of Light.

চতুর্থ সংস্করণে (১৮৭৯) এর অনুবাদ—

Wake ! For the Sun, who scatter'd into flight
The Stars before him from the Field of Night,
Drives Night along with them from Heav'n, and strikes
The Sultan's Turret with a shaft of Light.

ফিটজেরাল্ডের মতে, ওমর-খৈয়াম ছিলেন বহুতান্ত্রিক ভোগবাদী (the material Epicurian)। অন্যপক্ষে যদিও নিকোলাসের মতে, ওমর খৈয়াম ছিলেন ছাফিজের মতো মরমী সুফী (mystical Sufi)। এই দুই মতের সমর্থকদের বিতর্ক অদ্যাবধি নিরসিত হয়নি এবং কোনোদিন হবেও না। ওমর খৈয়াম নিয়ে বলেছেন :

খাইয়াম কে খিমাহারে হিকমৎ বিনোখ্ত
দার কোরায়ে মাম কেভাখ ও দাগাখ বিনোখ্ত
সেকরাজে আখল্ তাদাব ওমরাখ্ চুবুরাখ্
দামাল কাজা বরাযগমাখ্ বৃক্বোখ্ত

বৈয়ান যে জামের ভাব করল সেলাই আত্মবিশ্ব,
অগ্নিকুণ্ডে পড়ে সে আত্ম নইছে মহন অসহন।
তাঁর জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু কাঁচি কাটিলো ছায়া,
মৃত্যুর সাথে বিলাস করে জাই নিয়তির দালালপন।

মূল্যের প্রতি সাধানুগারে অনূর্ণিত থেকে নজরুল এ অনুবাদ করেছেন। ডাব ও ছাল মূল্যানুগত বলে তাঁর অনুবাদ কোথাও কোথাও হরত কিছু আড়ষ্ট লাগে; কিন্তু বিদেশী কবিতার ভাষাতত্ত্ব কুলাপি মৌলিক সৃষ্টির মতো অসমবদ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “কবিতা লাঞ্ছক মনুর মতো এক ভাষায় অস্ত্রপূর থেকে অন্য ভাষায় অস্ত্রপূর আসতে গেলে আড়ষ্ট হয়ে যায়।” মারা নজরুলের “মৌলিক রচনার তুলনায় অনুবাদে অনূৎকম” বলা ব্যবহৃত, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এ-কথাটি ভেবে দেবতে পারেন।

১৩৬৯ পৌষের ‘পূবালী’তে ডক্টর গোলার সাকলায়েন ক্রমাইগাং-ই-ওমর বৈয়ানের “অনুবাদক হিসেবে কান্দি বোম, নরেন দেব, সত্যোদয় প্রমুখ কবির উল্লেখ করে জ্ঞান আভ্যাসার রহমানের মতে সার দিয়ে বলেছেন যে, “তাঁরা মূল কবিতার আভ্যাসের অনুসরণ করেন নি।” আভ্যাসার রহমান স্পষ্টতই বলেছেন : নজরুল ‘ক্রমাইগাং-ই-ওমর বৈয়ানের’ অনুবাদে “আশ্রয় দিয়েছেন সরাসরি কারসী আভ্যাসের” এবং “এর আগে কারসীর আর কোনো অনুবাদে ক্রমাইগাংয়ের আভ্যাস পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি।”

নজরুলের অনুবাদে প্রায় ৩০ বছর আগে, অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫—১৯১৮) “ওমরের অনুবাদ ও অনুসরণ” করে বাঙলা ভাষায় প্রথম কবিতা পরিবর্তন করেন। তাঁর অনুদিত ৮০টি ক্রমাই তিন কিস্তিতে, প্রথম ২৯টি ক্রমাই ১৩১১ বৈশাখে, ৩০ থেকে ৫৩ সংখ্যক ক্রমাই ১৩১৮ বৈশাখে এবং ৫৪ থেকে ৮০ সংখ্যক ক্রমাই ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯২ ক্রমাইয়ের অনুবাদ করেন এভাবে—

আর মুরাদো না, পাঁচ, নেলহ নয়ন।
প্রাচী-প্রান্তে কৃটে, কৃটে প্রভাত-কিরণ।
এলাকেশী মিলীপিনী পনায় তরাসে
অকলে কড়ায় তার ছায়া রতন।।

অক্ষয় বড়াল তাঁর অনুবাদে কারসী ক্রমাইর বিন্যাস (rhyme structure) বজায় রাখেন। তিনি একেত্রেও তাঁর প্রিয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেন। এটি গদ্যাক্ষর ছন্দ সৃষ্টির জন্য বৃহৎ অম্বা সন্ধিবেশ উপযোগী; কিন্তু কারসী ক্রমাইর ‘মিলিক’ ভাব, লব ‘চিউনার’ ও অগ্নিপূর্ণ ‘পান্দর’ প্রকাশের পক্ষে এ ছন্দ কতখানি অনুকূল সে পরীক্ষা অস্ত্রপূর আর কেউ করেন নি।

১৩১৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘জীবনমলিন’ প্রকাশিত হয়; জাতে ‘ক্রমাইগাং’ শিরোনামে ‘ওমর

বৈয়ান' থেকে ১৩টি রূবাইর অনুবাদ পরিবেশিত হয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে কবিত্তেজ্ঞানেন্দ্র প্রথম সংস্করণের ১১নং ও চতুর্থ সংস্করণের ১২নং রূবাই—

বনচ্ছায়ার কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র যদিরা, আর যদি তুমি, রাণী।
সে-বিজনে যোর পার্শ্ব বসিরা গাহ গো মধুর গান,
নিজন হইবে স্বর্ণ আবার, তুঁধি লভিবে প্রাণ।

সত্যেন দত্ত এখানে রূবাইর নিল-পদ্ধতি রক্ষা করেন নাই, তাঁর “প্রিয়া যবে পাশে” কবিতার ছন্দ—
যনুজ্যোপবিক রাজ্যবৃত্ত—ব্যবহার করেছেন, ফলে এর সঙ্গে লেগেছে মধুর গীতিকবিতার আবেদ।
কবিতার লোকচ্ছন্দ (folk metre) স্বরবৃত্তে ওবরের ৭৫টি রূবাই অনুবাদ করে কবিত্তেজ্ঞানেন্দ্র যোগ
১৩২৬ সালে তাঁর ‘রোবাইরাৎ-ই-ওবর বৈয়ান’ প্রকাশ করেন। তার ১নং রূবাইটি এই :

রাত পোহালো—তুন্হু সবি, দীপ্ত উষার রাজনিক ?
লাজুক তারা তাই তমে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক।
পূব-পগমের দেব-শিকারীর স্বর্ণ উজল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার দেখা উচ্চশির ॥

কাভি বোবের অনুবাদে তবক হচ্ছে দু’টি সমিল শ্লোকের (rhyming Couplet-এর) সমষ্টি,—তার
গঠনও রূবাইর ছাঁদ অনুসৃত হয়নি। কিন্তু সুপ্রচলিত স্বরবৃত্ত (Syllabic) ছন্দের চটুলতা ও
লাঙ্গাগতি তাঁর অনুবাদকে করেছে লোকপ্রিয়।^{১০}

অতঃপর প্রকাশিত হয় বিজয়কৃষ্ণ বোদ সাহিত্যবর কর্তৃক অনূদিত ‘রোবাইরাৎ।’ ১৩২৯ কাভিকের
‘সহচর’-এ এই অনুবাদখানির পরিচয়-দান প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

বাংলা সাহিত্যে ওবরের কাব্যসুধা শিক্ষকের তৃতীয় প্রয়াস বিজয় বাবুর ‘রোবাইরাৎ।’- - - তাঁর
অনুবাদের একটা বিশেষত্ব দেখি এই যে, তিনি ওবরের মূল কবিতাগুলি ও তার অনুবাদ পাশাপাশি
সাফিরে তাঁর অনুবাদের সৌন্দর্য বিচারের তার পাঠকের হাতে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছেন।
--- বিজয় বাবুর অনুবাদ অনেকাংশে প্রকৃত ওবরকে বজায় রাখতে পেরেছে। তাঁর সহজ প্রভা
তরল ছন্দের লব্ধগতি সকলকেই মোহিত করে। - - -

বিজয় বাবুর বইটি আমি দেখিনি। তিনি ১৩২৯ শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের ‘সহচর’-এ শেখ সাদীর
‘ওলিফা’ কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রূবাই ছন্দে ‘সম্ভতি-সংখ্যক চতুষ্পদী’ (tetrastrics)
লেখেন; তার ৬৯নং চতুষ্পদীটি এই :

৩. কাভেজার রূবায় বলেছেন : কাভি বোবের রূবাইগুলি “রাজ্যবৃত্ত ছন্দে অনূদিত।” বিজয়বাবু তার (১৮৮২
- ১৯১৩) তাঁর ‘ত্রিবেণী’ (১৯১২) কাব্যের ‘তুংবিকা’র ‘রাজ্য’ অর্থে ‘Syllable’ ব্যবহৃত এবং ‘মাত্রিক’ বস্তুতে
Syllabic বুঝিয়েছেন। কিন্তু লাত্যবৃত্ত রাজ্যবৃত্ত বস্তুতে কব্যবৃত্ত বা কব্যামাত্রিক (moraic) ছন্দ এবং কব্যবৃত্ত বা কব্যবৃত্ত
বস্তুতে বৌদ্ধগণ্যক Sylabic (মাত্রিক) ছন্দ বুঝানো হয়ে থাকে।—দেখক।

যে পাঠক। যদি পাঠ কর তুমি এই গুলিভাঁষানি,
 স্মৃতি' পরবেশে প্রার্থনা করো হইয়া বৃক্ষপাশি :
 কবি ও তাঁহার নিষোবা যেম লভে গো কল্পনা তাঁর,
 মর্যাদা যদি স্মৃতিরে তাঁর দিবে থাকে এর বাণী।

উক্ত চতুঃপদীগুলি প'ড়ে আবার ধারণা হয় যে, বিজয় ঘোষ তাঁর "Fitzgerald হইতে অনুদিত"
 'রোবাইয়াৎ' এই আঙ্গিকেই নির্মাণ করেছিলেন।

১৯৩৩ সালে (যে ১৯২৬) নবম্র মেঘের 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর বৈয়ান' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
 তিনি স্বরবৃত্ত, রাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মাঝা দ্বন্দ্বোচ্চ ৩২০টি শব্দক রচনা করেন। কিন্তু একটি
 শব্দকেও কবাইর ছন্দ-ছাঁচ অনুসরণ করেননি। তাঁর অনুদিত প্রথম কবাই :

আগো আগো, রাত কুবালো,
 তরুণ প্রাতের আঁশির আলো
 তাঁর হেনেতে নিশীধিনীর বৃকে।
 চাও গো সখি, চাঁদ-বধূয়া লজ্জামত বৃখে
 ত্রুতপদে পনায় যেম আসে।

পূব-আকাশের শিকারী ওই
 জ্যোতির ভালে চড়িয়ে নো সই
 স'-বহনের মিনার-ধানে
 ভসোয়াসে আসে।

ওমর বৈয়ানের কবাইর সংখ্যা অদ্যাবধি সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ডের
 Bodleian Library তে সংরক্ষিত ওমর বৈয়ানের কবাইরাত্তের যে প্রতিলিপি দেখে ফিটজেরাল্ড
 তাঁর অনুবাদ তৈরী করেন, তাতে ১৫৮টি কবাই আছে—সেগুলি ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে নিরাজে অনুদিত
 হয়েছিল। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার বৃদ্ধিত একটি দৃশ্যপ্রাণা সংস্করণে আছে ৪৩৮টি কবাই ; তার
 পরিশিষ্টে আছে আরও ৫৪টি কবাই। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীর একটি কপিতে
 আছে ৫১৬টি কবাই। বসিরে মিকোলাস্ তেহরানের একটি লিখোগ্রাফ কপি থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে
 যে পাঠ প্রস্তুত করেন, তাতে ৪৬৪টি কবাই রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এসব প্রতিলিপিতে অনেক
 প্রকৃষ্ট রচনা সংযোজিত হয়েছে। সে যা হোক, নবম্র মেঘ ৩২০টি কবাইর ডাকবস্ত সন্মত
 ক'রে বাঙালী পাঠকের চিত্ত তৃপ্ত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ওমর বৈয়ানের কবিতার
 "প্রধান ভিনিসটা বস্ত নয়, গতি।" নবম্র মেঘের রচনার সেই 'গতি' আশানুরূপ হয়েছে কিনা,
 তা রসজ্ঞের বিচার। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মজরদের অনুবাদ ছন্দ:প্রসাদে অধিকতর
 গভীর এবং সুন্দর দিক থেকেও অনেক বেশী নির্ভরশীল।

নজরুল 'যামপায়া, হামিঙ্গ এবং ওবর বৈয়ান ছাড়াও কিছু বিদেশী কবিতার ভাবানুবাদ করেছেন। ১৩২৭ নাম্বের 'বোসনের ভারতে' তাঁর 'বিরহ-বিধ্বা' প্রকাশিত হয়; তার প্রথম দু'চরণ :

কার তরে ? ছাট্টি এ পোড়ানুব

যায়নাতে আর দেববো না ।

সূর্য। রেণার কাজল হরফ

নয়নাতে আর লেববো না ॥

কবিতাটির নীচে পাদটীকায় লেখা আছে : "পুনতো ভাষার ব্যাতনারা কবি খুশখাল খান খটকের হিন্দুস্থানে নির্বাসনকালে তাঁর সহধর্মিণী-নিকিত একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে।"

৮-বৈশাখ ১৩৩৪-এর 'গণবাণী'তে নজরুলের সুবিখ্যাত 'অম্বর-নাশনাল সজীত' ছাপা হয়; তার ধূয়া :

জাগো—

জাগো অগশম-বন্দী, ওঠরে বড

অগতের লাহিত ভাগ্যহত ॥

২২-বৈশাখ ১৩৩৪-এর 'গণবাণীতে' প্রকাশিত হয় তাঁর 'জাগর-তুর্ঘ'—'শেলীর ভাব অবলম্বনে' লেখা।

এ দু'টি লেখার নীচেই রচনার স্থান ও তারিখ মুদ্রিত আছে : "কলিকাতা ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪।"

১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'সংগীতে' নজরুলের সুদীর্ঘ কবিতা : 'অগ্নিপথিক' প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শিরোনামের পাশে তারকা-চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ছাপা হয় : "হুইটম্যানের অনুরণনে।" (সংগীত, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'নজরুল ইন নাম' পুস্তকে বস্তুবা করেছেন : "দীর্ঘ ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক ছবক, প্রতি চরণ, কখনো বা শব্দ পর্যন্ত ভাষান্তরিত হয়েছে" (২৩ পৃ:) "অথচ তার স্বীকৃতি কোথাও নেই" (১৯ পৃ:)। এই বস্তুবো বলে হয়, উপরোক্ত পাদটীকাটুকু জমাব আলী আহসানের দৃষ্টিতে পড়েনি। বলা বাহুল্য যে, সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য এ-ধরনের খুঁটিনাটি বিবরণ লক্ষ্য করা দরকার; অন্যথা অনেক সময় গল্ফর্ম পরিশ্রমও প্রমাণিত হয় অসার। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুল সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণে আলী আহসান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন প্রচুর, যদিও তাঁর উপকরণের পরিমাণ স্বল্প। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, নজরুলের জীবন ও সাহিত্যিকর্ম সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য যত বেশী সংগৃহীত হবে, তাঁর রচনার বিচার ও বিশ্লেষণ তত বেশী সুবিচিত্র ও সারগর্ভ হবে।

আশার কবি

ডক্টর মাহমুদ হাসান

১৯২৬-২৭ সালের দিকে মজরুলের সঙ্গে আবার দেখা হয়। আমি তখন পুরনো মুল্লিম হলের প্রোভোস্ট। মুল্লিম হলে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় এত লোক হয়েছিল যে সমস্ত এ্যাসেম্বলি হলের কোথাও বিলুপ্ত কীক ছিল না। সভা কেবল শুরু হয়েছে এমন সময় একজন সাক্ষরী আকারের কুর্তা ও পারজানা পরা যুবক হাঁটিতে হাঁটিতে ভিতরে ঢুকলেন। কারও সঙ্গে একটি কথা কিংবা শুভেচ্ছা বিনিময় না করে তিনি একটি খোলা হারমোনিয়ামের সামনে বসলেন এবং গান গাইতে শুরু করলেন।

তখনও পবিত্র আমি মজরুলের নাম শুনিমি কিন্তু তাঁর গান গাওয়ার সুন্দর ভক্তি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। সম্পূর্ণ আত্মরপ হ'য়ে তিনি গান করছিলেন—আশাশের লোকজন সবচেয়ে যেম তাঁর কোন খেয়ালই নেই।

পরদিন আমি তাঁর নৈশভোজে আবার বাগান নিবন্ধন করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম তিনি অতিশয় লাজুক—কেবল গান গাওয়ার সময়টুকু ছাড়া। আর যখন তিনি গান করেন তখন তিনি তুলনাহীন। মজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে 'বিশ্রোহী কবি' বলে পরিচিত। অসংখ্য কবি এবং তথাকথিত 'বিশ্রোহী' বাংলায় যথেষ্ট ব্যাভিমান: সুতরাং মজরুল ইসলামকে যদি শুধুমাত্র ত্রৈলোক্য সাধারণ অর্থে একজন 'বিশ্রোহী কবি' বলে মনে করা হয় তবে সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয় বলেই আমার ধারণা। ইকবাল তাঁর অনেক কবিতার অভিযোগ করে বলেছেন যে তিনি কবি নয়—তিনি বলেছেন তিনি 'জীবনের গোপন রহস্যের গান করেন এবং বাণী দান করেন—জীবনের বাণী। মজরুল ইসলাম জীবনের কঠোর বাস্তবতা থেকে সুখ কিরিয়ে নেননি। নিজেকে তিনি সেই পাখীর সংগে তুলনা করেছেন যে কোন এক অজানা উর্ধ্বে উড়ে বেড়ায়: তিনি তাঁর কর্মের সাহিত্য জীবনে 'সত্য' ও 'চির-সুন্দর'র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুন্দরের ধ্যান তাঁকে কুৎসিতের ঘন সান্নিধ্যে টেনে এনেছিল—তিনি অভ্যাচারীর নির্বাসন, অবিচার ও জীবনের স্বার্থপরতাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সত্যিকারভাবে তিনি জনগণের কবি, তিনি তাদের নিগ্রহ ও নির্বাসনের অংশীদার হিসাবে সে-সবকে অনুভব করেছিলেন। সত্যিকার কবি আশার বাণী করে নিয়ে আসেন এবং তাঁর পাঠক ও শ্রোতার মনে সেই সাহস সঞ্চার করতে পারেন—না দিয়ে ভায়া

সকল পূর্ণ দূর্ঘণা ও আতঙ্কে অকুতোভয়ে বোকাবেলা করতে পারে। নজরুল ইসলাম তাঁর বহু কবিতা সমূহে সেই বাণীর আলোক জ্বলতে পেরেছিলেন যাতে দরিদ্র ও নিসূহীভেদা পেরেছে বাঁচার আশ্বাস, নৈরাশ্যপীড়িত পাঠক পেরেছে আশার সতীবনী। তাই আমি নজরুলকে “বিশ্রোহী কবি” বলি না, বলি ‘আশার কবি’।

নজরুল ইসলামের কবিতার একটা দিক এখনও তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করেনি—যেটা তিনি সত্যিকারভাবে দাবী করেন। বলা হয় যে রবীন্দ্র-সূর্য যখন কাব্যগগনকে পূর্ণ করে ছিলো সে সময় তিনি ‘ধুমকেতু’র মত উদ্ভিত হন। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি সানান্যতম অশ্রদ্ধা জানানোর ইচ্ছা আমার নেই—বীর সঙ্গে পরিচয়লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই মত নজরুল ইসলাম বাঙলা কবিতায় এক নতুন স্রবের সৃষ্টা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হিন্দী বৈকুণ্ঠ কবিতার বেশ খানিকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় : নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম অতি সার্থকতার সঙ্গে আধুনিক বাংলা-কাব্যে কায়দা গজলের প্রাণরস প্রতিষ্ঠিত করলেন—তিনি হাফিজ কিংবা অন্যান্য মহান গজল নির্ধিয়ে-দেয় অনুকরণ করেননি : তিনি তাঁদের থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে নতুন কাব্য সৃষ্টি করলেন—যা বাংলা সাহিত্যে অভিন্ন এবং মৌলিক, ছন্দে, সুরে, চিত্রকল্পে এবং সৌন্দর্যে যা অনন্য। আমার বাড়ীতে তিনি যখন তাঁর এই সুরের গজল ‘বাগিচায় বুনবুলি তুং কুলশাখাতে দিসনে আজি সোল’—গাইলেন আমি রোমান্সিত হয়ে উঠলাম। নজরুল ইসলাম ‘অনুকারক’ নন, সৃষ্টা—সত্যিকার সৃষ্টা। আমি দেখতে চাই পূর্ব বঙ্গের তরুণ কবিরা কাজী নজরুল ইসলামের মত মহান পারসী কবির সুর, ছন্দ, চিত্রকল্প ও প্রাণপ্রাচুর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শৈল্পিক দক্ষতায় মনুতন ধরনের কাব্য সৃষ্টি করবেন।

এই ক্ষুদ্র পরিসরে নজরুল ইসলামের সব কবিতা ও তার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ইকবালের সঙ্গে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গির এবং প্রকাশভঙ্গির আন্তিক মিল লক্ষ্য করা যায়। খুলী, ককর, মৃত্যু ও জীবন সম্পর্কে এবং হৃদয়ত উন্নয়ন, খালেদ ও কায়াল প্রভৃতি মূল্যবান বীরদের সম্পর্কে ইকবালের ধারণা ও রাজনৈতিক মানসিক ও আন্তিক ব্যাপার সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তা নজরুলের কাব্যে রূপলাভ করতে দেখা যাচ্ছে। নজরুলের আত্মশক্তি, দারিদ্র্য, জীবনের গান এবং হৃদয়ত উন্নয়ন, খালেদ এবং কায়ালের উপর লিখিত কবিতা ইকবালের কবিতার প্রতিরূপ বলে মনে হয়। যেমন ধরুন নজরুল তাঁর ‘আত্মশক্তি’ কবিতায় লিখেছেন :

জানিও জানিও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে বাজিছে রক্ত তেজ রবির।

উপর জোরপে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন “আমি আছি”—র।

করহ শক্তি-সুত্র-মন

রক্ত বেগনে উষোদন,

হীন রোদন—

ক্ষিণ-জম

সেখুঁক আত্ম-সবিতার তেজ বকে বিপুল ক্রন্দনীর।

বল, নাস্তিক হউক আপন মহিমা ঘোষারি’ উচ্চবীর।

কে করে কাহারে নির্বাতন
আত্মচেতন স্থির বধন ?
ঈর্ষা-রূপ
ভীষ-বাতন

পদাঘাত হানেন পঙ্করে ওধ্ আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
বহাপাণী সেই, সত্য বাহার পর পদাঘাত আনত শিব।

জাগাও আদিত্য স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে নির্বাতন চাম।
কে ভগবান ?
আত্ম-জ্ঞান !

গীত উদগাতা ঐকিক্ গান অগ্নিস্রব শক্তি-শ্রী।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, আমি না আশ্রয় কারো বাণীর।

ঈকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোতে এই চিন্তাধারাটি বহিঃসম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোন যাতায়াত ঘটেনি কিন্তু মজরুলের করাচীতে অবস্থান ও পারসী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর এই সমসাময়িক অগ্রজ কবির প্রতিও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকবে। বলা বাহুল্য। মজরুলের উদ্যোগে ঈকবাল জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিলেন।

মানার সুমিশ্রিত ধারণা চেতনা ও অবচেতনভাবে বুদ্ধ ও পরিত্যক্ত ঈকবালের সঙ্গে সৌন্দর্য ও সত্যানুসন্ধিৎস অধ্যবসায় এই যুবক বাঙালী কবির আর্থিক যোগাযোগ ঘটেছিল।

আমরা প্রাণশঃ সাধারণভাবে মুখে মুখে কবিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিঁ—তাদের কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করি না, তাঁদের কাব্যের রূপ, সৌন্দর্য ও বাণীস মতাকার মূল্য নিরূপণ করার ও এর মর্যাদা মেওয়ার প্রয়োজ্য মনে করি না। সেই সাধারণ প্রশংসার শিকার মজরুল হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের গভীরে বাওয়ার ও তাঁর সৃষ্টির মূল্য নিরূপণ করার কোন মতাকার প্রয়াস আজও পরি-
ক্ষিপ্ত হয়নি।

মজরুল ইসলাম আজও জীবিত কিন্তু সচিবহারা। দুঃখের কর্মজীবন থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। তবুও, জীবন ও মানুষের সম্পর্কে তিনি এমন স্রষ্টাশ্রুতাবে চিন্তা করেছেন যে সে যাবতের প্রচণ্ড চাপ তাঁর পক্ষে নির্বাহিত করা সম্ভব হয়নি। তাঁর ধর্মনী দর্শীভূত হয়েছে, তিনি মানসিক ভারসার্য হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের এই পরিণাম সম্বন্ধে তিনি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যুগের বহু দল হয়ে পড়ে পড়ে তিনি নিশ্চল হয়ে যাবেন—কোলাহলের উচ্চমাধে মানুষকে আর আগাধার চেষ্টা করবেন না। তিনি অবশ্য জানতেন যে তাঁর আত্মা অমর এবং তাকে হত্যা করাও সম্ভব নয়।*

অনুবাদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ

* ১৯৭২ সালের দৈনিক বিনি নিউজের ২৫শে মে, মজরুল জরুরী সংখ্যা থেকে গৃহীত।—সম্পাদক।

নজরুলের 'বিক্রোহী' প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ মাহ্‌কুজউল্লাহ

নজরুলের বিক্রোহী-চেতনা ও 'বিক্রোহী' কবিতার উৎস-সন্ধান করতে হলে তাঁর সাহিত্য-জীবনের পটভূমি এবং যদি-পর্বের দিকে আনাগোনা ফিরে তাকাতে হবে। মনে রাখতে হবে, নজরুলের যে-রচনাটি পাঠক ও সুবী-সমালোচক মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি কবিতা নয়, গদ্য। কিশোর-বয়সে গোঁড়ার দলেবর ততো গান রচনা করলেও, নজরুলের সাহিত্য-সাধনা সম্ভবতঃ গদ্য রচনা দিয়েই শুরু। কবির মূল-জীবনের সহপাঠী-বন্ধু প্রখ্যাত কথাসিঁদী শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ নুগোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা থেকে জানা গেছে, প্রথম জীবনে নাকি নজরুল লিখতেন গল্প, আর তিনি অর্ধাং শৈলজ্ঞানন্দ নামে লিখতেন কবিতা। যদিও পরবর্তী জীবনে নজরুল বাংলা-কাব্যে যুগান্তর আনেন এবং শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেন।

নজরুল কবি হিসাবে অনন্য কীর্তির অধিকারী এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগশ্রুটী-কবিরূপে স্বীকৃত, পন্ডিত। কথা সাহিত্য রচনায়ও তিনি তাঁর প্রতিভা এবং দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ নুগোপাধ্যায়ের, বলতে গেলে, কাব্যক্ষেত্রে কোনো স্বাক্ষরই নেই। তিনি যে এককালে কবিতা লিখতেন, এ তথাও জানা গেছে তাঁর স্মৃতিচারণার। নজরুল যে কথা-সাহিত্য রচনায় ও গদ্যলিখনে তাঁর সৃজনী-প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন সেটি কোনো কাকতালীয় কিংবা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আলোচনার শুরুতে যে বলেছি, নজরুলের যে-রচনাটি প্রথম সাধারণ পাঠক ও সুবী-সমালোচক মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি কবিতা নয়, গদ্য। একপাটি মনে রাখলে গদ্য রচনায় নজরুলের কৃতিত্বের উৎস ও কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

কৈশোরেই কবিতা রচনা শুরু করলেও, নজরুলের প্রকাশিত রচনা সর্বপ্রথম কবিতা নয়। ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সঙ্গীত'-এ প্রকাশিত 'বাউড়েলের আত্মকাহিনী'ই নজরুলের প্রকাশিত সর্বপ্রথম রচনা। যতদূর জানা যায়, নজরুলের এই গদ্য রচনাটিই প্রথম সাধারণ পাঠক ও সুবী-সমালোচক মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বক্তব্যের সমর্থনে শুধু এটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট যে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে বাংলা স্মৃতিচারণমূলক রচনা লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন যে, 'বাউড়েলের আত্মকাহিনী' পড়েই তাঁরা এর লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং এই লেখকের রচনাশক্তি তাঁদের মুগ্ধ করে।

বলছি, 'বাউড়েলের আত্মকাহিনী'ই নজরুলের পত্রিকার প্রকাশিত প্রথম রচনা। এর আগেও অবশ্য তিনি অনেক কবিতা ও গদ্য রচনা প্রকাশের জন্য পত্র-পত্রিকার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো প্রকাশের জন্যে মনোনীত হয়নি। 'সঙ্গীত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন:

‘সওগাত’ প্রকাশিত হবার প্রায় পরপরই (১৯১৮) নজরুল করাচী থেকে লেখা পাঠাতে শুরু করেন—প্রচুর লেখা। লেখার সঙ্গে থাকতো চিঠি—অনেকেই লেখা বাতিল হওয়ার পর ‘বাউঙেলের আত্মকাহিনী’ হাতে আগে ডাকের মাধ্যমে। গল্পটি ‘সওগাতে’ প্রকাশিত হওয়ার পর এর প্রতি অনেকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। মুসলমান সমাজের কোনো লেখক তখন ঐকমত্য ভাষায় ঐ ধরনের কিছু লিখতেন না, বা লিখতে পারতেন না। লেখাটি খুব উচ্চমানের যা হলেও, আদিক ও পত্তিনীকতার দিক দিয়ে অনেকের চোখে খুবই নতুন ঠেকলো। এর আগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন অজ্ঞাত - ‘বাউঙেলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশে বোধিত হলো তাঁর প্রথম আবির্ভাব। সাহিত্যিক মহলে তাঁকে নিয়ে শুরু হলো তরুণ্য। (সওগাত ও নজরুল ইসলাম, সওগাত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১)।

নজরুলের গদ্য রচনা ‘বাউঙেলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশের সাথে-সাথেই পাঠক ও সুখী-সবালোচক মহলের দৃষ্টি কতটা আকর্ষণ করেছিল, প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল মনসুর আচরদের স্মৃতিচারণা থেকেই মেনা দেখা যায়। ‘জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত: নজরুল ইসলাম’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

১৯১৯ সালের এক টুকুতে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে একদিন শায়তুদ্দীন (প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শায়তুদ্দীন) ও আমি মাসিক কাগজপত্র পড়ছিলাম। হঠাৎ ‘মোগলের ভারত’-এ কি ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র ঠিক বনে নাহি, ‘বাউঙেলের আত্মকাহিনী’ নামে একটি রস-রচনা পড়লাম। এক সঙ্গে দু’জনে উঠে বসলাম বিস্ময়ে। প্রশ্ন করলাম, কার লেখা এটা? তখন লেখার পেয়ে লেখকের নাম লেখার রেওয়াজ ছিল। লেখার পেয়ে লেখকের ছািবলদার কালী নজরুল ইসলাম, করাচী বসবাস। কোনো মুসলমান ভালো বাংলা লিখতে পারে - একথা তখন অবিশ্বাস্য ছিল। ‘বিদায়-সিদ্ধি’ বীর বোম্বার্ডার চৌধুরী লিখেছেন, এটা সেকালে অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কাজেই আমরা একাধিকবার সেই লেখা পড়লাম। কে এই নজরুল ইসলাম হতে পারে? বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই নাম তখন আমাদের খুবই হয়ে গেছে। অবশেষে দুই বছরে একমত হলো, যদি সত্যিই এট লেখক মুসলমানই হয়ে থাকে, তবে সে একদিন বাংলা সাহিত্যের একটা দিকপাল হবে।

[নজরুল-পরিচিতি, পৃ: ১১৩]

আবুল মনসুর আচরদের এই অতীত-দিনের স্মৃতিচারণায় তথ্যগত দিক থেকে কিছুটা ভুল আছে। নজরুলের ‘বাউঙেলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘সওগাত’-এ, ‘মোগলের ভারত’ কিংবা ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র নয়। ‘সওগাত’-এর কথা তাঁর আদমো মনে পড়েনি, যদিও তিনি বলেন, হঠাৎ ‘মোগলের ভারত’-এ কি ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র ঠিক বনে নাহি, ‘বাউঙেলের আত্মকাহিনী’ পড়লাম।” আবুল কালাম শায়তুদ্দীন যখন তাঁর স্মৃতিচারণায় এ-প্রসঙ্গে কোনো পত্রিকার নামই উল্লেখ করেননি, তিনি লিখেছেন :

তখন আমি আছি-এ জ্ঞানের ছাত্র—চাকা কলচে পড়ি। সাহিত্যের নেশার পাঠা পুস্তকের চাইতেও মপাঠা পুস্তক অধ্যয়নেই বনোবোগটা বেশী। আল-এসলাম, ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ ও আরও দু’একটি পত্রিকা করেকটি প্রবন্ধ তখন আমার বেরিয়েছে। মোট কথা,

সাহিত্যিক হবার কস্বত প্রাপ্যপণেই চলেছে। এমন সময়ের ঘটনা একদিন এক পত্রিকার একটা 'অন্তত লেখা' গোপে পড়লো। লেখাটার নাম : 'বাউগেলের আত্মকাহিনী'—লেখক : হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। লেখাটা এত সুন্দর লাগলো যে, এই হাবিলদার নজরুল ইসলাম কে তা জানবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। এর নাম আগে কখনো শুনি নাই। প্রথম লেখাই যার এত সুন্দর, পরবর্তীকালে তাঁর লেখা যে বাউনা সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবে, এ-ধারণা আমার মনে দৃঢ়বুল হয়ে রইল।—[পরিচয়-স্মৃতি : দৃষ্টিকোণ, পৃ: ২২৯]

আবুল কালাম শায়সুলদীন তাঁর আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণবুলক গ্রন্থ 'অতীত দিনের স্মৃতি'তে লিখেছেন :
 আবুল মনসুর আহমেদ তখন যখনসিঃচ বৃত্তান্তর ছলে থেকে গেলেও ঢাকার বাবে মনে আসত এবং আমার হোস্টেলেই উঠত। সে আসলেই দু'জনে মিলে সাহিত্যালোচনা ওক হতো। সম্ভবতঃ একবার গররের ছুটিতে দেশের বাড়ীতে একদিন রাতিক 'সঙগাত'এর এক সংখ্যা আমাদের হাতে এল এবং তাতে দেখা গেল, 'বাউগেলের আত্মকাহিনী' শীর্ষক একটি সুন্দর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের নাম দেখলাম হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। লেখাটা আমাদের এত ভালো লাগলো যে, হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম কে তা জানতে আমাদের অগ্রহ দূর্বীর হয়ে উঠল।—[পৃ: ২০-২১]

নজরুলের প্রথম-প্রকাশিত রচনা 'বাউগেলের আত্মকাহিনী' পাড় আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল কালাম শায়সুলদীন প্রমুখের মনে থে-আশাবাদ জেগেছিল, তা সত্য হয়েছে। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেকালেই পাঠক ও শুধী-সমালোচক মহলে এমন আশাবাদ জাগিয়ে তুললেও, তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা কিন্তু সাধারণ পাঠক ও শুধী সমালোচক মহলে তেমন বৈরাগ্যত করেনি, আশাবাদ জাগিয়ে তুলেনি। কিশোর কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের মনে ভাগেনি কোনো উচ্চাশা। নজরুলের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়—কবিতাটির নাম 'মুক্তি'। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা নজরুলের এই কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি :

রানীগঞ্জের, অর্জুনপাঠীর বাঁকে
 যেখান দিয়ে নিতুই গাঁৱ ঝাঁক ঝাঁক
 রাজাব বাঁধে জন নিতে যার শহরে বৌ কলস কাঁধে—
 সেঃ সে বাঁকের শেষে
 তিন দিক হ'তে তিনটে রাজ্য এসে
 ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিলে
 ডে-রাখার সেই 'দেখাওনা'-স্থলে
 বিরাট একটা নিঃ গাছের তলে
 জটওয়ারা সে সন্ধ্যাসীমের জটনা বাঁধত বেধা
 গাঁৱার ধরার পথের দোকের অঁতে হত বাখা

[মুক্তি]

নজরুলের 'বাউগেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সপ্তপাতি'এ, আর 'মুক্তি' ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীত মূলনয়ান সাহিত্য' পত্রিকায়। 'মুক্তি'র কবেরটি পংক্তি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখন পাশাপাশি উদ্ধৃত করা বাক নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা 'বাউগেলের আত্মকাহিনী'র কিছু অংশ :

'কি ভাষা! নিতান্তই জড়বো না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে ছো:। তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চারচিটেল! তুমি যদিও চান্দ আমার এক প্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি, আমার সে-সব কথাগুলো বলতে গেনন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ, খোঁদা আমার পরশ কলবার সময় মন্ত একটা গল্প ন'রে বলেছিলেন, কেননা চারজানি আমার ক'রে মিলেন হাতীর চেয়েও পুরো, ঘান প্রাণী করে মিলেন কাদার চেয়েও নরম। আর কাজেই দু'চারজন নজর নাগিয়ে আমার এই চারডায় মুণ্ডর বগালেও আমি পৌঁকে তা দিয়ে বলব, 'কুচ পরওয়া নেই।' কিন্তু আমার এই 'মাত্রোক' জানটার একটু আঁচড় লাগলেই জোট মেয়ের মত চোঁচিয়ে উঠবে। হোমার 'নিবানি মশ আনা' শুভ্রমেব নিলগুলো আমার এই মূল চর্মে যেক আমার সেওয়া ভিয়া আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু এখনই পাকড়ে বল, 'দাদা হোমার সকল কথা বলে বলতে হ'ল' তখন আমার অন্তরায় ধুক ধুক করে ওঠে, -- পৃথিবী যোয়ার ভৌগোলিক সত্যটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্বশ পুষ্প প্রস্কলিত হতে পারে বা ভোলাকী পোকা জ্বলে উঠতে পারে, তা আমার মত এই রকম শোচনীয় অবস্থার পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।' - [বাউগেলের আত্মকাহিনী]

পাশাপাশি দু'টি উদ্ধৃতির তুলনামূলক আলোচনার দক্ষা করা যাবে যে, নজরুলের কবিতার তুলনার ঠাঁর গদ্য রচনা সে-মলেই ছিল অনেকখানি পরিপূর্ণ। 'নেখাটি পূব উচ্চমানের না হলেও, আজিক ও গতিশীলতার দিক দিয়ে অনেকের চোখে খুবই নতুন ঠেকানো' এর মর্মান্তিক কারণও সবটুকু লেখা পড়লে সহজেই অনুধাবন করা যায়। শুধু 'বাউগেলের আত্মকাহিনী'ই না, নজরুলের সেকালের অন্যান্য গদ্যরচনা বিশেষ করে ছোট গল্প, কবিতা ও উপন্যাস ইত্যাদি পড়লেও বোঝা যায়, তাঁর কবিতার চেয়ে গদ্যশিল্প ছিল অনেক উন্নত। নজরুলের কবি-কল্পনা ও উপমা ব্যবহারের প্রবণতা এবং শক্তির কিছু পরিচর আরও 'বাউগেলের আত্মকাহিনী'তেই উদাহরণ:

যাকালকাক চোকররা নিতান্ত বেহাষার মত নিজে বৌ পছন্দ করে আনে। নিজের শরীর যে অবলুল কাঠের চেয়েও কাল বা কঁকাদো কাঠের চেয়েও এবড়োখেবড়ো, সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু নৌটির চওড়া চাই দস্তব মত দুখে আলতার বা, হরিণের মত নয়ন, অস্ত্রত পটল-চেবাত চাই-ই, সিংহের মত কটিদেশ, টাঁদের মত মুখ, কোকিলের মত কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর গমন, ব্রাহ্ম চরণ করল, কারণ মানভঞ্নের সময় যদি 'দেহ-পদপন্নর উদার' বলে তাঁর চরণ ধরে ধরা পড়ে হব আর সেই সব চরণ যদি গড় কর বিড (খোঁদা না করেন) গদ্যধরব পিঙ্গীর ঠাং-এর মতই পড় কাঠপায়া হয়, তা'হলে বেটাররা একটা আমার পাওরা হতে বঞ্চিত হব, আর বেটার বসন্তক হয়।

কবি আবদুল কামির লিখেছেন, '১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট তিনি (নজরুল) কবীর্ ক্যান্টনমেন্ট থেকে সাহিত্য পত্রিকার (বঙ্গীত মূলনয়ান সাহিত্য পত্রিকা) একটি সুদীর্ঘ গদ্য

ও একটি ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন এবং সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর এত বেশী লেখা ছাপাবার মতো জায়গা যদি পত্রিকাটিতে না থাকে তা' হলে এর বেকোনা একটি লেখা যেন 'সঙগাত' সম্পাদককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৩২৬ সালের কাতিক সংখ্যা 'বঙ্গীর মুগলমান সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশিত হয় তাঁর 'হেনা' গল্প। সেই গল্পটি পড়ে সবজন্মদার পাঠকেরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন যে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ শক্তির প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে।—[নজরুল-পরিচিতি]

এ পোকেও স্পষ্ট হয় যে, কবিতার মাধ্যমে নয়, গদ্য রচনার মাধ্যমেই নজরুল তাঁর স্বচ্ছন্দী প্রতিভার পরিচয় প্রথম স্বাক্ষরিত করেছিলেন। তবে, গদ্যরচনা হলেও, নজরুল যে মূলতঃ কবি এবং প্রতিভাবান কবি, তা এইসব গদ্য রচনাও চিনিয়ে দিয়েছিল সেই আদিপর্বেই। জানা যায়, নজরুলের 'বাখার দান', গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে সেকালেই অনেকে এই গ্রন্থটিকে গদ্য কাব্য আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। কোনো কোনো সমালোচক এম সফে চক্রে শেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভাস প্রেম'-এর তুলনা করেছিলেন। [স্মরণ্যঃ কথামিশ্রী নজরুল, বাজিয়া মুলতানা, পৃঃ-৭৮ - ৬৯]

নজরুলের 'বাখার দান', 'স্বিলেখর বেদন' ইত্যাদি গ্রন্থের গদ্য রচনাকে গদ্যকাব্য আখ্যায়িত করলে হয়তো ভুল হবে না। কেননা, এসব গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় কাব্যধর্মিতা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। নজরুলের আদি-পর্বের কবিতায় কিছুটা 'কবিত্বের' অভাব থাকলেও, গদ্যরচনায় নেই। কাব্য শব্দভাণ্ডার এই যে, নজরুলে কবি কল্পনা ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল গদ্য রচনার মাধ্যমে। কবির নিজের ভাষায়, 'আমার স্মরণ প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন।' - [আমার স্মরণ]

নজরুলের গদ্য রচনা যে সেকালেই গতিশীল, সজীব সাবর্ণীয় আর কবিত্বময় হয়েছিল, শুধু ছোটগল্পে নয়, তাঁর চিঠিপত্রের ভাষায়ও সে প্রমাণ আছে। ১৯১৯ সালে পত্রিক গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা নজরুলের একটি চিঠির ভাষা :

পারসীক কবি হাকিমের মধ্যে বাঙালির সবুজ দুর্বা ও জু'ই ফুলের সুবাস আর প্রিয়র চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু-গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে সবই তঁারি বাঙালি কথ্য, বাঙালী জীবনের অবিলম্বে অংশ, আমলবসের পরিপূর্ণ সমাবেশ। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি আর কোথায় আজকের গদ্য শিশির-ভেজা সবুজ বাঙালী। তারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের কল্যাণ পরিবেশে মৃত্যুসমালোচকের মধ্যে এসে এই যে চিরস্থায় প্রেমিক বনেব সবজীব আমি চাক্ষুষ কবনাম, আমার ভাষায়, আমার আপনাজন বাঙালীকে সেই কথা জানাবার আকাংক্ষা যথেষ্ট এই এক টুকরো কবিতা হয়ে কুটে বেরিয়েছে। আমি না, জু'ই ফুলের মৃদু গন্ধ ও দুর্বার শাসনতা এর মধ্যে কুটেছে কি না। তবু বাঙালীর সচেতন মনে মানুষের ডান-জীবনের এই একান্তবোধ যদি আগাতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে কবব।'

নজরুলের অল্পবয়সে লেখা এই পত্রের ভাষার অক্ষর উজ্জ্বল কিংবা কাব্যিকতা নেই, যাতে পরিণত মনের ছাপ, রচনার সহজ নৈপুণ্যের পরিচয়। নজরুলের গদ্য রচনা বিশেষ করে কথ্য-সাহিত্যের

মাধ্যমে শুধু তাঁর কবির শক্তি, কল্পনা প্রতিভা, আবেগ অনুভূতি ও রচনা নৈপুণ্যের প্রথম সার্থক প্রকাশই ঘটেছিল, বিদ্রোহী চেতনারও প্রথম প্রকাশ ঘটেছে। কবি আবদুল কাদির নিবেদিত :

১৩২৭ সালের বৈশাখে আকজাল-উল-হকের পিতা কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেহ ভারত' বের হয় ; তার প্রথম সংখ্যা থেকে নজরুলের 'বাঁধনহারি' নামক পত্রোপন্যাস বাংলা-বাহিরিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'বাঁধনহারি' বেশ হয় বাংলা ভাষার প্রথম পত্রোপন্যাস। এর অনেকখানি অংশ তিনি করাচী অবস্থানকালে রচনা করেছিলেন। 'বাঁধনহারি'র মূল ছিল প্রেমের বার্ষতা, সেই বার্ষতা শেষে রূপান্তরিত হয়েছিল বিদ্রোহে। পরিণত বয়সেও তিনি যে বন্ধনবোচন ও আত্মিক মুক্তিৰ কথা বলেছেন, তারও মাত্রাংশ এই উপন্যাসখানিতে পাওয়া যায়। এই পত্রোপন্যাসে 'সাহসিকার' এক সুদীর্ঘ পট্রে যে বিদ্রোহের বর্ণনা আছে তারই পূর্ব প্রকাশ পরবর্তীকালে তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় দেখা যায়। [নজরুল পরিচিতি, পৃ ৬-৭]

এই বন্ধনবোচন সত্যতা : 'সাহসিকার' পত্রের আংশিক উদ্ধৃতি থেকেই অনুশ্রবণ করা যাবে বলে মনে কবি। 'সাহসিকার' পত্রের আছে :

'নুরুন্নে গ্রন্থার বিদ্রোহী বলে তোরা তব হয়েছো বা শুন হয়েছো পেয়ে আমি তো আর চেয়ে বাঁচিয়ে কো। নুরুন্নে গ্রন্থার বিদ্রোহী হল, আর অমনি গ্রন্থার সৃষ্টিটাও তার হাতে এসে পড়লো আর কি! এখন ওর কাঁচা বয়েস, গায়ের আর মনের দুই-একট শক্তিও বখেই, তার পরনে ওফান উন্গাদ বোশনের রক্ত ছিন্নোল বা শুন তোনা তাঁপ উদগতিতে ছুনোছুটি করছে, তার ওপর আবার এই স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃংখল পাশনচাকা সে, অতএব এমন রক্তের চেয়ে আমি পরনে সে কত আরো অসহন সৃষ্টি-ছাড়া কথাই বলবে। এখন সে হয়তো অনেক কথা বুঝেই বলে, আবার অনেক কথা না বুঝেই শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসেই বলে ফেলে। এটা ভুলিসনে যেন, রেবা, যে এ-ভেলে বাংলাতে ভণ্ডা নিলেও বেদুইনদের দুরন্ত মুক্তি পাপলাসি, আরবীদের মস্ত গোলা, তুর্কীদের বন্ধ-তুফা ভীর খোঁতাধেখের মত ছুটছে এর ধননীতে ধননীতে। অতএব এ-সব ছেলেকে বুঝতে হলে এদের আদত সত্য কোন্‌খানে, সেইটাই সকলের আগে বুঝে বের করতে হবে। এত বড়বে বর্ব, তার ওতো সামাজিক সত্য, নৈতিক সত্য, সাময়িক সত্য ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের না বাইরের খোঁস-খোঁস রয়েছে, তাই বলে কি এইসব অনিত্য সত্যকে বর্বের চিরতন সত্য বলে ধরতে হবে। ...প্রত্যেক বর্বই সত্য--শিশুত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোন বর্বকে বিচার করতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান-শৃংখলা দিয়ে কর্তনো বিচার করবে না...তেরনি মানুষকে- তার চির অমর আত্মাকে তার সত্যকে বুঝতে হলে তার অস্তর সেউনে প্রবেশ করতে হবে তাই। তার বাইরের বিধান আচার-ব্যবহারকে সত্য বলে ধরব কেন? ...হয়তো আমি কথাগুলো বেশ জড়িয়ে বলতে পারছিনে, আর পারবোও না, কেননা, আমার মনের যে শান্তি বৈধা নেই।' এই উক্তি, এই প্রত্যয়খানি তো এদের সত্য। অতএব এদের বড় এমনি করে আবারে বিনাশ না করে তাদেরই একজন যদি সত্যকে পাবার জন্য নিজের মতুন পথ কেটে দেয়, তবে এরা লাগি-

পৌচা নিয়ে যে তাকে ভাড়া করবেই ; কিন্তু নির্বীর্ষের বত একজন সত্যানুযায়ী বিদ্রোহীকে ভাড়া করার বত শক্তি এ নিখুঁত উত্তরের যে বিলকূল নাস্তি।

আমরা জানি, নূর কবি নজরুলেরই ডাক-নাম। কাজেই বুঝতে বিশুদ্রাও সম্ভব হর না যে সাহসিকা তাঁর পক্ষে অর্বাং নজরুল তাঁর এই রচনার নিজের বিদ্রোহী চেতনা এবং মনোভাবের কথাই নির্বেছেন। এ-থেকেই বোঝা যায় যে, 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার অনেক আগেই তাঁর মনে এই চেতনা ও মনোভাবের জন্ম। এ-থেকে আরেকটি সত্যও উদ্ভাসিত হয় যে, নজরুল কবি মোহিতলাল মজুমদারের গদ্য রচনা 'আরি' পড়ে তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেছেন—মোহিতলালের এই দাবী কত ঠুনকো। আবদুল মান্নান সৈয়দ যে লিখেছেন, “প্রসঙ্গতঃ মোহিতলাল যে-দাবী তুলেছিলেন, 'আরি' কথিকা থেকে 'বিদ্রোহী' উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে তাঁর প্রাপ্য অনেক উড়িয়ে দিয়েছেন একেবারেই। কিন্তু কবিমানসের যে-পর্যায়টিকে বলা যায় 'প্রেরণার উৎসভূমি' সেই প্রাণনা সেপে মোহিতলালের কথিকাটি নজরুলের 'বিদ্রোহী' ফলাতে সহায়তা করেছিলো—এতে আরি কোনো সম্বন্ধ দেখা না। নিশ্চয় মোহিতলালের অভিপ্রায় থেকে নজরুলের উৎকাতঙ্ক আলাদা হ'রে গেছে ; তবু প্রাথমিকভাবে 'বিদ্রোহী'র জন্ম নজরুলের মানসজগতি তৈরী করেছে এ রচনাটি।” [দ্রষ্টব্য : বিদ্রোহী : এক ভাষা, দাবীস্বরী ইন্ডেক্স, ১৮ই ভাদ্র ১৩৮৪]

এই বস্তু এবং বিশ্লেষণ যৌক্তিকতা ও ভাবগর্ভ হারায় নাকি? 'সাহসিকার' স্মরণীয় পত্র এবং 'বিদ্রোহী' মিলিয়ে পড়লে বরং এটাই স্বাভাবিক মনে হর যে, তাঁর এই গদ্য রচনাটি 'বিদ্রোহী'র উৎস। নজরুলের কবিত্বশক্তি, রচনা নৈপুণ্য আর বিদ্রোহী মানসচেতনার আদি উৎস সন্ধান করতে হলে তাঁর গদ্য রচনা অবশ্যই পড়তে হবে, জানতে হবে কবির জীবনের বাস্তব প্রতিভার কথা। কিন্তু সত্য এই যে, নজরুলের কবিতা সম্পর্কে যত আলোচনা-সমালোচনা হয়, তাঁর গদ্য রচনা বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর খণ্ডাংশও নয়। অথচ নজরুলের কবিতায় ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা, বক্তব্য-প্রকাশের ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প তাঁর গদ্য-রচনা থেকে প্রচুর এসেছে। গদ্য রচনার বর্ষকথাকেই তিনি বহুক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন।

নজরুলের বিদ্রোহী মানস চেতনার উৎস ও আদি পটভূমি সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোকপাত করলাম। এবার দেখা যাক তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার পটভূমি কি। নজরুল-সাহিত্যের সাধারণ পাঠক, এমনকি অনেক সুখী-সমালোচকেরও ধারণা 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে নতুন যুগের সূচনা। 'বিদ্রোহী কবি' হিসাবে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের বিশেষ-পরিচিতি এবং সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের পটভূমিতে এই কবিতাটির স্বাতন্ত্র্যই এ-ধারণার প্রধান কারণ। 'তাহাড়া নু' একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচকের বস্তু্যও এমন ধারণার মূলে কার্যকর। উল্লেখ্য হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর নজরুল-সম্পর্কিত একটি রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা বেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন :

কৈশোরকালে আরিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্বোধন, যা থেকে বেক্ষার ইচ্ছটাকেও মনে হ'তো—বেন রাজহোমের শাবিন, আর সত্যেন্দ্রনাথের তত্ত্বাভরা নেশা, তাঁর বেলোহাটী

আওলাকের বানু—জাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেল বাংলা কবিজগৎ; অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলতে ডাবতে পারলো না—বড়দিন না ‘বিদ্রোহী’ কবিজগৎ নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ ক’রে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছেলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের বার্ষিকাল ডাঙলো।—[রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্যচর্চা, ১৪৪-৪৫]।

বৃহৎসং বছর এই কল্পপট্টি ও আলোচিত প্রবন্ধটি পড়ে অনেকেরই মনে এমন ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, ‘বিদ্রোহী’ কবিজগৎ ‘নিশেন উড়িয়েই’ নজরুল ইসলাম প্রথম এসে পৌঁছেছিলেন অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং এর কলেই ‘প্রথম রবীন্দ্রনাথের বার্ষিকাল ডেঙেছিল।’ সত্য বটে, ‘বিদ্রোহী’র আবিষ্কারণ রবীন্দ্রনাথের বাংলা কাব্য সম্পূর্ণ নতুন নিরে আসে, এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই কবিজগৎ পত্রিকার (প্রথমে সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে এবং পরে অন্যান্য পত্রিকার) প্রকাশের সঙ্গে সাথেই ব্যাপকভাবে পঠিত এবং সুবী-সমালোচক মহলে আলোচিত-সমালোচিত হয়। এ-সম্পর্কে ‘নজরুল-রচনাবলী’র সুদক্ষ সম্পাদক, নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদির লিখেছেন :

‘মাত্র দু’বছর আগে যিনি লেখক মহলে দেখা দিয়েছেন, সেই বাইশ বৎসর বয়সে তরুণ কবির খাতে ‘বিদ্রোহী’র মতো প্রাণবন্ত কবিতা বের হওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ভয়ের স্বপ্নভঙ্গ’ পাঠকের শ্রবণে আনে বেগমতী শ্রোতৃবীর উপলব্ধত কলম্বসি, কিন্তু নজরুলের ‘বিদ্রোহী’তে রূপান্তরিত হয়েছে উদ্দাম প্রাণশক্তি, অকুণ্ঠিত উজ্জ্বল। সবিল মুক্তক স্বাভাবিক মাত্রাবৃত্তে ‘বিদ্রোহী’ প্রথমে সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে, পরে ১৩২৮ সালের কাটিক সংখ্যা ‘মোসলেম ভারতে’ এবং তারও পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘ধুনকেতু’তে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘প্রবাসী’ মাসিক ‘বঙ্গমতী’ সাধনা’ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় কবিতাটি সংকলিত হয়। ‘উষোদয়’ ‘ইসলাম’ প্রভৃতি পত্রিকায় নানা ধরনের আলোচনা হয়ে সারাদেশে ও সকল মহলে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। কবি শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ‘বিদ্রোহী’র জুড়ে ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘মোসলেম ভারতে’ ‘বিদ্রোহী বীর’ নামে সুদীর্ঘ কবিতা লিখে নজরুলকে অভিনন্দিত করেন। পক্ষান্তরে ‘বিদ্রোহী’র বিপরীত বেক থেকে ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা ‘সঙগাত’এ কবি গোলাম বোস্তকা সেই জুড়েই লেখেন ‘নিয়ন্ত্রিত’। [নজরুল-পরিচিতি, পৃ: ১০-১১]

‘বিদ্রোহী’ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি এবং আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলেছিল সত্য; কিন্তু নজরুল তাঁর ভাষার ও জুড়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কবিতা নিয়ে পাঠক ও সুবী সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং অভিনন্দন লাভ করেছিলেন ‘বিদ্রোহী’ রচনা ও প্রকাশের আগেই। ‘বিদ্রোহী’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের ‘বিজলী’তে। অন্যপক্ষে নজরুলের ‘শান্ত-ইল-আরব’ ২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ‘মোসলেম ভারতে’ এবং ‘কোরবানী’ ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা ‘মোসলেম ভারতে’ প্রকাশিত হয়। ‘বিদ্রোহী’র আগে রচিত ও প্রকাশিত এসব কবিতাও পাঠক-সমালোচক-মহলে আলোড়ন আণার ও অভিনন্দিত হয়। নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রখ্যাত ছাপসিক কবি ও সত্য সমালোচক মোহিতলাল বহুসদার বেকান্দেই লেখেন :

মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চবৎকার। কিন্তু বাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিরাছে তাহা আপনার পত্রিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিবুল্লাহ কাদী নজরুল ইসলাম

সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িরা এত আনন্দ পাই নাই। এমন প্রশংসার আবেশ অনুভব করি নাই। বাংলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে স্বন্দরী ও শক্তিশালিনী—এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার বনোগৃহে অনুলাভ করিয়াছে তাঁহার নিঃসঙ্গের প্রমাণ, তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে, তাঁহাকে বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সন্ধ্যা আনাইতেছি এবং আমার বিশাল, প্রকৃত সাহিত্যানোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই স্তবের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। বাঙালির কবিমানকেও আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, নলর সমীরণের অভাবে বাজলী বীজন চলিয়াছে। বাংলা কাব্যলক্ষীর ভূষণ-সিকন, তাঁহার নটিনীলাখন নৃত্য ও লীলা ও নৃপুংস নিকন মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন কৃত্রিম নিয়ম শৃঙ্খলিত নীরব কঠিন শাতুর আওতা মানব-কণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগম্বীর জীবনোন্মাসময় স্বর-বৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে, অসংখ্য কাব্যরসমাত্র বহিষ্ঠ অসার অপসারণ কবি-বংশ প্রাণীক বিম্লিষ গরে বাংলা কাব্যে অকাল-সঙ্কটের অবসাদ নির্জনতা সূচিত হইতেছে। আপনাব প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হিলু কবির বিমিশ্রবনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের যে দুইটি কবিতা (যনাত্তি পড়িবার মৌজায়া হয় নাই) পড়িলাম তাহা যারা 'বোসেনের ভারত'-এর গৌরব রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে।

কাজী সাহেবের কবিতায় কি অপেক্ষিত বসিব? বাংলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-আংকার ও বর্ণনা বৈচিত্র্য এককালে মুক্ত হইয়াছিল কিংবা অবশেষে নিরতিশর আলোড়িত হইয়া যে স্বন্দরী নিখাদ্রপিণীর উপর নিঃসৃত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-আংকার আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় পল্লভবমণী কণ্ঠ ভারতীর ভূষণ না হইয়া প্রাণের আকৃতি ও হৃদয়ঙ্গমের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ-প্রীতিকর প্রাণহীন চাক-চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার ছন্দ-নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলিয়া মানব-কণ্ঠের স্বর-সম্পদের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্পোনমীর যবনাস্ত্রাবী প্রমাণ-ভঙ্গী। 'বেদ্যপারের তরণী' নীচক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূঢ়তঃ এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্যে প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে, ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবনীলা, স্বাধীন স্ফুটি, অবাধ আবেগ, কবি তাহাকে কোথাও হারাইয়া বসেন নাই। ছন্দ যেন ভাবের স্তম্ভ করিতেছে, কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লংঘন করেন নাই। এই কবিতাগুলিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে শব্দে ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বীজনে বাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশৃঙ্খল এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্বীর অতিপ্রাকৃত কহনার সুর পলক-বিন্যাস ও ছন্দ-আংকারে মুতি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব :

আবুকের উসমান উমর আলী হাইলর
বাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই উর!
কাণ্ডারী এ-তরীর পাকা মাঝি মালা,
বাঁড়ীমুখে লাবিগান 'লা-পরীক আলাহ'।

এই শ্রোকে বিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং পঙ্খীক স্বনি, আকাশে ধন্যমান বেদপুস্তক প্রলব্ধ-
 উচ্চ-স্বনিকে পরাভূত করিয়াছে, বিশেষ এর শেষ ছত্রের শেষ বাক্য 'সা-শবীক আল্লাহ'। যেমন
 বিন ভেরনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দেব অধীন ছইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী
 বাক্যবোজনা বাংলা কবিতার কি অভিনব স্বনি গাথ্রীৰ লাভ করিয়াছে।-- ['মোসলেব ভারত'
 সম্পাদককে লেখা মোহিতলাল বহুদায়েব পত্র থেকে ।]

উপরোক্ত পত্রই প্রমাণ করে 'বিদ্রোহী' রচনা ও প্রকাশের আগেই নজরুল তাঁর 'বেরাপায়েব তরবী', 'শাভ-
 ইল-আরব', 'কোরবানী', 'মোছরর', 'বাদল প্রান্তের শবাব' ইত্যাদি কবিতাবলি রচনা কিভাবে স্তবী-সমালোচক
 মহলে সমাপ্ত হয়েছিল। নজরুলের কবিতার ভাবে ভাষার ভূমি ও প্রকাশরীতিতে নতুন সৃষ্টি হয়ে
 গিয়েছিল 'বিদ্রোহী' রচনার আগেই। বুদ্ধদেব বহু তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থের আরেকটি স্মৃতিচারণমূলক
 রচনা 'নজরুল ইসলাম'—এ লিখেছেন :

'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অকরে মাসিক পত্রে—মদন ভট্টাচার্য্য এমন কবিতা পড়িনি। অসম্ভবোপায়
 অগ্নিদীপক পরে সমস্ত মনপ্রাণ বা কাৰণ করছিলো, এ-বেদ ভা-ই; দেশপাণী উদ্দীপনার এ-ই
 মেন কাণী। একজন মুসলমান যুবকের সতে পরিচয় হলো, তিনি সমগ্রটি কনকাতা থেকে
 এসেছেন, এবং তাঁর কাছে কী ভাষা! কী বিস্ময়! একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী
 কবির আরো অনেকগুলো কবিতা। নোয়াখালির সাক্ষী নদীর আশায়া বংশিকিত বর্ষাক্ত
 মন্ডীতীরে বসে সেট খাতাখানা আদ্যন্ত পড়ে ফেললুম। তাঁর মধ্যে ছিল 'ওয়ে, হত্যা নয় আজ
 সত্য-গ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কারাল পাখা', আর কী ছিলো মনে পড়ছে না। সে সব
 কবিতা অচিরেই ছাপার অকলে দেখা যেতে লাগলো, আর তাঁদের প্রবলতা আনন্দের প্রশংসা
 করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিল।" (পৃ: ২০)

বুদ্ধদেব বহুর এই স্মৃতিচারণ পড়ে অভাবতই ধারণা হয় যে, নজরুলের 'কোরবানী' কবিতাটি (যার
 শুরু 'ওয়ে হত্যা নয়, আর সত্য-গ্রহ শক্তির উদ্বোধন') বৃষ্টি 'বিদ্রোহী'র পরে পত্রিকার প্রকাশিত
 হয়। অথচ প্রকৃত ঘটনা এই যে, 'কোরবানী' কবিতাটি প্রকাশের ('কোরবানী' ছাপা হয়েছিল ১৩২৭
 সালের 'মোসলেব ভারতে') পরে অর্থাৎ ১৩২৮ সালের ২৭শে পৌষের 'বিজলী'তে বিদ্রোহী,
 প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং সম্ভবতঃ পত্রিকা থেকে বুদ্ধদেব বহু যে মুসলমান যুবকের কথা
 বলেছেন তিনি এমন কবিতা তাঁর বাঁধানো-খাতায় তুলেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে বহু প্রতিভাবান কবিই অনেক উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় কবিতা লিখেছেন।
 সেসব কবিতা পাঠক এবং স্তবী সমালোচক মহলে সমাপ্ত, আলোচিত-সমালোচিতও হয়েছে। কিন্তু
 নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার মতো এমন শাপক আলোড়ন সম্ভবতঃ আর কোনো কবিতাট সৃষ্টি
 করেনি। প্রকাশের সাথে সাথে এমন আলোচিত সমালোচিতও লোভ হয় হয়নি। একটি কবিতার
 প্রায় একই সময়ে একাধিক পত্রিকার আয়প্রকাশ এবং বহু পত্র-পত্রিকার পুনরুদ্ভবের ঘটনাও 'বিদ্রোহী'
 ছাড়া অন্য কোন কবিতার ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা বলা কঠিন। কবি আবদুল কালামের ভাষায় '১৩২৯
 সালের কাভিক মাসে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রবরামান' 'বিদ্রোহী' 'ধুবকতু'
 'কারাল পাখা' 'মানোয়ার' 'বেগ ভেরী' 'শাভ-ইল-আরব', 'বেরাপায়েব তরবী' 'কোরবানী' 'মোছরর'

প্রভৃতি কবিতার জন্য তাঁর প্রথম সংস্করণ অতি অল্প দিনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা ভাষার দার কোন কাব্য পাঠ্যের খের হতে না হতে এত সমাদর লাভ করেনি।

‘বিদ্রোহী’ প্রকাশের অনেক আগেই ‘ভাষে-ভাষায় ও ছন্দে নতুনত্বের জন্যে নজরুলকে প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বোহিডলাল নজরুল। আর ‘অগ্নি-বীণা’ প্রকাশের সাথে সাথেই এ-গ্রন্থের সালোচনা প্রসঙ্গে নজরুলকে ‘যুগ-প্রবর্তক কবি’ অভিধায় অভিহিত করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ মূলক রচনা ‘অতীত দিনের স্মৃতি’ গ্রন্থে লিখেছেন :

এর কিছুদিন পাবে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নি-বীণা’ প্রকাশিত হয়। নজরুল ‘বোসনের অগতে’ সমালোচনার জন্য একটি কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। ‘অগ্নিবীণা’র সব কবিতা আমার আগেই পড়া ছিল। কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই ‘বোসনের অগতে’ দুই কনব্যাঙ্গী এই সমালোচনা বেঙ্কলো। ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যের প্রথম সমালোচনা ছিল এটাই। এর পক্ষে সপ্তাহে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত ‘বিজলী’তেও এর এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ‘বোসনের অগতে’ এর সমালোচনার আরি নজরুল ইসলামকে যুগপ্রবর্তক কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। বলেছিলেন, আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইসলামই তৃতীয় যুগ-প্রবর্তক কবি।

হারানো মানিক

লক্ষ্মী ছোলে তাই তোলে !

নজরুল ইসলাম

ঘরের আড়াল ভেঙে এবার বাহির ভুবন লুইতে চাই,
জীবন ট'ল জেল করেদী আড়াল টেনে সর্বস্বাই।
নিমেষ বাধা বেনে বেনে বুকের তিউর ধরল নয়,
পাঁচার চেয়েও হলার অধর, সড়ো রাতে চলতে উর।
ভেঁতুল গাছে জোমাক ঘূলে, যা বলে, "দেখ দেখ খোঁকম,
'সত্ব-চৌধুর বা' জাকার ঐ, চালুর ক'রে ধ'রবে 'বন।
তাল-তলাতে যাসুনে বাবা, 'একানোড়ে' ভুত থাকে,
বেল গাছে রয় বেকসোভা—বাড় ভেঙে যায় পায় থাকে।"
রাত্রিরেলা ডাকলে পেঁচক কুকো পাখী ভুত ভুতুর,
না বলে, ঐ বাচ্চা ভুতের শুনেই বাটার কানার ঘুর।
দুপুর বেলা ঝুলি-কাঁধে ঢেলে-ধরায় দল বেড়ায়,
ছুজতে সে যেখান-সেখান, একলা পেলেই গিলতে চায়।
তনের তিউর ? বসিলু নে যার। বালু-মাথা জল-লানো,
নারলে ভলে অগ্নি গপসি। 'অরপরে বাড় বটিকানো।
গোরখানের পাশ দিয়ে বাসু—বান্দো-ভুতের বাড়িটা যে।
বশান-বাটার ঘেত পেদী মানুস ধ'রে বাড় তাকে।
মাঠের পথে বাসুনে বাবা একটু একা দ্বেবে বেই
নাওড়া গাছের শাঁক-চুনি ধরবে ঠেসে-রকে নেই।
উপর পানে স্রকাসুনে বাপ, উড়ছে সলাই জিঃলরী,
বাটিয়া-মতেড ঠিকিয়ে নেবে কদ-কাটা কিগুরী।
ভুত-কেহেহু আর শিলাচ বকিস্ বকি লামর লশটা দিক
অলকো সব আগুনে আজ, জাললে বাজও বেই মানিক।

অমনি ক'রে মোদের মহৎ জীবন শুরু ; চনতে তাই—
 এক পা মেতেই দু'পা পিছোই তিনবার তায় হোঁচট খাই ।
 সীতার খালেদ প্রতাপ কামাল নেপোলিয়ন ওয়াশিংটন
 এই করে কি জন্ম নেবে ? ক'রবে দেশে বীর সন্ধান ?
 শৌকার বৃকে বাসা বাঁধে যে ভূত, তাহার সিংহাসন
 অক্ষয় হয়, রাজ্য চালায় খোশ্‌হালে সে ভরস্কাইন ।
 গৌকার গাধী পেবিয়ে যখন ছ'লাম বালক, আবেশ ভূত
 পাণ্ডিত বশাই রক্তনেত্র ধরেম বেত্র-যবের দূত ।
 মাদের চোটে জ্ঞান যা ছল তার চাপে হায় সব সাহস
 শরীর ছেড়ে বিদায় নিল, শুধু হ'ল প্রাণের রস ।
 যেমনি ছ'ল কিশোর বয়েস, অমনি অভিভাবক হল
 বকেন যত বাঁধেন তত নানান ছাঁদে লেন আগল ।
 ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে নয়ন-তাঁদের নিছাইন,
 ছেলেদ শরীর চুপুশে গেল । দেখই বাপু, রও দু'দিন,
 দেখেনে ছেলে লক্ষ্মী কেমন, হোক না এখন হাড়ি সাব,
 আস্তে কথা, নেইক হাসি, বধূব মত লজ্জা তাব !
 যেই দেখে সে শুকজমে, অমনি মাথা হয় নীচু,
 মাথা-মাথির ধাব ধাবে না—গোলমালে রয় সব পিছু ।
 চরিত্র তাব ? সোনার ছেলে, পড়ায় যবের বাইরে তায়
 পুরুষট হায় পায় না দেখা, এমন ছেলে কখন পায় ।
 যৌবনে সে বীর ছ'ল যা দেশের গবন ? মাঝ কোণে
 বিশ কচনে ভুলে পাইন ? লক্ষ্মী ছেলে তাই তো । *

*আশুতোষ হক নাথের দৌলতদাস গ্রন্থ । শিঙের পত্রিকা 'শিঙ মাস'র দ্বিতীয় সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত
 হয়েছিল । এই সংগ্রাহক জনাব আশুতোষ হকের বড় কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩৪ সাল (ইং ১৯২৭) ।—সম্পাদক

স্বরলিপি

নজরুল-গীতি

[নজরুলের গান ও স্তব সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ নজরুল একাডেমীর একটি প্রধান প্রকল্প হিসাবে গৃহীত। যাদের কাছে নজরুল-গীতির বাণী, স্বরলিপি, হস্তলিপি, নট-পত্র, পুরনো গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি বা সে-সব সংক্রান্ত কোন তথ্য রয়ে গেছে, তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ নজরুল-গীতি সংরক্ষণের জাতীয় স্বার্থে তাঁরা যেন দয়া করে সে-গুলো সাধারণ সম্পাদক, নজরুল একাডেমী, ৩৫৫ খিড়ানার সার্কুলার বোড, ঢাকা (ফোন নং ২৫৩৫৫৫ ও ৪০১৬৬৬)—এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয় বা সে সম্পর্কে জানান। এ-রকম কোন স্মিগল পাড়ায় পর ভো নজরুল একাডেমী পত্রিকায় প্রেরণের মাধ্যমেও পূর্বক প্রকাশ করা হবে।

নীচে কয়েকটি নজরুল-গীতির স্বরলিপি ছাপা হলো। যাঁরা এ-সব স্বরলিপি আমাদের প্রধান করেছেন, বলা বাহুল্য, এ-গুলোর বাণী। তবে এ স্বরলিপির মাধ্যমে একান্তভাবে তাঁদেরই। সম্পাদক]

উচ্চ স্বর-র' নিম্ন স্বর-প্	জেনুয়িসা [জীবন্তিকা]		ডাল দাদরা	
	ধিন্	ধিন্ না	ধা	তিন্ না
	১	২	৩	৪ ৫ ৬

এক

লুকায়ে রহিলে চিরদিন তুমি নীশ্ মহলেব পানশীতে

তব রূপ হার রূপারিত হ'ল শুধু দেহেরেব আরশীতে।

অমৃত অশ্রু-বিশা

পিঙরে চির-বলিশী

চির-বোগিনী জেনুয়িসা।

ভ্রোমার সিঙরামে, ডগো শাহাজাদী করি,

আঁকিলে যে তব বিরহ-বিষাক ছবি।

নাভ পারি হার তাজবহন তাহার করুণ সংশীতে॥

কোন্ সে ভ্রমণ কবি
 তোবারে তোবার কবিতা রচে যে স্মরণ দেবেছিল
 গোলাপ ফুলের পাঁপড়িতে ডব ছবি
 প্রেম-চন্দনে এঁকেছিল।

প্রিয়ায় আদেশে আঙনের দাহ সহি
 পুড়িল প্রেমিক একটি কথা না কহি
 সেই যৌন প্রেমের মহিমা আচ্ছিন্ন জাগে
 বঙ্গ-গোলাপের স্মরণিতে ॥

II { সা সপা পা পা পদা পদা বা পদপা মজা মপমা জা সা I
 লু কাও রে র ছিও লেও চি রও দিও ০০ন্ তু বি I

I সা -১ রমা রমা রমা বা সা -গী বা পমা -গধা -সা I
 নী লু রও হও লেও লু পা তেও ০০ ০ I

I { সা সপা পা -১ পদা পদা বা পদপা মজা মপমা জা সা I
 উ ২০ র লু হাও ০২ র পা০০ ইও ৩০০ হ ল I

I সা সা রমা রমা রমা বা সা -গী বা পমা -গধা -সা I
 উ লু হেও রেও যেও লু জা লু নী তেও ০০ ০ I

I সা সা পদপা পদা -পদা বা পদা পদা -১ -পদা -পদা -জা I
 অ লু ৩০০ অও ০০ প্রা দিও পাও ০ ০০ ০০ ০ I

I জা -১ সপমা জা :সা সা জা -১ মপমা জা :সা সা I
 পি লু অ০০ রে ০চি র ব লু দি০০ দী ০চি র I

I সা' সর্গা সর্গা সর্গা বর্গা বর্গা বা সা সা -১ -১ -১ -১ II
 হো গিও নী জেও বুও ০ন্ দি সা ০ ০ ০ ০ II

অন্তরা

II { সী সী -সী | বসী বসী পসী | বা পবসী বসী | পসী পসী বা I
জো না হু | মিও মারো মেও | ও গোওও মারো | হারো জা দী I

[পা - ন - ন - ন]

I পা - ন পসী -পবসী -সী -ন } পা পসী বসী বসী বসী পসী I
ক ০ বিও ০০০০ ০ ০ } মারো মিও মেও যেও তও বও I

I বা বপা পা পা পবপা বপা | দা পা - ন - ন - ন - ন I
বি বও হ বি মারো ০০ | চ বি ০ ০ ০ ০ I

I { সা -পা পা - ন পসী পসী | বা পবপা মজা -বপপা জা সা I
ম হু পা ম তারো ০০ | ম হওল তও ০০০ হা ম I

[পা বা - ন - ন]

I মসী বসী - ন কা পা - ন সা পা বা পসী -পসী -সা } II
তারো হারো হু ক ক পু ম : দী তেও ০০ ০ I

* "অমৃত প্রসূতি" চট্টোপাধ্যায় "পদমন্তরীণ" প্রথম পঞ্জি (কাইন্) বসিতে হইবে।

সকারী

II সা -পা সা দা পসী পসী মজা -মজপা সা | -ন -ন -ন I
কো ন সে ত কও ০০ কও ০০০ বি ০ ০ ০ I

×

I মজা মগা জা বপা পসী -পা পা দা সী মপা দপা সা বা I
তারো মারো বে তারো মারো হু ক বি তারো ০০ তে বে I

I পসী পা দপা | বা মজা বপপা | জা সা -ন -ন -ন -ন I
হু ন দও হু মেও কেও | মি ম ০ ০ ০ ০ I

I মজা মগা জা বপা পসী -পা পসী মগা দপা বা পা দা I
গোও লাব প কও মেও হু পাও ০০ মিও তে ত ব I

×

I স্বা - সা - বা বা পলা পা দপা বা সধা গধসা I
 ছ ০ বি ০ প্রে ব চ০ নু দ০ নে এও কে০০ I

I জা সা । -। -। -।
 ছি ন ০ ০ ০ ০

আভোগ

II { সা সা -বা পসা পধা পধা বা বা পধা -বা পধা বা I
 প্রি রা ব্ আ০ দে০ শে০ আ শু নে০ ব্ দা০ হ I
 [পা -। -। -।]

I পা -। পধা পধপসা -সা -। } পা পসা গসা পসা পধা পধা I
 গ ০ ছি০ ০০০০ ০ ০ } প্ ডি০ ন০ প্রে০ বি০ ০০ I

I সা -পা পা পা পধপা ধপা দা পা -। -। সা -। I
 এ ক্ টি ক ধা০০ না০ ক হি ০ ০ গে হ I

I সা -পা পা পা দপা -দা বা পদপা জা বপসা জা সা I
 মো ০ ন প্রে মে০ ব্ ব হি০০ বা আ০০ ছি ০ I

I জা -সা সা -। সা সা { সরা বসা বা বজসা পা -। I
 জা ০ গে ০ জা গে { থ০ রা০ গো না০০ পে ব্ I
 [পা সা -। -।]

I সা গা বা পসা -গধা -সা { * "বসুত বশু" হইতে "জৈবুল্লিগা" পাহিরা
 য় ব ডি তে ০০ ০ } প্রবন্ লাইন বসিউ হইবে।

অন্যসিপি : কয়ল দাবতত

ছই

ভাল—খাপ

বাঁজে বুদজ বীণা বাঁজে বুদলী
দল-দুলাল বাঁজে বুদ দুলালী ॥
নাচে তাধিন্ বিন্ অধীর আনন্দে
ছন্দে ছন্দে উখলি উখলি ॥

শিররে কলর দোলে কাননে কুসুম কোলে
চন্দ্র অতন্দ্র নভে তাবাকুল খলমলে ।
নেহায়ে উক্তকুল শ্রী অরবিন্দে
নব জলধর করে খিল বিজলী ॥*

II } বসা রসা I বসা বসা বী I সা সা I সা সা সা I
 ০০ ছে০ ০০ ব দ ঙ্গ গ বী পা I

সা । I বসা রা সা I বসা রসা I বসা বী পা I
বা ০ ছে০০ ব ক) ০০ লী০ ০০ I

রা পা I পা বী পা I সা সা I সা রা রা I
ন ন গ ০ ব লা ল বা ০ বে I

রা রা I রসা পসা পা I মজা জসা I রা রসা । }
ব ব জ০০ ০০ ব লা০ ০০ লী ০০ ০ }

বাঁজে বুদজ বীণা ॥

II } বা পা I বা পা পা I সা সা I সা । সা I
 না ০ চে ০ তা দি ন্ দি ০ ন I

সা পা I সা সা সা I বসা বসা I বসা পা পা }
অ বী ব ০ যা I ন০০ ন ছে০ ০ ০ }

সা পা I জা সা জা I সা বজা I সা । । I
ছ ন্ বে ০ ০ হ ০ ন্ বে ০ ০ I

* কলকাতা বেতারে বাজানো প্রাথমিকের ছেকর্ড থেকে প্রতীত । গায়ক : জ্ঞান গোস্বামী । -স্বরলিপিকার

III}

না	না	I	পর্দা	।	সাঁ	I	ন	জা	জনা	I	না	রজা	সা	I
উ	খ	লি	০	০	উ	I	খ	০	০০	লি	০০	০	০	I
পা	পা	I	সজা	সজা	না	I	পা	পা	I	পা	পা	পা	পা	I
নি	ব	বে	০	০	০	ক	I	ব	ব	বো	লে			I
না	পা	I	না	না	না	I	না	না	I	না	না	পা		I
কা	না	নে	০		কু	I	অ	না	০	লে				I
না	পা	I	পর্দা	।	সাঁ	I	গা	না	I	না	না	পা		I
চ	ন	হু	০		অ	I	ত	ন	হ	না	ভে			I
মজা	জা	I	জা	।	জা	I	জনা	না	I	না	রসা	সা		I
তা	না	কু	০		ল	I	না	ন	ন	০০	লে			I
না	পা	I	না	না	না	I	সা	না	I	না	।	সাঁ		I
নে	হা	বে	০		ত	I	ক	ত	কু	০	ন			I
সাঁ	I	না	সাঁ	সাঁ	I	না	না	I	না	না	পা			I
খা	অ	০	ব	I	না	না	না	I	না	না	০			I
না	পা	I	না	জা	না	I	না	না	I	না	সাঁ	সাঁ		I
ন	ব	জ	০		খ	I	খ	ব	ক	০	বে			I
না	I	পর্দা	।	সাঁ	I	না	না	I	না	না	সা			I
খি	ব	০	০	বি	I	জা	০০	না	০০	০				I

বাজে বৃন্দ বীণা ॥

অবলিপি : এ. এইচ. সাইক্লার রহমান

ভিন্ন

মস্তজিহ্বেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,
 (বেন) গোরে থেকেও বোয়াজিহ্বের আদান শুনতে পাই ॥
 আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা বাবে
 পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বাঙ্গা শুনতে পাবে।
 গোরে আদান থেকে এতদূর পাইবে বেহাই ॥

কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজীর উদ্ভব
 ঐ মসজিদে কবেরে তাই কোরান তেলাওয়াৎ।
 সেই কোরান শুনে যেন আমি পরাণ জুড়াই ॥

কত দরবেশ ফকিরেরে তাই মসজিদের আড়িনাতে
 আমাহর নাম ভিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।
 আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে (আমাহর) নাম জপতে চাই ॥*

[- পা বা দা]

II { - পা - দা I পা - দা বা - I - সা ঙ্গা জা I ঙ্গা - সা - I
 { ০ ন ন্ তি বে ০০ নি ০ ০ পা ০ শে আ ০ বা ন্
 [I - I - পা পা]
 ০ ০ ০ বে ন

I - পা পা দা I প - পা বা - পদা I দা পা - - দা I পদা পা (বা -) } I
 ০ ক ন ন্ দি ০ ড় ০০ ০ ড়া ০ ই ০০ ০ ০০ }

I { পা পদা - পা - দা I - দা পা বা - I - সা পা পা I - দা পা সা - I
 { গো বে ০০ ০০ ০ বে কে ড় ০ ০ মো যা জ্ জি নে ০
 [- দা - পা - দা - বা - I
 ০ I ০ ০ ০ ০]

I - সা - দা বদা দা I - পা পা বা দা I পা - সা - I - দা - দা পা পা } II
 ন্ ০ আ ০ জা ন্ ত ন্ তে পা ০ ০ ০ ই ০ বে ন }

II - দা - দা জা বা - দা বা দা - দা - দা পা সা সা সা - দা দা দা দা দা
 ০ ০ আ বা ন্ গো বে ০০ ০ ন্ পা ন্ দি বে ০ ড়া ০ ই

I - দা - দা দা I - দা পা দা - দা I পা দা - দা I - দা - দা - দা I
 ০ ০ দা দা ০ জী দা ০ বা বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ I

I পা দা দা - দা দা I দা দা - দা দা I - দা - দা দা I - দা দা পা দা I
 প বি ০০ ০ জ সে ই ০০ ০ ০ পা সে ন্ দা নি এ

I পদা দা - দা দা I - দা - দা - দা I দা দা - দা পা - I - দা - দা পা - I
 ক ন ০০ দা ০ ত ন্ তে পা ০ ০ বে ০ ০ ০ গো ন্

*“বিহ্ন মটাকন ভবন” কে, ডি, বি ১৪০৪৮। কঃ : গো: কাদের।—অবলিপিভাব

I পা পলা -না লা I পা পলা বা -না I -না সা -ধা জা I ধা ধা সা -না I
 আ জা ০ ০ ব্ পে ০০ কে ০ ০ বে ০ জা না হ্ গা হ্

I -না পা -না লা I বা -পা জা -না I পা -না -না লা I -পা -লা বা -না I
 ০ পা ০ ই বে ০ রে ০ হা ০ ০ ০ I ০ ০ ০ ই

জা জা I -না -না বা I বা বলা -লা লা I -না -না বা সা I সা সা সর্ষ -র্ষ সা I
 ক ত ০ ০ পহ্ হে জ্ গা ০ ০ ০ ০ ০ খো লা ব ভক্ ০ ০ ত্

I- বা -লা লা লা I-লা দর্ষা সা বা I সা -না -না -না I -না সা সা সা I
 ০ ০ ম নী ০ জি ০ হ্ উহ্ ব ০ ০ ০ ০ ত্ ০ ঐ

I বা বলা সর্ষা জা I জা জা -না -না I জর্ষা -সা সর্ষা বলা I -লা লা পা-না
 ঐ ম ০ ০০ স্ জি জ ০ ০ ০০ ০ প ডে ০ ০ রে ডাই

I -না -না জা জা I -না সা ধা -না I সা -না -না -না I -না সা পা -না I
 ০ ০ কো ০ রা ব্ তে লা ত্ মা ০ ০ ০ ০ ০ ত্ সে ই

{পা পলা-না লা পা-বলা বা -না I -না পা পা I লা লা সা -না I
 {কো রা ০ ০ ন' ত্ ০০ নে ০ ০ ০ যে ন ০ আ বি ০

I-না -না বলা লা I -না পা -লা লা I পা -না -না -না I পা -না পা -না I
 ০ ০ প ০ রা I ০ ব ০ জ্ I জা ০ ০ ০ I ই ০ সে ই }

জা জা I -না -না জা বা I বলা দলা দলা -না I -না -না সা I সা সা ঝ I ধা সা I
 ব ত ০ ০ দ ব বে ০ বে ০ ০০ ব্ ০ ০ ফ কি হ্ রে ডা ০ ০ ই

I পা -লা লা লা I লা লা সা -র্ষা I পা সা -না -না I -না -না -না -না I
 ০ ০ ম্ জি দেব্ আ ডি ০ না তে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না বলা -সর্ষা I জা জা -না জর্ষা I সা -না বা বা I পা লা পা -না I
 আল্ ০ লা ০ ০ ০ ব্ পা ০ ০০ হ্ ০ জি কি ব ক রে ০

I পা লা বলা -না I -না লা পা লা I বা পা -না -না I -না -না পা পা I
 ল্ -কি যে ০ ০ ০ গ ডী হ্ জা তে ০ ০ ০০ আ বি

I পলা -না লা -না I পা -লা বা -না I -না সা -ধা জা I ধা -না লা -না I
 ডা ০ ০ ০ হ্ সা ০ বে ০ ০ কে ০ দে কে ০ দে ০

I - পা - না I বা পা জা - বা I - পা - না I পা না বধা মধা I
 ০ না ০ হু' অ প ডে ০ ০ চা ০ ই আ নু না ০ ০

X
 I - পা পা - পা পা I বা পা জা - বা I পা পা - না - বা I পা না বা - না III
 হু' মা ০ ব অ প ডে ০ চা ই ০ ০ ০ ০ ০ ০

[- পা না বা] জ
 II { - পা - না I পা - পা বা - না I - না - বা জা I বা - না - না I
 ০ ব হু' জি ডে ০০ রি ০ ০ পা ০ পে আ ০ বা হু I
 প [- না - না - না পা পা]
 ০ ০ ০ বে ম]

I - পা পা বা I বা - পা জা - পা I - পা পা । না I - পা - পা বা - না } I
 ০ ক ব র দি ০ ০ ০ ০ ০ ডা ০ ই ০ ০ ০ ০

I { পা পদ - পা - পা I - পা পা বা - না I - না পা পা I - পা পা না - না I
 মো রে ০ ০ ০ ০ ০ বে কে ও ০ ০ মো বা অ জি মে ০ I
 - পা - পা - পা - পা - না |
 ০ ০ ০ ০ ই

সী সী
 I - না - না বধা বা I - পা পা বা না I পা - না - না I পা - না (পা পা) III
 হু' ০ আ জা নু ও নু ডে পা ০ ০ ০ ই ০ পে ম

II - না - না জা বা I - না বা বধা - পা I - না বা সী সী I সী - না বধা বধা I
 ০ ০ আ বা হু' মো রে ০ ০ ০ ব পা নু দি রে ০ ডা ০ ই I

অবলিপি : সুরাইয়া খলিল

এক পরিচিতি

নজরুল-জীবনী

বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত কবি নজরুল-সম্পর্কিত রচনার সংখ্যা গণনাভীত না হতে পারে কিন্তু অসংখ্য পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সে-সব বিক্ষিপ্ত রচনা গণনা করা অসাধ্য ব্যাপার না হলেও, সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। এ-সম্পর্কে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও মোটেই অল্প নয়। এমন ছয়, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলার আর কোনো কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ বাজারে কখনো প্রচলিত ছিল না, এবং এখনো নাই। অথচ লক্ষ্যীয় ব্যাপার এই যে, এক যুগ আগেও নজরুল ইসলাম এতটা আলোচিত লেখক ছিলেন না।

বলা বাহুল্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নজরুল-জীবনীগুলির অধিকাংশই নজরুল ইসলামের বড় জীবনই মাত্র পাওয়া যায়, তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, এমন বইয়ের সংখ্যা সামান্য। নজরুল-জীবনের আলোচনা পাওয়া যায় এমন গ্রন্থগুলির মধ্যে সাতটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। যে সাতটি হচ্ছে: ১. যুগশ্রুতি নজরুল—খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন। ২. ডেক্টোর ঝড় অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত। ৩. নজরুল জীবনী—এবং বাকী রফিকুল ইসলাম* ৪. কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—বুদ্ধজ্বর আহমদ। ৫. কাজী নজরুল—প্রাণপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। ৬. নজরুল পরিকল্পনা—আবদুল আজিজ খান-আমান। ৭. নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়—সুফী জুলফিকার হায়দার। প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুটিতে, 'যুগশ্রুতি নজরুল' এবং 'ডেক্টোর ঝড়'-এ সমগ্র নজরুল-জীবনকে ঐতিহাসিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও এগুলি প্রধানত: স্মৃতিচারণ পর্যায়ের রচনা হয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। এদের লেখকরা খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন ও অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত উভয়েই কবির জীবন বধ্যায়ে কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। জীবদ্দশা ধরে উভয়েই কবিকে বহু স্থানে ছারার মাধ্যমে অনুসরণ করেছেন। এই কারণেই কবির জীবনের সাথে এদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটা কোনো কোনো স্থানে এত বেশী মাত্রায় জড়িয়ে গেছে যে, তার ফলে কবি-জীবনীর সরল নির্ভেজাল ধারায় কিছুটা কুশাশ্রয় ধূসরতা সৃষ্টি হয়েছে। সত্যকার নির্ভেজাল জীবনীকারের পক্ষে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়ে ওঠে। ৪নং বই বুদ্ধজ্বর আহমদের "কাজী নজরুল ইসলাম": স্মৃতিকথা"ও নজরুল-জীবনীর পর্বায়ে না কেনে স্মৃতিচারণ বুলক গ্রন্থের পর্বায়েই দেখা যেতে পারে, এ-কারণে যে লেখকের সাথে নজরুলের যুক্ত জীবন-কাহিনীর বিবরণীই এর প্রধান উপজীব্য। আর

*জীবনী ॥ রফিকুল ইসলাম ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ দায়: ৩০'০০

৩নং ও ৭নং বই প্রাপ্তোত্তর চর্যাপাধ্যায়ের “কাছী নজরুল” ও সুকী জুলফিকার হারদাহের “নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়” সম্পর্কেও এই একই কথা পাটে। যদিও গ্রন্থ দুটি খুবই সুস্বাদু। ৬নং বই আবদুল আজিজ আল-আবানের “নজরুল পরিক্রমা” সম্বন্ধে: “নজরুল জীবনী” রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু বইটির ত্রুটি হ'ল গবেষণামূলক জীবনীগ্রন্থ রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেখানে গ্রহণ করা হয়নি।

৩নং বই অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের রচিত “নজরুল-জীবনী” কে বোটার্ণিভাবে নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ বলে অভিহিত করা চলে, কারণ নজরুল-জীবনের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা এতে বোটার্ণি ভাবে অক্ষুণ্ণ আছে। আর তা'ছাড়া, এতে নজরুল-সাহিত্যের উদ্ভূতি বেটুকু আছে, ঐতিহাসিক কাহিনীর সাথে সঙ্গতি স্বাক্ষর অনাই তা করা হয়েছে—সঙ্গতিহীন অনাবশ্যিকভাবে সে-সব করা হয় নাই। এই বিক নিরে সত্যাকার জীবন-কাহিনীকার হিসাবে লেখকের সংশয় প্রশংসনীয়। গ্লিচরট লেখকের সুবিধা ছিল এইটুকু যে, তিনি কখনো সূত্রাবলয় নজরুলের বহিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নাই। আসবার সুযোগও তাঁর ছিল না। যখন তিনি নজরুল সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলেন, নজরুল তখন লম্বিত্বারা, জীবন্ত। এ কারণে নজরুল-জীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করার সুযোগ তাঁর হয় নাই। স্মৃতিচারণ-কারীদের পক্ষে সত্যাকার জীবন-কাহিনী রচনা যে একেবারে অসম্ভব, এ-কথা বলছি না। তবে তাঁদের পক্ষে সত্যাকার জীবনী-লেখকদের অতি প্রয়োজনীয় সংবাদের বাতায় ঘটা খুব স্বাভাবিক। উচ্ছৃঙ্খল বাঙলা, যনাশয়ক উদ্ভূতি অনেক ক্ষেত্রে জীবন-কাহিনীর ঐতিহাসিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে। স্মৃতিচারণকারী যে সত্যাকার জীবনী লেখক হতে পারেন, তার একটি নিদর্শন দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত “বিভিন্ন জীবন-স্মৃতি”। দেবকুমার রায় চৌধুরী বিভক্তমানের অনুজ প্রতিম-বদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি যে “বিভিন্ন-জীবন-স্মৃতি” রচনা করেছেন তাতে সত্যাকার জীবনী লেখকের স্বাক্ষর সম্পষ্ট। অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের “নজরুল জীবনী” আগেই বলেছি, বোটার্ণিভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থই হ'তে পেরেছে। এতে নজরুল ইসলামের সমগ্র জীবনের ঐতিহাসিকতা বোটার্ণি ঐতিহাসিকভাবে রূপ লাভ করেছে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে বলে মনে করি। লেখকও তাঁর এ-বইয়ের ভূমিকার এ-কথা বলেছেন :

বিহোদী কবি কাছী নজরুল ইসলামের প্রাণাণ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থের অভাব বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। সে অভাব পূরণের জন্যই নজরুল-জীবনী রচনার প্রতী হয়েছিলাম।...নজরুলের সমকালীন বিপ্লব ও দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে কালানুক্রমিকভাবে নজরুল-জীবনী তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

বলতে বিধা নাই আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের সে চেষ্টা কিছুটা সাকল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং সেজন্য তিনি বাংলা সাহিত্য-সাধকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র।

পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলতে বা বুঝায়, তার স্তম্ভের কাঠামো এই বইতে নিঃসংশয়ে তৈরী হয়েছে যটে কিন্তু নজরুল-জীবনের অনেক ঘটনাটি তথা এতে বাদ পড়েছে, যা সংযুক্ত হলে এই জীবনী অধিকতর তথ্য-সমৃদ্ধ হতে পারত বলে আমরা মনে করি। তা ছাড়া নজরুলের ঘটনাবলি জীবনের অনেক ঘটনা অনেকের স্মৃতিতে আছে, তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। এবং নজরুলের জীবিত

অবস্থারই এই জীবনী প্রকাশিত হওয়ার, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কিছু কিছু এমন ঘটনা বাদ পড়েছে, যে-সব সংযুক্ত হলে এটা সত্যিকারভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী হতে পারত। অবশ্য এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সে-সব এতে সংযুক্ত হবে বলে আশা বহন করি।

নজরুলের শৈশব জীবন সম্পর্কে মোটামুটি পরিচরই এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। বটে, তবে লেখক আরো কিছু নজরুলের জীবন-চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করতে পারতেন। যদি তিনি কলকাতার প্রকাশিত নজরুল-স্মৃতিমূলক বইগুলি আলোচনা করে লেখবার সুযোগ করে উঠতে পারতেন। বিশেষ করে ইন্ডোমোহন সেনগুপ্ত নামক ব্রহ্মক লেখকের লেখাটি পড়ার সময়ে, নজরুলের বাল্যজীবন কিরূপ অগতঃ অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটেছিল, তার সত্য পরিচর দেওয়া সম্ভব হতো। আট বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগের পর নজরুলকে সমগ্র সংসারের ভার গ্রহণ ক'রে কিভাবে একলিকে বাগীদের এমামতি, পরগায় বাসেমদারি ক'রে কোনক্রমে বাড়ীর সকলের মুখে অনু ভোটাতে হত, তার পূর্ণাঙ্গ পরিচর দেওয়া সম্ভব হত।

নজরুলের প্রথম বিবাহের ট্রাজিক পরিণতি সম্পর্কে লেখক তাঁর এ-গ্রন্থে সত্য পরিচরটুকু তুলে ধরতে পেরেছেন। বিয়ের কবিনে ঘরজারাই থাকার শর্ত থাকার ফলেই যে নজরুল সে অপমানকর শর্ত না মেনে বিয়ের রাত্তিই বিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন, লেখক সেই অভিনয় পোষণ করেন। চরম দুঃখ জীবনেও নজরুলের আত্মসম্মান প্রদর্শনের এ-চিত্র সত্যি বড় সুন্দর।

জেল উনচলিগ জিনের অনশন ধর্মঘট নজরুল ভেঙে ছিলেন বিরজামুল্লারী দেবীর প্রাণেশ, লেখক একথা লিখেছেন তাঁর এ জীবনী গ্রন্থে। এ সম্পর্কে মনে একটা ঘটনা না লেগে পারে না। নবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, শরৎচন্দ্রের পত্র, চিত্তরঞ্জনর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত জনসভার প্রস্তাবও যে নজরুলকে অনশন ভাঙতে সক্ষম হল না—এমন কি যে নজরুল মুল্লুর বর্ধমান থেকে ছুটে আসা আপন বারের সঙ্গে জেল গেটে দেখা পর্যন্ত করলেন না, অবশেষে তিনি, বা নয়, বাড়ীসহ বিরজামুল্লারীর আদেশেই অনশন ভেঙে ফেললেন, এটা কিছুটা অসুত বদন হয় না কি? বদন হয় নাকি, শুধু নয়, এমন আরো কিছু ছিল; যে জন্য শেষ পর্যন্ত নজরুল অনশন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেটা কি? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'জৈষ্ঠের ঝড়' গ্রন্থে তার বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে আছে :

ধীরে ধীরে বিরজামুল্লারী নজরুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"একি মা! তুমি?" ধেনো কোনো অভাবনীয়কে লেখছে নজরুল। তাকালো বিস্ময়ে।

"হ্যাঁ, কুমিল্লা থেকে আসছি।"

"তুমি কেন এত কষ্ট করে এলে? কত দূরের বাড়ায়।"

"এসেছি, তোমাকে খাওয়ার বলে।"

"না, না। আমি খাব না। কিছুতেই না।" নজরুল আপত্তি করতে লাগল। "যতক্ষণ না গভনমেন্ট আবার দাবী মানছে।"

"দাবী মানবে। আমি বলছি তুমি খাও।"

"না না।" নজরুল তবু আপত্তি করতে লাগল।

"এ তোমার বারের দাবী। এ তোমাকে মানতে হবে।"

"হ্যাঁ!" সজল চোখে তাকালো নজরুল।

“আনো ভোমার জন্য আমি তেহো দিন উপবাস করে আছি। সাতা পথ কতক কোটা মুন-জন কিছু খাইনি। তুমি যদি মরো তার আগে আমি মরব। আরবাভী হবার আগে তুমি বাড়ুহু হবে।”

“না, তুমি না বেঁচে আছ? তেহো দিন?” নজরুলের চোখ ডেপে অশ্রু উঠলে পড়ল।

“ভাষণর আরো একদিন এই টুেনে সজীবারে। বাঁড়াতে পারছি না। তবু তোমাকে খাওয়ার বলে বাঁড়িয়ে আছি। যদি কিবিরে লাও, মনে হচ্ছে আর কিরে যেতে পারব না। এবাঁনেই চলে পড়ে যাব।”

“না না। তোমাকে বুখে বুখে কিরে যেতে দেব না। থাকতে দেখ না উপবাসে।” এক মুহূর্তে নজরুল বন ছির করে ফেলল। বললে উঠল কঠে: “নিরে এস, কি দেখে। আমি তোমার বেতে যাব।”

কিরআনুল্লহী লেবুর রস করে আনলেন। তাই পেয়ে নজরুল অনশন ভাঙল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের “জ্যোতের ঝড়”-এ প্রকাশিত নজরুলের অনশন ভাঙার উপরোক্ত বিবরণটিই অধিক সঠিক মনে হয় না কি?

অধ্যাপক রবিকুল ইসলামের এই “নজরুল-জীবনী” গ্রন্থে নজরুল-জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই বড় বাপ পড়ে নাই, কিন্তু নজরুলের সাংবাদিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখানে আলোচিত হয় মাই। তা হচ্ছে বঙালার মোহাম্মদ আকরার বা প্রবর্তিত ‘সেবক’-এর পরে ‘দৈনিক মোহাম্মদী’তে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান ও সে-কারণে মাসাধিক কাল ধরে তার কর্মতৎপরতার ইতিবৃত্ত। দৈনিক ‘সেবক’ বেরিয়েছিল ১৯২১ সালের মতেষর কি ডিসেম্বর মাসে। বঙালার সাহেবের দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের এটাই ছিল প্রথম প্রয়াস। তাঁর এ প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নাই। অনধিক এক বৎসরও এ প্রয়াসের স্থায়ি ছিল না। তাঁর দৈনিক পত্র প্রকাশের দ্বারী প্রয়াস ‘আজাদ’ বেরিয়েছিল এর প্রায় পনেরো বৎসর পরে—১৯৩৬ সালে।

না হোক, বা বলছিলাম। এই ‘সেবক’-ই প্রথম সংবাদপত্রেই সম্ভবতঃ নজরুল ইসলামের ‘সেবক’ নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। যদিও বঙালার সাহেবের সাথে নজরুল ইসলামের তখন বিশেষ সড়ান ছিল না, তবু ঐ পত্রিকার নজরুলের ‘সেবক’ কবিতা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল সম্ভবতঃ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ ওরাজ্জের আদৌর চেষ্টার। কিছু পারিশ্রমিকের বিগিনের কবিতাটি সংগৃহীত হতে পেরেছিল। সে-সময়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে দেশ উদ্বেলিত, উত্তাল। বঙালার সাহেবের এফ উত্তর প্রবন্ধ সে-সময়ে প্রকাশিত হওয়ার করে ‘সেবক’-র জারানত উল্লব হয়। ফলে ‘সেবক’-র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং বঙালার সাহেব এক মৎসবের জন্য কারাবাস করতে বাধ্য হন। ‘সেবক’-র সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ ওরাজ্জের আলী ও অন্যান্য সহকারীরা নিজে পরাকর্ষ করে তখন ‘দৈনিক মোহাম্মদী’ প্রকাশ করতে উল্লাসী হন। ‘সাপ্তাহিক মোহাম্মদী’ চালু থাকার তার একটা দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করতে নতুন কোনো চিন্তারোপন দরকার হবে না বলে উকিলরা পরাকর্ষ মিল। ফলে দৈনিক ‘মোহাম্মদী’ মধ্যাহ্নিক প্রকাশিত হল। এর কিছুদিন পরে সম্ভবতঃ ১৯২২ সালের বে কিংবা জুন মাসের কোন সময়ে মোহাম্মদ ওরাজ্জের আলী এক টিটি লেখেন আবার কাছে আবার সেখের বাড়ীর ঠিকানার ‘দৈনিক মোহাম্মদী’-র সম্পাদকীয়

বিভাগে যোগদানের জন্য। আমি বাড়ীতে বেকার বসেছিলাম। আমি সামলে এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে পরদিনই কলকাতার গিরে কাজে যোগ দিলাম। এর বাস খানেক পরেই সম্ভবতঃ ওয়াজেদ আলী বললেন, “নজরুল ইসলাম তুমি ছি কুন্নিমা থেকে কলকাতার চলে এসেছে। তাঁকে আমাদের টাকে নিয়ে এলে কেন হয ?” আমরা সামলে তাঁর প্রস্তাবে সার দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হল। তিনি তখন ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি”র অফিসে বাস করছিলেন। তিনি ওয়াজেদ আলীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে পরদিনই এসে ‘দৈনিক মোহাম্মদী’র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন। ‘দৈনিক মোহাম্মদী’তে নজরুল ইসলাম বাস খানেক কর্মরত ছিলেন। আমার আত্মজীবনী “যতীত দিনের স্মৃতি” গ্রন্থে সে সম্পর্কে আমি বিনয় বর্ণনা দিয়েছি। সেখান থেকেই নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

“যাহোক কয়েকদিনের মধ্যেই নজরুলের আবির্ভাব হল ‘দৈনিক মোহাম্মদী’ অফিসে। এসেই তিনি বললেন : আমি কিন্তু ব্যঙ্গরসায়ক কলামটি লিখব।
এই কলামটি আমি লিখতাম হরেক রকম নামে। আমি বললাম : খুব ভালো হবে। আপনিই তো এ-কলাম লিখবার সব চাইতে যোগ্য লেখক।
নজরুল এ কলামের নতুন নামকরণ করলেন ‘কাতুকুতু’। প্রতিদিন কাতুকুতু বেঙ্কতে লাগল। ‘দৈনিক মোহাম্মদী’র পাঠকদের মুখে হাসির হ্রস্ব উঠল। শুধু কাতুকুতু নয় সংবাদগুলির হেডিং ও তাঁর ছোঁয়ার কবিত্বময় হয়ে উঠল। দু’একটি হেডিং-এর নমুনা দিচ্ছি :

‘গেদারি নেত্রে বজ্রালাল
হাসিত-আঁখি অতি লাল।
‘কিছির হিছিরিছিরি’
‘আপানের চা পান’

‘দৈনিক মোহাম্মদী’ নিয়ে পাঠকমহলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কাগজের প্রচার বৃদ্ধি করে বেড়ে চলল।

নজরুল রাতে অন্যত্র থাকতেন এবং বেতেনও বটে, কিন্তু তাঁর দুপূর্বের খাওয়াটা আমাদের সাথে অফিসের টেবিলেই সম্পন্ন হত। চা-পাতিগোন্ধ তাঁরও কম মুখ-রোচক ছিল না। খেতে খেতে তিনি নানা গল্প গুজবের অবতারণা করতেন। আমরা তাঁর অটহাসি ও হাসির গল্পগুলি পরব উপভোগ করতাম। * * *

একদিন খাওয়ার সময় হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন: ‘আপনার বাড়ী কোথায়?’
বললাম, বরবনসিংহে।’

“কিন্তু বরবনসিংহে কোথায়?”

আমি বজলাব, আপনার বাড়ী বর্ধমানে। আপনি বরবনসিংহের পরী গ্রামের ঘর ভেে রাখেন না। কাজেই আমার গ্রামের দার বললে আপনি চিন্তে পারবেন না।

‘আরে সে-নাথটাই বলুন না। আমি বরষদসিংহে অনেক দিন ছিলার বে।’

‘বেশ। বানীখোলা—এ নাম শুনেছেন কখনো?’

কেস শুনব না? আমি বানীখোলার ওসমান আলী মুখার বাড়ীতে তার পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম বে।’

‘তাই না কি? সে বাড়ীতো আমাদের বাড়ী থেকে হাত্ত বাইল খামেক দূরে।’

‘হাঁ, আমি দরিদ্রাবশুর ছুনে এক বৎসর পড়েছি, এবং কাজীর সিন্নার কাজী বাড়ীতে থেকেছি।’

‘কাজী রকিমুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে থাকতেন, যিনি আসামগোলে দাওয়াওয়া ছিলেন?’

‘হাঁ, তিনিই তো আমাকে আসামগোল থেকে কাজীর সিন্নার নিরে গিয়ে দরিদ্রাবশুর ছুনে ভর্তি করিয়ে দেন।’

‘কি আশ্চর্য! এবে আমার কল্পনারও বাইরে ছিল?’

‘আমি একবার আমার ছুনের বন্ধুদের সাথে বানীখোলার গিরেছিলাম এক ছুনের বাধিক সভায়। সেখানে সে গ্রামেরই এক ছেলের লিখা একটি নাটিকা অভিনীত হয়েছিল।’

‘আপনার সেই বন্ধুদের মধ্যে কতদর বলে কেউ ছিল কি?’

‘হাঁ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে-কথা আপনি জানলেন কি করে?’

‘জানলার এই কারণে যে, কতদরই সেদিন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।’

‘আরে, আপনিই সেই কুমে নাট্যকার না কি?’

আমি হেসে বললাম, ‘আর আপনিই নজরুল ইসলাম—যে দিন-রাত গান গেয়ে আইহালি হেসে বেড়াও এবং রাশে বরাবর কাশ্চ’ হতো।’

* * * * *

একদিন নজরুল ইসলাম বাড়ের বেগে অফিসে চুকলেন, বললেন : ‘শুনেছেন? কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গতকাল মারা গেছেন।’

বললাম : ‘হাঁ, কাগজে সে-সংবাদ দেখেছি।’

নজরুল ইসলাম বললেন : ‘সত্যেন দত্তের উপর একটা এভিটোয়িরেল লিখতে হবে তো?’

সোটা আমি লিখি কি বলেন?’

ওরাহেল বিয়া বললেন : ‘নিশ্চয়ই! আপনি থাকতে গৌটা আর কে লিখতে যাবে?’

বুঝ বুঝী হয়ে নজরুল প্রবন্ধ লিখতে বসে গেলেন। আমরাও নিজ নিজ কাজে বস দিলাম।

দুপুরে চাপাতি পোস্ত বাওরার সময়ে নজরুল ইসলাম প্রস্তাব করলেন, ‘আজ বিকেলে রামমোহন লাইব্রেরীতে সত্যেন্দ্র স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভাপতিত্ব করবেন রবীন্দ্রনাথ। চলুন দেখে আসি।’ ওরাহেল বিয়া বললেন : ‘বেশ, যাওয়া যাবে। কিন্তু তার জো এখনো অনেক দেরী। আগে প্রবন্ধটা শেষ করে কলোজ করতে দিন। তারপর পাঁচটার কিছু আগে সেখানে হওরাদা হলেই হবে।’

তাই হন। নজরুলের প্রবন্ধ ও আমাদের লেখাগুলি কলোজিটারের হাতে দিয়ে আমরা পাঁচটার কিছু আগেই হওরাদা করে পড়লাম। কিন্তু রামমোহন লাইব্রেরীতে শৌছে দেখি, সভা-হলে তিন ঘরপের স্থান নাই। নজরুল কোদরকবে অসজ্জা ডিঙে পথ করে আমাদের

টোনে নিয়ে চললেন এবং সভ্যকে থেকে বহুদূরে একটা গালাবীতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা স্থান
করলেন এবং নিজের আশ্রয়ের পাশে বসে পড়লেন।

ব্যবসায়ের সভ্যকে আপন আসন থেকে বদীন্দ্রনাথ উঠে পাড়ালেন। দুইকেন্দ্রের প্রতি
পাঞ্জাবী চান্দর পরিহিত শ্রেণীশ্রেণীভিত্তিক বদীন্দ্রনাথকে এই প্রথম সেখানকার বন তাঁর প্রতি
শ্রদ্ধা-ভক্তিভেদে আশ্রিত হয়ে উঠল। হঠাৎ নারী-কণ্ঠ তখন চমকিত হবার। কোথা থেকে
নারী-কণ্ঠের কবিতার আবৃত্তি ভেসে আসছে বুঝতে না পেয়ে চারদিকে চাইতে লাগল।
নজরুলকে জিজ্ঞেস করলেন : 'কবিতা আবৃত্তি করছেন কে ?' :জরুল তেলে বললেন :
'বদীন্দ্রনাথের বুকের দিকে চেয়ে দেখুন তো ?' চেয়ে দেখলেন। তাই তো। বদীন্দ্রনাথেরই
তো মুখ গড়ছে। কিন্তু এ নারী-কণ্ঠ কেন ? নজরুল বললেন : 'তাঁর কণ্ঠই এরূপ।'
আমি বিস্মিত হলাম। এমন নারী-কণ্ঠের স্বর যে-কোনো পুরুষের হাতে পারে, এ ধারণাই
আমার ছিল না।

যা হোক, বদীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের উপর লেখা তাঁর দীর্ঘ কবিতা পাঠ শেষ করলেন।
হল পরভাষিত হয়ে উঠলো। নজরুল বললেন : 'বুড়ো এখনো অতুলনীয়।
সত্যেন্দ্রনাথ সত্যিই ভাণ্ডার।' এবার আনো কয়েকজনের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হল।
নজরুল ইসলাম ফোপায় সটকে পড়লেন। আমরা অকস্মেৎ ফিরে এলাম।

ওয়াহেদ মিয়া ফেরমানকে ডাকলেন এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রাক দিয়ে আসতে বললেন
তাকে। প্রাক তাঁর হাতে এসে পৌঁছলে হঠাৎ আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'দেখুন,
নজরুল সম্পাদকীয়তে কি লিখেছে। এ-লেখা কি করে মওলানার দাপটে বেকতে পারে ?'
আমি দেখলাম। বললাম : 'লেখাটা কিন্তু খুবই সুন্দর।'

ওয়াহেদ মিয়া বললেন : 'সে তো ঠিকই। কিন্তু হিম্মতানী ভাব-ভাষায় লেখা দেখলে মওলানা চটে
আগুন হয়ে যাবেন। তার কি করি ?'

আমি বললাম : 'তবে এক কাজ করুন। ভাষা কিছু কিছু বদলে দিন। আর লেখানে ভাষার
দিক দিয়ে গোলমাল, লেখানে কাঁটিকাটা ককন।'

'কিন্তু তাতে নজরুল চটে যাবে না ?'

'চটেবে নিশ্চয়ই। হয়ত সেহনা সে মাং অফিসমুখোই হবে না।'

'তবে তো সেখানোই। উভয় সঙ্কটোই পড়া গেছে। কি যে কবি।'

আমি বললাম : 'যতটা সম্ভব রেখে এর ভাব ও ভাষার হিম্মতানী চেহারাটা বদলে দিন। তাতে
যা হবার চোঁট।'

অগত্যা তাই করা হল। কিন্তু পরদিন নাগালে তাঁর লেখার দুর্গতি দেখে নজরুল যে খুশী হতে
পারেন মাই, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। নজরুল সেদিন অফিসে এলেন না। তাঁর
পরদিনও না। শুধু তাই নয়, এরপর আর তাঁকে অফিসে কোনদিনই দেখা গেল না।

[অতীত দিনের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৮০—৯০]

উদ্ভূতি অভিযুক্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ল। কিন্তু কি করা যাবে। আশ্রয় বনে হয়, নজরুলের সাংবাদিক
জীবনের এ-অধ্যায়টা তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ থেকে বাদ পড়া উচিত নয়।

কারিকোবাদ-নজরুল সাক্ষাৎকার সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল-জীবনী' গ্রন্থের ৫৪০ পৃষ্ঠার নিবেদন :

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কোলকাতা এলবাটি হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবি কারিকোবাদ। ২৫শে ডিসেম্বর সম্মেলনের শুরুতে 'অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভাপতি সৈয়দ আবদুল আলী কারিকোবাদ ও নজরুলকে মান্যভূষিত করেন। নজরুল সম্মেলনে উদ্বোধন সঙ্গীত 'এস এস এসলোকনিহারী নবুখ'র দ্বারা সমাপ্ত করলে কবি কারিকোবাদ আবেগের সঙ্গে নজরুলকে মান্যভূষিত করেন এবং নজরুল তাঁকে কদমবৃক্ষী করেন।

কিন্তু এটাই কারিকোবাদ-নজরুল প্রথম সাক্ষাৎকার নয়। প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এরও প্রায় ত্রিশ বছর আগে ১৯২২ সালের সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসে। তখন আমি সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ'-এর ডায়গ্রাফ সম্পাদক। পরিচয় অফিসে ছিল ২৯নং আশুতী বাগান বোম, কোলকাতা। ময়মূনী লাইব্রেরীর মালিক জগদীশ মোসাদ্দক আলী ছিলেন এই পরিচয় প্রকাশক ও পরিচালক। ঠিক সে-সময়ে নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' বেকত ৭-নং প্রতাপ চাঁটুকে লেন থেকে। এই উভয় অফিসের দু'ঘর ঘুর বেণী ছিল না এক বাইলেরও সম্ভবতঃ কম। আমি মাঝে মাঝে নজরুলের সাথে দেখা করতে 'ধূমকেতু' অফিসে যেতাম। সে-সময়ে একদিন হঠাৎ কবি কারিকোবাদ সাহেব এসে 'মোসলেম জগৎ' অফিসে ছাড়ির ঘন। নানা কথাবার্তার পর হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'কবি নজরুল ইসলাম কি এখন কোলকাতায় আছেন?' কবি মঈনুদ্দীন উতিপুর্বেই 'মোসলেম জগৎ' অফিসে এসে আমার সাথে আলাপ করছিল। সে-ই কবি সাহেবের জিজ্ঞাসার জবাবে বলল : 'হ্যাঁ, নজরুল ইসলাম এখন কোলকাতায়ই আছেন। আপনি তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলে আমি আপনাকে তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে পারি।'

কারিকোবাদ-নজরুল এই প্রথম সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ আমার 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকেই কিছু সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত করছি :

কারিকোবাদ সাহেব বললেন : 'তাঁকে (নজরুলকে) দেখতে খুবই ইচ্ছা করে। তাঁর ওখানে আরাকৈ নিয়ে গেলে খুবই খুশী হবে।'

আমি বললাম : 'তাঁহলে চলুন, এখন যাওয়া যাক। এই বিকেলের দিকে মিন্টার তিনি অফিসেই আছেন।'

কারিকোবাদ সাহেবকে নিয়ে আমরা — আমি ও মঈনুদ্দীন রওশান চলাম। প্রতাপ চাঁটুকে লেনে 'ধূমকেতু' অফিসে পৌঁছে দেখি, একটি ছেলে জিজ্ঞাসামাত্রে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। তাকে নজরুলের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল : 'নজরুল উপরে আছেন।'

বললাম : 'কবি কারিকোবাদ সাহেব নজরুলের সাথে দেখা করতে এসেছেন। একবার তাঁকে একটু দেখা করবার।' ছেলেটি তরতর করে উপরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরেই নজরুলের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন : 'শান্তি, কবি সাহেবকে উপরে নিয়ে এসো।' বুললাম, ছেলেটির নাম শান্তি। এই শান্তিপাল সিংহ নজরুলের সঙ্গী হিসেবে বহুদিন ছিল বলেই আমি।

যাঁ হোক, শান্তিপাল দীর্ঘ নোংরা এসে আমাদের উপরে নিয়ে গেল। দেখলাম, নজরুল

কবি কারকোবাদকে যত্নবর্ননায় অন্য একেবারে সিঁড়ির বুধে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর সাথে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই নজরুল নত হয়ে তাঁর কদম্বুলী করলেন এবং তাঁকে সাধরে হাত ধরে তাঁর অক্লিষ্ট ক্রমে নিয়ে গেলেন। দেবলাস, সেখানে চেয়ার টেবিলের কারবার নাই। বেধে জুড়ে এক বিরাট কনাস পাতা। কবি এবং আমিরা সকলে কনাসের উপরে গোল হয়ে বসলাম। নজরুল শান্তিপদকে চা ও পানের করবাস করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরাট এক পানদান ভাতি পান এলো এবং আরও এলো টুটে করে কয়েক কাপ চা। চা ও পানের সযবহার করতে করতে আলাপ চলতে লাগল। নজরুলের বুধে কবি সাহেবের প্রশংসার খঁই কুটতে লাগল। বললেন, আপনি আমাদের কবিগুরু, আপনার অনুসরণেই আমরা যা কিছু করছি—আপনি আমাদের আশীর্বাদ করছেন।

কবি কারকোবাদও নজরুলের প্রশংসায় বড় কম গেলেন না। বললেন, যদিও আপনার ও আমাদের কবিতার ধরন আলাদা, তবু আমি আপনার কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়েছি। এরপর তিনি আরো বললেন: শুনেছি, আপনার কবিতা আবৃত্তি ও গান নাকি অপূর্ণ। তা কিছু শুনেতে গেলে খুবই খুশী হব।

এরপর শুরু হয় নজরুলের কবিতার আবৃত্তি। প্রথমেই নজরুল আবৃত্তি করলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা। তারপর ক্রমে 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'কোরবানী', 'মোহরুর', 'খোঁচাপানের ডরনী' প্রভৃতি কবিতার আবৃত্তিও হল। কবি কারকোবাদ মন্থবুকের মতো নজরুলের আবৃত্তি শুনলেন এবং উচ্চারণ করলেন, শাবাশ! এরপর শুরু হল গান। এক গান শেষ হতেই কারকোবাদ সাহেব আর এফটা গাইতে অনুরোধ জানাতে বললেন। নজরুলেরও ক্রান্তি নাই—তিনি গানের পরে গান গেয়েই চললেন।

এভাবে যখন রাত প্রায় দশটা—তখন মনে হল, নজরুল যেন ক্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং আমাদের ঘরে ফিরবার কথা মনে পড়ল। কাজেই বিলায়ের পাল। শুরু হল। কবি সাহেব নজরুলকে ঘোবারকবাদ জামালেন এবং নজরুলও বিনয়ে সজ্জিত হয়ে কবিকে খনাবাদ জামালেন। নজরুল রাত্তা পর্বন্ত কবিকে এগিয়ে দিলেন।

[অতীত দিনের স্মৃতি—পৃষ্ঠা ৯৯—১০১]

এই সাক্ষাৎকারের কিছু দিন পরেই নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নজরুল 'বোসলের জগতে' সমালোচনার জন্য এককপি 'অগ্নি-বীণা' আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। 'অগ্নি-বীণা'র সব কবিতা আমার আগেই পড়া ছিল। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আমি এর একটি সুবীর্ষ সমালোচনা লিখে ফেললাম এবং পরদিন 'বোসলের জগতে'র সম্পাদকীয় কলামে তার দু'কলাম ব্যাপী সমালোচনা প্রকাশিত হল। এটাই ছিল নজরুলের 'অগ্নি-বীণা'র প্রথম সমালোচনা। এর পরে মল্লিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী'তেও এর এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'অগ্নি-বীণা'র কবিতাগুলির ভাষা, ভাব, বিষয়বস্তুর নতুনর বিশ্লেষণ করে আমি নজরুল ইসলামকে বুগ-প্রবর্তক কবি-প্রতিভা বলে অভিহিত করেছিলাম। বলেছিলাম আবুনিঃ বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইসলামই তৃতীয় বুগ-প্রবর্তক কবি।

নজরুল-প্রতিভা সম্পর্কে আমার এ-সময়ো সে-সময়ে কেউ কেউ অধুনা হয়েছিলেন। 'পনিবারের চিঠি'তে বিবরণ বস্তু করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বুড়োবয়স্ক পর্যন্ত বলেছেন : নজরুল রবীন্দ্র-প্রভাববৃত্ত সম্পূর্ণ নতুন এক কবি-প্রতিভা।

যা হোক, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের 'নজরুল-জীবনী'কে বোচাবুটিভাবে স্থানিষ্ঠ পূর্বাঙ্গ নজরুল-জীবনী বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এমিক দিয়ে তিনি পাটনোনিরায়ের কাজ করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এ-জীবনীগ্রন্থ অধিকতর সমৃদ্ধ চেহারা নিয়ে বেরবে, আশা করি।

— আবুল কালাম শাহজাদী

শিল্প-দর্শনের স্বচ্ছ দর্পণ*

বাঙলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবি হাইকেন সমুদ্রের তটের কানাকীর্ণিত সূনা ও ময়াল দিয়ে আজও বিতর্কের অবসান নেই। তাঁরই নতু অস্থিরত্বভাব ও শক্তিমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের কাব্যকৃতি সুলায়ন নিয়েও প্রথম থেকেই চলেছে কৌতুহলোদ্দীপক বাসানুবাদ।

১৩৩০ সালের গোড়ার দিকে নজরুল বর্ধন হুগলী জেলে অংশন-ধর্মঘাট করেন, সে-সময় অপরাধের কথাসির্ণী শ্রীশব্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭ই মে ১৯২৩ তারিখে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

আমাদের কবি কাজী নজরুল : একজন সত্যিকার কবি ; রবীন্দ্র হুড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।

সে-সময়ই ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৮শে বৈশাখ শুক্রবারের সাপ্তাহিক 'জোনাক' পত্রিকার 'অংশনশ্রুতি' নিবোনামে লেখা হয় :

বাঙলা কাব্যসাহিত্যে নবদুর্গের প্রবর্তক কাজী নজরুল ইসলাম : বাঙালির একজন এতুলনীয় কবি ও সাহিত্যিক।

অখচ রবীন্দ্রনাথের 'বাগী' কবোব 'উজ্জ্বল' কবিতাটির সহিত তুলনা ক'রে নজরুলের প্রোঁতন সৃষ্টি 'বিত্রোহী' সম্বন্ধে ১৩৩২ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী' পত্রিকার ২৪০ পৃষ্ঠার কাজী আবদুল ওলুদ লেখেন :

নবীন কবি নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিত্রোহী'-র আবেগ এর টাইতে অনেক বেশী, কিন্তু সে-আবেগ এমন সত্যদৃষ্টি স্রষ্টার দ্বাড়ে নিরস্তিত নহ ; তাই তার অনেকখানি কাব্য হিগানে অকিকিৎকর।

নজরুল-সাহিত্য-বিচার ॥ পাচাবুদীন আহবদ ॥ প্রকাশক : বুড়বাগী, ৭৪ কলমপত্র, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ : কাদার হাটমুদ। ৩৮৪ পৃষ্ঠা ॥ মূল্য : পঁচিশ টাকা।

প্রথম-বর্ষ। | ১৩৮৪

নজরুল একাডেমী পত্রিকা | ১৬৯

অতঃপর শ্রীযুক্তকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্তদেব বসু-সম্পাদিত ১৩৩৬ শ্রাবণের 'প্রগতি'তে এক স্বদীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয় :

নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা 'বিদ্রোহী' উঁচু দরের কবিতা নয়। নজরুল ইসলাম খুব কিছুদিন জোর গলায় জয়ধ্বনি করলেন, তার অবিকার্য কঁাকা আওয়াজ।

কিন্তু নিরাপত্তা ও নিরাপেক রসভঙ্গী স্বীকার করেন যে, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবলৌকিকমতে ঘটেছে আঙ্গিকের পরিবর্তন,—ভাব ও রূপ একনিয়ম হ'য়ে, সকল অসংলগ্নতা ও অবিবোধিতা সমন্বিত ও একমুখী হয়ে অনবদ্য রসমুগ্ধি লাভ করেছে। নূতন ভাব প্রকাশের প্রয়োজনেই নজরুল প্রয়োগ করেছেন নূতন চন্দ্রবীতি: 'বিদ্রোহী' সমিল নৃত্যক নাত্রাবৃত্ত বীতিতে বিরচিত—এই নূতন বীতি নজরুলের নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু এই স্তম্ভিকপিত বীতির স্বনি-গোষমা অনুধাবনা করতে না পেরে শ্রীপ্রব্রজ্ঞ মিত্র তাকে ভেবেছেন: "বিশৃংখল ছন্দ" (শেষ সংখ্যাত: ভূমিকা)। পরগণ্ডারে চন্দ্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: "তঁার (নজরুলের) বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় নূতন চন্দ্র-প্রস্থানের বদলেই ইচ্ছিত আছে।"—(বাংলা ছন্দ-সর্বোচ্চ, ৮১ পৃষ্ঠা।)

তবু টেকনিক নিয়ে নয়, নজরুলের কবিতায় ভাব-মাহাত্ম্য নিয়েও দেখা যাচ্ছে মত-পার্থক্য। ১৩৩৬ অগ্রহায়ণের 'উপাগম' পত্রিকায় শ্রীনির্মলকুমার গোস্বামীস্বামীর লেখন: :

আমাদের তথাকথিত কোনও 'বিদ্রোহী' কবি বড় আশায় তার ঠিকিয়া নকল পৌকমের অভিনয় করিতে পাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু হায়! 'বুনবুন'-এবং গান হাঁচাকে লজ্জাকরী নতীর পাশে আনিয়া তেলিয়াছে।

১৩৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নজরুল ইসলাম' পুস্তকে সৈয়দ আলী আহসান বলেন:

নজরুলের খ্যাতি 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্যই। 'বিদ্রোহী' সংঘত শোভার মধ্যে এক অমাসৃষ্ট—সফাফে খোবনের গতি-চকলত্র। ----- 'বিদ্রোহী'তে যৌবনের আবেগ রূপ পায় নি। 'বিদ্রোহী' অক্ষর কাব্য হ'তে পারে নি।

১৩৬৫ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখেই দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় শ্রীযুক্তকুমার ভারগ তাঁর 'দৈনিক কবি নজরুল' প্রবন্ধে লেখন:

(কবাজীতে) সাময়িক বিভাগের কাজ করাও করতেই নজরুল 'কামান পাশা', 'বিদ্রোহী' ও আরো নানান বিখ্যাত কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও বাঙালীকে শোষাবোধে উত্তোষিত করতে পেরেছিলেন। মিনিটারের চাকরী ছেড়ে আগার পূর্ব থেকেই পুলিশের দাবীগাগিনিব কাছের বন্দোবস্ত ক'রে বেধেছিলেন। কিন্তু তাঁর গায়ে স্বপ্নের গন্ধ * পাওয়ায় তাঁকে সরকারী কাজ গ্রহণ করা শেষ পর্যন্ত হয়নি।

নজরুলের জীবনবৃত্ত ও কাব্য-ভাবনা নিয়ে উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে একরূপ অসার তত্ত্ব ও জ্ঞান তথা পদ্ধতিবোধের মূলে প্রধানত: জিয়া করেছে নজরুল-মানুষের সঙ্গে এসকল সমালোচকের মনের প্রস্থান-

ভূমির প্রভেদ। স্ববীজনাথ তাঁর 'উজ্জ্বল' কবিতায় বলেন: "বড় শুধু আগে কণেকের ভরে স্বজনের এক তুল।" তিনি ষড়কে ভেবেছেন: "কোখাকার এই শূন্য-হেঁজা সটীজাড়া এ বাখা।" পঞ্চান্তরে নজরুল তাঁর 'প্রলয়োন্মাদ' কবিতায় ষড়কে বলেন "নৃতনের কেতন", তাঁর কবি-কল্পনার 'ষড়' হচ্ছে স্বংসের প্রতীক এবং সেই 'স্বংস' হচ্ছে "নৃতন স্বজন-বন্দন"—জা 'সটীজাড়া বাখা' নয় বা 'মনাসটী' নয়। স্ববীজনাথ ও তাঁর চিন্তার অনুসারক উপযোক্ত সমালোচকেরা প্রচলিত পুরাতন সমাজ-বান্ধার যুগোপযোগী সংস্কার তথা বেরান্ড ক'রে তাকেই টিকিয়ে রাখতে চান; পঞ্চান্তরে নজরুল মনে করেন যে তাতে গণমানুষের সমুচ্চ কল্যাণ আসবে না, যে পুরাতন জীর্ণ সমাজ-বান্ধা প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বংস হ'তে চলেছে তাকে সংস্কারের ছোড়াটানি দিয়ে স্বজা করার প্রয়াস কালের আঘাতে ব্যর্থ হতে বাধ্য—তাই নিপুণ তথা যাবুল পরিবর্তনই হওয়া উচিত দেশেবকদের আত্ম নক্স। সমাজের কঠোরো হবে উদার মান্যনীতির ভিত্তিতে স্থপতিত এবং আর্থনীতিক উৎপাদনের উপায়সমূহ হবে জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন—সর্বপ্রকার বৈষম্য ও শোষণের স্বহিতকদম তবে মর্ষ-বিধানের অনিচিত ফলশ্রুতি; এই মানবিক দাবী ও অধিকার দামাদেশ কখনই নজরুলের কবিতা ও গানের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মৌন বিষয়ের প্রতি মানসিক প্রতিফলনটাই নজরুল-সাহিত্যের ভাববস্তু ও প্রকাশভঙ্গী বিনোদিত সংস্কারবাদী তথা নিপুণ-বিরোধী লেখকদের করেছে তৎপর ও প্রাণোদিত,—নজরুল সম্বন্ধে তাঁদের বিকল্প সমালোচনায় আছে তাঁদের শ্রেণীউপচেতনারই স্বাভাবিক প্রতিফলন।

নজরুলের 'বিরোধী' প্রকাশিত হলে পঁচ ত্রি প্রতিবাদ ক'রে 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকিম "বিরোধ-মনন" ও মোহাম্মদ গোলাম হোসেন "প্রলয়-ভেরী" এবং 'সপ্তপাতি' পত্রিকায় গোলাম বেহরুল "নিষিদ্ধ" লেখেন; এসকল বেউড়-শ্রেণীর পক্ষা বিমল কাব্যরসের প্রেরণা নেই,—যাচ্ছে সংকলনবুদী ধর্মবুদ্ধির অঙ্গমত উদ্ভাব। তাই দাম্যজ্ঞানের সর্বধক শ্রেণীচেতনা থেকে উদ্ভূত নজরুল-বিরোধিতা যেমন পঞ্চাশতাব্দীর সাহিত্য-বিচারে উপেক্ষণীয়, তেমনই য়া বর্জিত থেকে উৎকিষ্ট নজরুল-নিক্সাও সমভাবে অপাত্তের।

নজরুল-সাহিত্যে আছে নৃতন ভাব ও তার প্রকাশোপযোগী নৃতন আঙ্গিক। তাঁর বিষয়-কল্পনার নাস্ত্য এবং উপহাস-পন্থার শিবপন্থা অনাসক্ত মনে বিশ্লেষণ ক'রেই তাঁর সটীর বৈশিষ্ট্য ও স্বর্ণ নিক্ষেপন কবতে হবে,—যেক্ষেত্রে সমালোচকের ব্যক্তিগত ক্ষতি বা সংস্কারগত নীতির নিরিখে বিচার ঘটন ও যথোচিত। নজরুল-সাহিত্য-বিচারের প্রকৃত অধিদারী তিনিই হলেন, নজরুলের সাহিত্য-ভাবনা ও কপাঙ্কন-নীতির প্রতি গাঁর সহানুভূতি হবে অকৃত্রিম ও অবিদ্যত। সেই সহনবিতা, অবিষেধ বা অনুরাগ ফুটে ওঠে মিলিত মন নিয়ে নজরুল-সাহিত্য অধ্যয়নে নির্ভেদ অভিনিবেশ, ঔৎসুক্য ও নিষ্ঠা থেকে। ইসলামী ভাব সর্বোত্তম পরিচয় দিয়েছেন শাহাবুদ্দীন আহমদ, কালে তাঁর নজরুল-সমালোচনা আবারে সাহিত্যের এই বিভাগে সমুচ্চ নীর্ঘে স্থান পেয়েছে। শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর কোনো পূর্বপোষিত সংস্কার বা সংকীর্ণ আঙ্গনের মানসেই পরিমাপ ক'রে নজরুল-সাহিত্য পাঠ করেন নি,—তিনি অমপেক্ষ দৃষ্টেই নজরুলের অভিন্ন বিষয়-ভাবনা ও রূপ-বীজের প্রাণীত আলোকেই তার নিগূঢ়র বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য অবলোকন করেছেন; ফলে সেই সাহিত্যের স্বরূপ ও চর্যকারিষের যাচাই তাঁর হাতে হয়েছে যথাব ও অজাবীর লক্‌তার দাবীদার।

শ্রীমুক্‌শের বস্তুর 'প্রগতি'-তে নজরুলের 'বিরোধী'কে বলা হয় তাঁর 'প্রথম কবিতা'। একপ দাত তথা অনাত্তও পরিবেশিত হতে দেখেছি। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'বৃষ্টি'। 'বিরোধী'

প্রকাশের পূর্বে নজরুলের অর্ধশতেরও অধিক কবিতা ও গান প্রায় হয়েছিল। তাদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১। 'বুজি'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৬।
- ২। 'কবিতা-সন্ধ্যা'—সপ্তগাত, আশ্বিন, ১৩২৬।
- ৩। 'আশায়' (হাফিজ হইতে)—প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৬।
- ৪। 'প্রিয়ান দেওয়া শরান'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৭।
- ৫। 'মানিনী বধুর প্রতি'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৭।
- ৬। 'উষোষন'—সপ্তগাত, বৈশাখ, ১৩২৭।
- ৭। 'চিঠি'—বঙ্গনূর, বৈশাখ, ১৩২৭।
- ৮। 'বোধন'—বোসলেন ভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
- ৯। 'শাত-ইল-আরব'—বোসলেন ভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
- ১০। 'কালোর উকিল'—নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
- ১১। 'বাদল-প্রান্তের শরাব'—বোসলেন ভারত, আষাঢ়, ১৩২৭।
- ১২। 'বকুল'—বকুল, আষাঢ়, ১৩২৭।
- ১৩। 'স্মরণে' (গান)—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৭।
- ১৪। 'খেয়া-পারের তরণী'—বোসলেন ভারত, শ্রাবণ, ১৩২৭।
- ১৫। 'সুল্লরী'—বঙ্গনূর, ভাদ্র, ১৩২৭।
- ১৬। 'কোরবানী'—বোসলেন ভারত, ভাদ্র, ১৩২৭।
- ১৭। 'গরীবের বাখা'—বঙ্গনূর, আশ্বিন, ১৩২৭।
- ১৮। 'মোহনরম'—বোসলেন ভারত, আশ্বিন, ১৩২৭।
- ১৯। 'দূরের বন্ধু' (গান)—বোসলেন ভারত, কাভিক, ১৩২৭।
- ২০। 'অবেলার'—সাধনা, কাভিক, ১৩২৭।
- ২১। 'বাঁশীর বাখা' (রুমী হইতে)—বঙ্গনূর, কাভিক, ১৩২৭।
- ২২। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্জহ্ন' : আবির্ভাব—বোসলেন ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।
- ২৩। 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : গল্প : ১-২ বোসলেন ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।
- ২৪। 'মা'—নারায়ণ, ১৩২৭।
- ২৫। 'আপা' (গান)—বোসলেন ভারত, পৌষ, ১৩২৭।
- ২৬। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' : গল্প : ৩-৪—বোসলেন ভারত, পৌষ, ১৩২৭।
- ২৭। 'কলঙ্ক প্রিয়' (আপা)—সপ্তগাত, পৌষ ১৩২৭।
- ২৮। 'বিরহ-বিধুবা'—বোসলেন ভারত, মাঘ, ১৩২৭।
- ২৯। 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : ৫-৬—বোসলেন ভারত, মাঘ, ১৩২৭।
- ৩০। 'বেদন-হারা' ('প্রতিবেশিনী')—সপ্তগাত, মাঘ, ১৩২৭।
- ৩১। 'বরষা' (গান)—বোসলেন ভারত, ফাল্গুন, ১৩২৭।
- ৩২। 'গৌহ-ভীতু'—বোসলেন ভারত, ফাল্গুন, ১৩২৭।

- ৩৩। 'নিরুদ্দেশের স্বামী'—নারায়ণ, চৈত্র, ১৩২৭।
- ৩৪। 'পলাতক'—ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৮।
- ৩৫। 'মহন-স্নান'—নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২৮।
- ৩৬। 'সাক্ষান'—সাধনা, বৈশাখ, ১৩২৮।
- ৩৭। 'বিভব-গান'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৮।
- ৩৮। 'উৎসর্গ' ('অগ্নিবীণা'র উৎসর্গ)—উপাসনা, শ্রাবণ, ১৩২৮।
- ৩৯। 'দুপুৰ-যজ্ঞসার'—ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২৮।
- ৪০। 'লক্ষ্মীছাড়া'—উপাসনা, ভাদ্র, ১৩২৮।
- ৪১। 'স্নানোত্তর'—নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২৮।
- ৪২। 'পাপন পথিক' (গান)—মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৮।
- ৪৩। 'কায় বাঁশী বাজিল?'—মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৮।
- ৪৪। 'কবির চাওয়া'—সাধনা, ভাদ্র, ১৩২৮।
- ৪৫। 'অক্লুপ প্রিয়'—নারায়ণ, আশ্বিন, ১৩২৮।
- ৪৬। 'সপাতেরী'—সাধনা, আশ্বিন, ১৩২৮।
- ৪৭। 'সাগরী'—উপাসনা, আশ্বিন, ১৩২৮।
- ৪৮। 'বাকল-দিনে'—মোসলেম ভারত, আশ্বিন, ১৩২৮।
- ৪৯। 'চিরস্থায়ী প্রিয়'—সান্দ্যা ও মনোবীণা, কাটিক, ১৩২৮।
- ৫০। 'সরণ-সরণ'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, কাটিক, ১৩২৮।
- ৫১। 'আনোয়ার'—সাধনা, কাটিক, ১৩২৮।
- ৫২। 'কামল পাশা'—মোসলেম ভারত, কাটিক, ১৩২৮।
- ৫৩। 'বিদ্রোহী'—মোসলেম ভারত, কাটিক, ১৩২৮।

['বিদ্রোহী' ২২শে পৌষ ১৩২৮ তারিখের সাপ্তাহিক 'বিজলী', ১৩২৯ মাসের 'প্রবাসী' এবং ১৩২৯ বৈশাখের 'সাধনা' পত্রিকায় সংকলিত হয়েছিল।]

এগুলি ছাড়া এই সময়ে 'বিজলী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকায় নজরুলের আরও অনেক কবিতা ও গান মুদ্রিত হয়েছিল। তাই সম্পূর্ণ তালিকা নবীন নজরুল-প্রবন্ধলেখক প্রস্তুত করবেন।

উক্ত সময়েই মধ্য মাসিক 'সপ্তপাতি' পত্রিকায় নজরুলের 'কবিতা-সম্মিতি', 'উদ্বোধন', 'কলঙ্কী প্রিয়' ও 'নেলন-স্নান' শিরোনামে চারটি কবিতা, 'বাউড়েলের আত্মকাহিনী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) শীর্ষক ছোট গল্প এবং "তুর্ক নজিয়ার ঘোমটা-খোলা" (কাটিক ১৩২৬) নামক সমালোচনা-নিবন্ধ, এই ছয়টি রচনা স্বাক্ষর প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৮ মাসের 'সপ্তপাতি'-এ নজরুলের 'আবহন' নামে একটি সাধারণ পদ্য ছাপা হয়েছিল; সেই সংখ্যাতেই আর হয়েছিল গোলাম মোস্তফার 'নিরস্তিত'; কলে প্রথম পর্বাবের 'সপ্তপাতি'-এ নজরুলের লেখা আর দেখা গেল না। নব-পর্বাবের ১৩৩৩ আশ্বিনে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যক 'সপ্তপাতি' প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৩ আশ্বিনে নজরুলের 'সর্বস্বা' কাব্যের উৎসর্গ-কবিতাটি 'সর্বস্বা' (রচনা : কলকাতা, ১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৩) শিরোনামে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, নজরুলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অগ্নি-বীণা'র কোনো কবিতাই 'সওগাত'-এ বুদ্ধিত বা সংকলিত হয়নি। তৎসঙ্গেও গুণগ্রাহী শাহাবুদ্দীন আবেগভরে বলেছেন :

বন্যবাদ 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে, তিনি নজরুলের প্রথম গল্প 'বাউঙেলের দায়কাহিনী' সওগাতে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীমুহম্মদেব মস্তুর 'প্রগতি' নজরুলের "তোরা সব জয়যবনি কর" গুনে ভেবেছে তার "অধিকাংশ কাঁকা আওয়াজ।" শ্রীনির্ভলকুমার বোম দস্তিদার 'উপাসনা'-র আরম্ভিতে নজরুলের 'বিত্রোহী'-তে লেখেছেন "নকল পৌরুষের অভিনয়।" অতঃপর সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন যে, নজরুলের "আদর্শ-বিলাস হলো প্রথমতঃ নিপীড়িতদের প্রতি মমতাবোধ, দ্বিতীয়তঃ দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদ্যম আবেগ।"—(নজরুল ইসলাম : একটি মন্তব্য : কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা)। কিন্তু বিপ্লববাদী নজরুল তাঁর সক্রিয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিপক্ষে এবং নির্ধাতিত মেহনতী জনতার সম্পক্ষে অস্বার্থ ভাষায় আপোষহীন সংগ্রামের আদান-বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। 'চিত্র-বিত্রোহী' বলেছেন :

বিত্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিনয়।

তোমার ধরার দুঃখ কেন

আমায় নিতা কাঁদায় কেন?

নিশুংখল ফটি তোমার, তাই ত কাঁদে আমার প্রাণ॥

বিত্রোহ মোর পান্বে কিসে, ভুবন-ভরা দুঃখ-শোক।

আমার কাছে শাস্তি চায়

লুটিয়ে পড়ে আমার গায়—

শাস্ত হ'ব আগে তা'রা সর্বদুঃখ-মুক্ত হোক॥

সামাজিক দায়িত্ববোধে উজ্জ্বল নজরুলের মনে হয়েছে মজলই সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই সত্য সৌন্দর্যের নামাস্তব। 'উরবানির সংঘাতে বিকীর্ণ সৌন্দর্য তদ্বীক্ষেই কুনে শিশিরে বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য অপেক্ষা নজরুলের চোখে হয়েছে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। তাই নারীপ্রেমের নতিত আপ্সান উপেক্ষা ক'বে তিনি বারবার গাড়া দিয়েছেন মজনের উনাত আপ্সানে, প্রিয়ার মেওয়া কুলমালা ধুলার কেলৈ দিগে সানন্দে পাবেছেন বিত্রোহী'র বর্ণবেশ। দুঃখক্লিষ্ট ভগবতের ব্যাপার দেখে' চমকিত হয়ে ভেবেছেন :

প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়-পর্য নর্তকী?

নজরুলের এ-ধরনের দু'টি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শাহাবুদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেছেন :

কোনো বিলাসী, সাহিত্য অথবা শিল্প-বিলাসী, কবি-সমালোচকের পক্ষে এবং সম্পূর্ণ মনুভূতি হৈন পাওয়াও সম্ভব নয়। কবির মতো সব-পর্ষায়ে বিনাশ জন্ম তিনু এর
* গুরুত্ব অনুধাবন অসম্ভব।

আদল কথা, আত্মকেষ বিশু-মানবের বহুস্তর আদর্শ যে সমাজতাত্ত্বিক মানবিকতা (Socialist Humanism), তার বিকল্পবাদী কোনো পন্থাংগণী লেখকের পক্ষেই নজরুলের প্রত্যয়ের ঐকান্তিকতা

ও উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। দেশের 'স্বাধীন' শ্রেণীর উদ্দেশ্যের সাহিত্যিকেরা মনে করেন যে, তথাকথিত 'সত্যদৃষ্টি গ্রুটোর' কাজ হচ্ছে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার জীর্ণ ছিন্ন খামড়ানি বখাসত্ত্ব তালি দিয়ে তাকেই বহাল রাখার বাণী প্রচারণা, তার আমূল সংস্কারের বহু উচ্চারণ অসত্য-দৃষ্টি অপগ্রুটোর অপকার্য। এবং বিপ্লুবাদীর দৃষ্টি 'অনাসৃষ্ট'।।

নাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর 'শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন :

নজরুলের কাব্যের একটি বিশেষ সৌন্দর্য : দীপ্ত বর্ণোচ্ছলতা। - - -

কবিতায় একটি কারণে রঙ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, আর তা হ'ল এই যে, কবিতা চিত্র না হলেও চিত্রকল্পের সমাহার। - - - -

সম্ভবত: জীবনানন্দ দাশ রঙের তুলীতে কবিতায় ছবি আঁকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং নজরুল এ-ব্যাপারে জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠতর পূর্বসূরী।

নজরুলের ব্যবহৃত উপমা (Simile) ও তুলনা (Comparison) নয়, তাতে উপরন্তু প্রতিভাত হন স্তম্ভর চিত্র; তাই তাঁর অনেক উপমা হয়েছে চিত্রোপমা (Imagery)। একটি নমুনা তুলি:

চাঁদ ঘেরিতেছে চাঁদ-বুধ তার সরসীর অরশিতে।

ছোট্টে তরঙ্গ বাসনা-ভ্রম সে-অঙ্গ পরশিতে।।

—['চাঁদ-বুধ' : ভাষা-গীতি]

এখানে কবির সৌন্দর্য-চেতনা ও সংবেদনশীলতা একত্র হয়ে অন্যায়সে প্রমুগ্ত করেছে একটি অপূর্ব অনবদ্য চিত্রকল্প,—তাহে প্রকৃতি-বর্ণনা হয়েছে প্রাণবন্ত ও প্রাণম্পর্শী। বলা বাহুল্য যে, এখানে হৃদয়-সংবেদনা রসপ্রতিমা সৃষ্টিই হয়েছে কবির লক্ষ্য। কিন্তু যেখানে নজরুল তাঁর অনজ্ঞাপরম্পূরক কবিতায় এক্ষণ উপমা প্রয়োগ করেছেন, সেখানে সৌন্দর্যকল্পনা ও বর্ণনামোহন সমন্বিত হয়ে জ্ঞাপের অনিন্দ্য রসবিগ্রহ নির্মাণ করেছে। তার কিছু নজির দিচ্ছি:

যে ইস্রাকিল প্রলয়-নিজা বাত্মানেন কেয়াসে—

তারি লনাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে। - - - -

আমার গুণ শোধ করো, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ;

আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেব আকাশে ইদের চাঁদ।

তোমারে নাশিতে চাষার কান্ডে কি রূপ ধরেছে, দেখ;

চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ; সেবে' মনে রেখ। - - -

এসেছে ইদের চাঁদ বরাতর দিতে আমাদের ভরে,

যাবার খালেও এসেছে আকাশে বাঁকা তুলোয়ার লয়ে।

এখানে 'ইদের চাঁদ' উপরেষ; এবং ইস্রাকিলের 'লনাটের চাঁদ', 'বাঁকা ছুরি,' 'চাষার কান্ডে,' 'গলার ফাঁদ' এবং 'বাঁকা তুলোয়ার' প্রকৃতি উপমান ব্যবহৃত হয়েছে স-গ্রামী চেতনার প্রতীক রূপেই। এ-সব উপমান কবিতার আবেদনকে করেছে তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত।

এ-প্রসঙ্গে 'কাস্তে' উপন্যাস এবং 'চাঁদ' উপন্যাস রূপে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। তুর্গেনিভের সুবিখ্যাত 'একটি জীবন্ত ধ্বংসাবশেষ' নামক ছোট-গল্পের পছন্দ মেয়ে 'লুকের্যা' বলছে :

আমার হাতে রয়েছে একখানা কাস্তে। সাধারণ কাস্তে নয়। সেটাকে বোম্ব হতে লাগলো স্বয়ং চাঁদ- - - - - চাঁদটা যখন কাস্তের মতো দেখতে হয় সেই স্বপ্নের। আর এই চাঁদটা দিয়ে আমারে গরমলো কাটিতে হরেছিল পরিচকার ক'রে।

এই চিত্রকল্পটি ভেঙে শ্রীস্বধীজ্ঞানাম দত্ত একালে লিখেছেন :

আকাশে উঠছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-মুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকালো আস্তে আস্তে।
—['কাস্তে', সংবর্ত]

এই ধূশোপন্যাস অনুসরণে পরবর্তীকালে শ্রীদিনেশ দাস তাঁর 'কাস্তে' কবিতায় লিখেছেন :

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?
চাঁদের শতক যাক নহে তো
এ-মুগের চাঁদ হলো কাস্তে।

বিপ্লবী কৃষক শ্রমিকের সংঘর্ষ সংগ্রামের প্রতীক 'কাস্তে' ও 'হাতুড়ি',—কৃষকের কাস্তে ও শ্রমিকের হাতুড়ি যুক্ত হ'য়ে তাদের আত্মজাতিক পতাকায যাক শোভিত। নজরুলের কবিতাটিতে 'কাস্তে', 'চুরি', 'ভালোয়ার' প্রভৃতি উপন্যাস ব্যবহারের মূল রূপকটির অপেক্ষা প্রধানত্ব হয়েছে মানবিকতার প্রেরণা। তাঁর সমাজচেতনাপ্রসূত কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত একরূপ উপমাপুঞ্জ এই প্রেরণা-সঙ্গীত হয়েই লাভ করেছে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য; তাতে কাব্যভাবের অনন্তবর্ণের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন দিগন্ত। বাঙলা কাব্যসাহিত্যে নজরুল যে নব্যধারার প্রবর্তন করেছেন, তার অসামান্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নিসীড়িত মানবতার প্রতি স্মিবিড় সহানুভূতি এবং সেই অমর্য্য ভাব শিল্পসম্মত উপায়ে প্রকাশের উপযোগী অভিনব আঙ্গিক।

নজরুল-সাহিত্যের এই স্বকীয়তা ও তার নতুন স্বীকৃতি-নৈপুণ্যের প্রবণতা শাহাবুদ্দীন সম্যক উপলব্ধি করতে পেয়েছেন ব'লেই তাঁর সুন্দর হাতে তার বিশদ বিচার হয়েছে স্বার্থ ও সার্বক।

শাহাবুদ্দীনের 'নজরুল-সাহিত্য-বিচার' পুস্তকখানিতে মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ : 'নজরুল-চর্চা : দেশে বিদেশে।' তাতে শাহাবুদ্দীন বলেছেন যে, নজরুল-বিষয়ে "বিভাগ-পূর্ব বাঙলার প্রথম গ্রন্থ অধ্যাপক আবুল ফজলের 'বিজ্ঞোহী কবি নজরুল'; ১৯৪৭ সালের মার্চে (চৈত্র, ১৩৫৪) এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।"—গ্রন্থখানির গোড়ার আবুল ফজল 'লেখকের কথা' শিরোনামে যে-ভূমিকা লিখেছেন, তার শেষে রচনার স্থান ও কাল মুদ্রিত আছে : "সাহিত্য-নিকेतন, চট্টগ্রাম; চৈত্র, ১৩৫৪।" এ থেকে ধারণা হয় যে, ১৯৪৪ সালের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের

চৈত্র বুদ্ধাব্দিক ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। এটা “বিভিন্নসূর্য-কাল” নয়,—বিভাগোত্তর কাল। সৈয়দ আলী আহসান ১৩৬১ সালের তৈয়্যে মাসে প্রকাশিত তাঁর ‘নজরুল ইসলাম’ পুস্তকের শেষে “নজরুল ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনা” শিরোনামে “কয়েকটি সংকলন ও আলোচনা-গ্রন্থের উল্লেখ” করেন এইভাবে:

নজরুল-প্রতিভা : কাজী আবদুল ওবদুল

গ্রন্থটির প্রধান অংশ হচ্ছে কবির জীবনী—লেখক আবদুল কাহির। কাব্য-সমালোচনা কাজী আবদুল ওবদুলের। আলোচনা-অংশটি স্বল্প-পরিমিত, কিছু পাঠ-বদ্ধ।

বিশ্রোহী কবি নজরুল : আবুল ফজল

নজরুল ইসলামের জীবনী—ছাত্রদের জন্য সরল ও মনোজ্ঞ করে লেখা।

নজরুল-সাহিত্যের ভূমিকা (১ম খণ্ড) : শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী

একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নজরুল কাব্যের বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচিতি ও আলোচনা।***

কাজী আবদুল ওবদুলের ‘নজরুল-প্রতিভা’ ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখ শাহাবুদ্দীন করেননি। তাতে “নজরুল ইসলাম,” “নজরুলের প্রতীক-প্রীতি” এবং “আমি আপনাকে ছাড়া করি না কাহাবে কুনিশ” নামক তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। (শেষোক্ত লেখাটি থেকে আবুল ফজল তাঁর বইয়ের ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় সুসীর্ণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।) ১৩৪৮ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলকাতার ডেন্টাল কলেজ-হলে মুসলিম সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে নজরুলের ৪৩-তম জন্ম-বাধিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়; সেই সভায় কাজী আবদুল ওবদুল তাঁর ‘নজরুল ইসলাম’ পাঠ করেন। এটি প্রথমে ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘আজকার কথা’ নামক পুস্তকের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছিল। (সেই লেখা থেকেই আবুল ফজল তাঁর পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় কিয়দংশ উৎকলন করেছেন)। তাঁর অপর দুটি প্রবন্ধ ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক ‘বাঙালী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই তিনটি লেখাই ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘শান্ত বঙ্গ’ নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আবুল ফজল তাঁর ‘সেখাচিত্র’ পুস্তকের ৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

১৯৪৭শে ‘বিশ্রোহী কবি নজরুল’ নামে আমি একটি ছোট বই লিখেছিলাম—খুব পড়ীর আর নজরুল-সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটি সহজপাঠ্য করেই বইটি লেখা। বইটি সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিদের অতৃপ্তন হিসেবে তাকা সেকেন্ডারী বোর্ডের অনুরোধনও লাভ করেছিল এবং একটানা প্রায় পাঁচ বছর পাঠা ছিল।

এই বইটি সম্পর্কে মরহুম অধ্যাপক আনোয়ার পাশা তাঁর ‘সাহিত্য-বিশ্বী আবুল ফজল’ পুস্তকের ২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

পাকিস্তানে কবি নজরুল ইসলামের উপর একখানি পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রচাস এট প্রথম।

বস্তুত, 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' বিভাগপূর্ব-কালের প্রকাশনা নয়। কিন্তু কাজী আবদুল ওবুদের 'নজরুল-প্রতিভা' পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তাঁর তিনটি প্রবন্ধই বিভাগপূর্ব-কালের রচনা এবং বিভাগপূর্ব-কালেই প্রচারিত। শাহাবুদ্দীনের তালিকার বাংলাদেশে বৃদ্ধিত নজরুলের জীবন ও সাহিত্য-সম্পর্কিত ৬-সংখ্যক 'বহুচিত্র একক গ্রন্থ' :

৬. নজরুল-কাব্য-পরিচিতি : ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৯৪৯)।

কিন্তু ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের 'নজরুল-কাব্য-পরিচিতি' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কাল : '১৯৫৫ সন'—'১৯৪৯' নয়।

বঙ্গের আলী মিঞা তাঁর 'জীবনশিখরী নজরুল' (১৯৭১) লেখার আগে 'ডোন্টদের নজরুল' (২য় পৌষ ১৩৬৮) লিপেছিলেন ; তার উল্লেখ অনাবশ্যক বাছলো নয়। শাহাবুদ্দীনের তালিকায় শ্রী-প্রবোধচন্দ্র সেনের KAZI NAZRUL ISLAM (Karachi, 24 May 1956) পুস্তিকাকানির নামও নেই। বাড়লা সঙ্গীতে ও কাব্য-সাহিত্যে নজরুলের স্থান নির্ণয় ক'রে প্রবোধচন্দ্র তাতে বলেছেন :

As regards his musical compositions which number more than fifteen hundred, a number that rivals that of Rabindranath alone, it may perhaps be said without fear of contradiction that he ranks as the most prolific composers of all times.....

But whatever his fate as a composer, indications of history are always there for us to believe that a place of honour in the rank next to that of Madhusudan and Rabindranath is assured to him as a poet, and among Muslim poets of Bengal his place is beyond doubt second to none.

নজরুলের গান ও কবিতা সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের এই নির্মোহ সন্নীক। যে শ্রীজীবনানন্দ দাশ, শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার, সৈয়দ আলী আহসান, আজহারউদ্দীন খান প্রমুখের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্রটিসন্ধানপর সমালোচনা অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞানগর্ভ ও সারবান, এ-কথা সাহিত্য রসিকেরা স্বীকার করেন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ-অধ্যাপক ও শাস্ত্রনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্রের ধারণা যে, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের গানের প্রায় সমান, অর্থাৎ পনের শতেরও অধিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে, নজরুল তিন হাজারেরও বেশী সংখ্যক গান লিখেছিলেন এবং ইতোমধ্যেই তাঁর রচিত প্রায় দুই হাজার গান সংগৃহীত হয়েছে। সুরশ্রুটী নজরুলের ভাগ্য ভবিষ্যতে কিরূপ নিম্নলিখিত হবে, সে-বসয়ে প্রবোধচন্দ্রের মনে সন্দেহ কারণেই সংখ্যের কীধ রেখা দেয়া দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন :

১. নজরুলের সুর দেওয়া গানে সুনিশ্চিতভাবে একটা নজরুলী হং আছে। তীক্ষ্ণবোধ-সম্পন্ন, নিখুঁত শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ একদল শুধী মানুষ যদি শাস্ত্রনিকেতনের মতো গানের বিদ্যায় খুলে কেবলমাত্র নজরুলের গান প্রচারের চেষ্টা করেন, তা হ'লে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মতো নজরুল-গীতি বেশ স্বতন্ত্র একটা গর্বের শির তুলে দাঁড়াতে পারবে।

—[১৫৮ পৃষ্ঠা]।

২. বাংলাদেশে এবং পশ্চিম-বঙ্গে আজ কাল নজরুল-গীতির চর্চা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু আশানুযায়ী নয়। ভারতীয় সঙ্গীত-জগতের সুর-সৌরভোৎসব উজ্জ্বলত্ববশত অন্যতম এই মহাদ্যোতিষের সঙ্গীত সাধনার পটভূমি, ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যময়িক বহিরা নিয়ে প্রবেশপাথ সাধনাতত্ত্ব নিদর্শন কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। না পশ্চিম-বঙ্গে, না বাংলাদেশে। নজরুল-সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার যতো উপলব্ধি শুধু আজকের বাংলাদেশে এবং পশ্চিম-বঙ্গে একজনও আছেন বলে আমার জানা নেই। সুধের কথাই চিড়ে ভিজে না। সঙ্গীত কঠিনতম শাস্ত্র, দুঃসহন্য শিক্ষা। বাণী-প্রধান সঙ্গীত শুদ্ধতম উচ্চারণশূন্য। সেই সঙ্গে সঙ্গীত-শুধুর এই বারণা থাকা প্রয়োজন : নজরুল তিন থেকে চার হাজার গান নির্বেচ্ছিনেন। আর সে গানে আছে এক শ্রেষ্ঠ কবির গভীর জীবনানুভবের বিচিত্র বন্যাতাত্ত্বিক বাণী, এফ নাটকীয় ভঙ্গীর বিশেষ দোহতা, কাব্য ও সুরের সুস্পষ্টতম স্বনি ও ছন্দ-বাঁধনা।

—[৩৬ পৃষ্ঠা]।

পাহাবুকীনের এ-সকল কথায় উদ্দীপিত ভাবের আবেগ, বিশেষণী বৃদ্ধির দীপ্তি ও সঙ্গীতের স্বরূপ উপলব্ধির সামর্থ্য সুপরিস্ফুট।

শুধু নজরুলের গানের উপকরণ ও আঙ্গিক নিয়ে নয়, তাঁর কবিতা, অনুবাদ-কাব্য, গীতিনাট্য, নাটক-নিবন্ধ, বক্তৃতা-ভাষণ, চিঠিপত্র, ছোট-গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি নিয়েও পাহাবুকীনের আলোচ্য পুস্তকে সবসময় অখণ্ড পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভাববৈশিষ্ট্য ও বিচলনোদ্ভূত সম্পর্কে পাহাবুকীনের কয়েকটি মনোভ্রম ও সারগর্ভ মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত করছি।

১. জয়প্রীতা হতে গেলে ভাবকে জয়-হারী হ'তে হয়। কবিতার যতো পক্ষোণ্ড নজরুল ইসলামের বাঁধনা সাহিত্যে এই জয়-ভাষার শূন্য।

—[নজরুল ইসলামের গদ্য]

২. নজরুল ইসলামের গদ্য-রচনা, নিবন্ধ, ছোট-গল্প, নাটক বসিকজনের চিত্তাকর্ষণে সার্থক। যদিও এই বিভাগটিতে তাঁর সাফল্য তাঁর কাব্যশক্তি ও শব্দশক্তির তুলনায় বলিহীন, তবুও সন্দেহ নেই, বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক্য তিনি উন্নতমস্তক স্বাভাব্যগণের একজন।

—[গানের সাম্রাজ্যে নজরুল]

৩. বোণীর ধ্যানই গান; যাতে থাকবে স্বামির অশূন্য বিন্যাসের সঙ্গে সংহত আবেগ এবং ভাবনার সংশ্লিষ্ট। নজরুল ইসলামের গানে ত্রিভুজ, বেলোডি যার-চারমির সঙ্গে সংহত আবেগের প্রকাশ লক্ষ্যীয়। শিল্পের ঐ কঠিন অনুশাসনে তিনি অশূন্য মৌল্য নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন বলে আমার। তাঁকে উজ্জ্বলপ্রবণ কবি বলি না, বলি মহত্তম কবি-শিল্পী।

—[সনেট ও নজরুলের গান]

৪. আংটির উপর নকশা আঁকা এক ধরনের আঁট এবং পাহাড় কুঁদে মৃতি বানানোও এক ধরনের শিল্প। কিন্তু পাহাড় কুঁদে বড় বড় মৃতি বড় বড় শিল্পীরাই নির্মাণ করেন; কুঁদে শিল্পীরাই এই আংটির উপর চমৎকার নকশা আঁকেন।

সঙ্গীতের লেখক হিসেবে নজরুল ইসলামের অসামান্য কৃতিত্ব সন্দেহও সেখানে তিনি যে কাজ করেছেন তা এই কুঁদে শিল্পীর—যদিও বৈচিত্র্যের জন্যে, বিশালতার জন্যে এবং বিচিত্র ভাব ও স্তরের সম্মিলনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে, মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতিকে চমৎকারভাবে রূপদানের জন্যে সেখানেও তিনি ক্ষুদ্রত্বের সীমা ডিঙিয়েছেন—চিত্রকল্প, উপমা ও রূপকের অসামান্য উপস্থাপনার জন্যে তিনি বিরচিত লাভ করেছেন। তবু আমার মনে হয়, 'অগ্নি-বীণা', 'গিছু-হিম্মোল', 'জিহ্বীর' ও 'সামাবাদী'-র কবির চেয়ে এই সঙ্গীতগুণী বড় নয়।

—[মোগাছেব সনালোচক ও নজরুল ইসলাম]

৫. হাফিজ কেন গীতিকারের রচয়িতা হয়েও মহাকবি, ববীজনাথ কেন গীতিকারের লেখক হয়েও মহাকবি, তাঁর সূত্রানুসন্ধানেই দেখিয়ে পড়লে যে, এক মহাজাতির হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের, আকাঙ্ক্ষার এবং চেতনার যোগাত্মক রূপকার হয়েই তবে মহাকবির গৌরব অর্জন করতে হয়। এই গৌরব নজরুল অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সন্ধ্যা', 'সর্বহারা', 'জিহ্বীর' এই সব কাব্যগ্রন্থ মহাজাতির মহাবেদনার মহা-দৃষ্টির মহাসঙ্গীত।

—[নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু]

৬. গজলের সংরত কাঠামোর প্রযুক্ত প্রত্যেক অসংলগ্নতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল প্রকাশ-পরীর 'বিরোধী' কবিতায়। নিঃসংশয়ে ভাবোন্মাদনার অপকল্প প্রকাশ এ কবিতা। কিন্তু তার মধ্যে যে হাফিজী কোড়ুক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

—[নজরুল ইসলাম ও হাফিজ]

৭. নজরুলই বাঙলা ভাষায় প্রথম সৃষ্টি করলেন উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। রাজনৈতিক সাহিত্য রচনা করে এবং কবিতা লিখে' যে সমাজ-কাঠামো পাক্তানো বেতে পারে, এ-খবর তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন সরবে।

—[নজরুল-মানস]

৮. বাণকৃষ্ণের জামেরারের পকেট থেকে অবিরাব বেরিয়ে আসা পাখীর মতো নজরুলের উপমা রূপক চিত্রকল্প স্তম্ভ্য বুদ্ধোপাধার ও স্বকায় ভট্টাচার্যে একান্ত দুর্লভ।-----
শব্দচিত্রকল্প, বাক্যব্যক্তিপ্রতিমার এবং ধ্বনিপ্রতিমার নজরুলের কাব্যে উদ্গত ধ্বংস-রূপ এঁদের কাব্যে সৃষ্টি হয়নি।

—[ভারোদেনের ভাগোলিন]

৯. নজরুল ইসলাম ফারসী কাব্যের সম্পর্কে এসে' অভ্যস্ত উন্নত মানের উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার নিবেদিতেন। সে উজ্জ্বল চিত্রকল্প ও উপমা তাঁর নিজের কাব্যকে আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জা করেছে।

—[কবাইরাৎ-ই-ওমর বৈরাগের অনুবাদক নজরুল]

এ সকল উক্তিতে স্থম্পষ্ট যে, নজরুলের সাহিত্যকর্মের শিচার শাহাবুদ্দীন মামুনী প্রচার করেন নি; তিনি তার উপকরণের ঐশ্বর্য ও নির্মাণকলার বৈচিত্র্য অভিজ্ঞ সম্পদসম্পন্ন কৌতূহলী দৃষ্টি ও অভিনিবিষ্ট রসবেস্তার সম্বন্ধে বন নিয়ে বাহিরে-ভিতরে সুস্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করে তার শক্তি ও কান্তি সচ্ছন্দে বিবৃত করেছেন। ফলে তাঁর এই সাহিত্য-শিচার অনেকাংশে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে 'সম্মানবাহী সমালোচনার' পর্যায়ে।

শাহাবুদ্দীন তাঁর পৃষ্ঠকাটিতে প্রস্তুত: কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীভীবনানন্দ দাশ, শ্রীকৃষ্ণদেব বসু, শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার, সৈয়দ আলী আহসান ও আজহারউদ্দীন খানের কতিপয় বিজ্ঞান বক্তব্যের প্রতিবাদে বৈবন্ধাবাত্তক বিতর্কের অবতারণা করেছেন। তিনি তাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে-সবের বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করে যথেষ্ট দৃঢ়তা-সহকারেই বলেছেন:

১. আবদুল ওদুদ সুগভীর দৃষ্টি দিয়ে নজরুলের কাব্যকে ভোগ করতে পারেন নি।

২. নজরুল-প্রতিভার মহদুকে ভীবনানন্দ স্বীকার করে নিতে পারেন নি।

৩. কৃষ্ণদেব বসুর গরিম ভীবনের সাহিত্যালোচনায় মাঝে মাঝে এট অব্যবহিতচিত্ততার প্রকাশ ঘটে। তাঁর অব্যবহিত চিত্তের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে অনির্ভরযোগ্য। - - - - - 'গোলাপ কেন কালো' গ্রন্থে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন নজরুলের অনপ্রিয়তা মনে ঈর্ষার উল্লেখ করে। সেই ঈর্ষা-কণ্টকিত সমালোচনা ভবিষ্যতে তাই 'কৃষ্ণাত' বলে বিবেচিত হবে।

৪. অরবিন্দ পোদ্দার নজরুলের কাব্যভাষা সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তা তাঁর নজরুল-সাহিত্য-পাঠের সীমানা নির্দেশ করে, শুধু তাই নয়, কাব্যবোধেরও সীমানা নির্দেশ করে।

৫. সূর্যনাথদেব প্রতি নজরুলের ব্যবহারে তিনি (সৈয়দ আলী আহসান) 'আকর্ষণ-বিলাস' বলেছেন। অভ্যস্ত আপত্তিজনক এই মন্তব্য ব্যবহার।

৬. এই আজহারউদ্দীন খান। যার কণ্ঠটিকে ঠিক একটি বোসাহেবের কণ্ঠ বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ডাক্তার এই বোসাহেব কণ্ঠে উচ্চারিত প্রচারপত্র পাঠ করে নিবেছেন নজরুল Great Poet নন—Good Poet।

এ-বারও বহু সাহিত্যরথী বাহ রচনা করে নজরুলের প্রতি নানা দিক থেকে 'অযথা, পরসজ্ঞান' করেছেন। শাহাবুদ্দীন সে-সকল তাঁক বাণ নিপুণ হাতে উৎপাটন করে নজরুলের বিরাট সাহিত্য-শরীরের বাতসহ অবিকৃত চিত্র পাঠক-সমক্ষে তুলে' ধরেছেন; এজন্য তিনি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে বহুদিন স্মরণীয় হ'বে থাকবেন। অতঃপর তাঁর রচিত সমালোচনা-সম্পর্কে

স্বল্প কালে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নজরুলের অভিনুর্বে সকল অন্যায় অস্ত্র নিক্ষেপ বার্ষ প্রতিপন্ন হবে,—
নজরুলের দিকে কেউ অকারণ কালিমা ক্ষেপণ করতে গেলে সে-কালিয়ার তিনি নিজেই হচ্ছেন
কলভিত—কুখ্যাত।

শিশু-দর্শনের যে স্বচ্ছ দর্পণে নজরুল প্রতিভার স্ফটিকপূর্ণা নির্মাণ করতে হবে, নন্দনতাত্ত্বিক নীতির
যে নির্মল নিক্ষেপে সেই স্ফটিকহীরার প্রকৃত মূল্য পরখ করতে হবে, শাহাবুদ্দীন প্রচুর শ্রম ও প্রজ্ঞার
বিনিময়ে তার এক মানোদীর্ঘ বেধাচিত্র উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং আমাদের সুপারিশ যে,
তার নজরুল-বিষয়ক নিবন্ধাবলী এদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের স্নাতক
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পঠনীয় রূপে অনুমোদিত করা হোক। তা হ'লে নজরুল-সাহিত্যের সঠিক
মূল্যায়ন করতেই তাঁরা ওধু শিখবেন না, সেই সাহিত্যের আসল স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতেও তাঁরা পারণ
হবেন। তাতে শিক্ষা ও আনন্দ, দুইই লাভ হবে।

নজরুলের দৈবী প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফটিক তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত। সেই অসামান্য স্ফটিক তার-প্রস্থান,
রূপ-প্রেরণা ও কলা-নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় হবে যতখানি যথার্থ, অন্তরঙ্গ ও পুংখানুপুংখ, তার অনির্ব-
চনীয় রসের আনন্দময় দাবাদ হবে ততখানি সার্থক ও সম্পূর্ণ। শাহাবুদ্দীনের অনন্যায়নন্দ নজরুল-
অনুশীলন সেই পরিচয় লাভের পথ করেছে প্রণয় ও উজ্জ্বল। তাই তাঁর প্রতি আমাদের প্রশংসার
গীতা নেই।

--আবদুল কাদির

নজরুলের রেজারেকশান*

এবশেষে “নজরুল-রচনাবলী” (৪র্থ খণ্ড) প্রকাশিত হ'ল। আমার “নজরুল-চর্চা দেশে-বিদেশে”
গ্রন্থে আমি বলেছিলাম, “নজরুল-রচনাবলী”র (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) প্রকাশ নজরুল ইসলামের
রেজারেকশান। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হয় ব'লে মনে করি।

আমরা কেউ কেউ সমালোচনা লিখি—সে সমালোচনার প্রশংসা ও গিলা উভয়ই থাকে—কবির কাব্যের
ও সাহিত্যের ব্যাখ্যাও থাকে। কিন্তু মানতেই হবে ব্যক্তির আপন দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ঐ সব ব্যাখ্যায়
কোন-না-কোনোভাবে জড়িয়ে যায়। কলে কবির সম্পূর্ণ স্বরূপ পাঠকের চোখে ধরা পড়ে না।
এ-জন্য সমালোচনা পড়ে কবিকে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। কবিকে জানতে হ'লে তাঁর স্ফটিকে
জানতে হবে। কবির সেই সাহিত্য যদি পাঠকের সামনে না থাকে তা'হ'লে সমালোচনার মান
নির্ধারণ সম্ভব হয় না। সমালোচনা কবির ব্যাখ্যার কতটা প্রত্যক্ষের ভূমিকা পালন করল অথবা কবির
সত্যকার পরিচয় তুলে ধরল কবির সাহিত্যের সংগে নিবিড় পরিচয়ে তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

*নজরুল রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) ॥ সম্পাদক : আবদুল কাদির ॥ প্রকাশক : বাংলা একাডেমী ॥ দায় : ৫০ টাকা।

কবির সেই সাহিত্যের সংগে পরিচয়ের জন্য তা অনায়াসেই হওয়ার প্রয়োজন। বহু বৎসর যাবৎ নজরুল ইসলামের সেই সাহিত্য অনায়াসে পাওয়া অসম্ভব ছিল। সাধারণ অসাধারণ অধিকাংশ পাঠক বাজারে প্রকাশিত নজরুলের দু'চারখানা গ্রন্থ পাঠে নজরুল-পিপাসা নিবারণ করতেন। এর মধ্যে প্রধানতম গ্রন্থটি ছিল "সকিতা"। ১৯২৯-৩০ সালের দিকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ফলে কবির পরবর্তী কালের অনেক লেখা "সকিতা"তে স্থান পায়নি। তবু তাই নয়—বুটিন-সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কবির 'বিষের-বাঁশী', 'ভাঙার-গান', 'প্রলয়-নিধি' গ্রন্থ তিনটির একটি কবিতাও "সকিতা"তে স্থান পায়নি। "অগ্নি-বীণা"-র একটি বাত্র কবিতা "সকিতা"তে স্থান পেয়েছিল—'বিস্রোহী'। কিন্তু তাঁর 'ধুবকেতু', 'কাহাল পাশা', 'মোহররব', 'প্রলয়োদ্ভাস', 'কোরবানী', 'আনোয়ার', 'রূপ-ভেরী' প্রভৃতি বীর ও রৌর্য রসের কবিতাগুলি—যে-গুলি নজরুলের বীর চরিত্রের প্রতীক, যে বুদ্ধ-কবিতা তাঁর বৈশিষ্ট্য, সে-গুলি "সকিতা"তে অনুপস্থিত। কবির "জিহ্বার" কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা "সকিতা"তে গৃহীত হয়েছিল, যেমন—'অশ্রুপূর্ণের সঙ্গপাত', 'মিসেস এর. রহমান', 'ঈশ মোবারক', 'আর বেহেশতে কে যাবি আর', 'নগরোজ', 'অশ্রুপথিক', 'চিরজীব জগলুন' এবং 'ভীক'। কিন্তু যে প্রতীকার্ণে গ্রন্থটির নামকরণ সেই "জিহ্বার"-এর বিপুলব্যয়ক কবিতাগুলি বাদ ছিল। "খানেন", "আনানুগাহ", "স্বপ্ন-উদ্বেগ", "উন্নয়-কাকরু" প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি "সকিতা"য় স্থান পায়নি। বোটা কথা "সকিতা" নজরুলের একটি সামান্য অংশের প্রকাশ। ফলে নজরুল ইসলাম বাঙালী পাঠকের কাছে এক রকম অপরিচিত হয়ে পড়ছিলেন। সেই জন্যে পাকিস্তান আরবে "বাঙলা উন্ময়ন বোর্ড" কর্তৃক "নজরুল-রচনাবলী"-র তিনটি খণ্ডের প্রকাশ বাঙালী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। সে-কারণেই এঁর উদ্যোক্তাদের যেমন তেমনি এর সম্পাদক কবি আবদুল কাদির সাহেবকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারি নি।

"নজরুল-রচনাবলী"-র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ২৫শে মে, ১৯৬৬তে এবং ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০-এ। চার বছরের সময়-সীমার এই তিনটি খণ্ডের প্রকাশ সচজ-সাধ্য ছিল না। সম্পাদক এবং তাঁর সহযোগীদের নজরুল-ভক্তি, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এই কাজকে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু ৪র্থ খণ্ডটি আর অবিলম্বে প্রকাশিত হয়নি। সমস্যা সংকুল বাংলাদেশে অন্যান্য সমস্যার সংগে সম্ভবতঃ এর প্রকাশ-সমস্যা জড়িয়ে পড়েছিল। "বাংলা উন্ময়ন বোর্ড" বেশ স্বাধীন হ'লে তাঁর পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। সে সংস্কৃত হ'য়ে পড়ে বাংলা একাডেমীর সংগে। বিশালদেহী বাংলা একাডেমীর বিস্তৃত সমস্যার সংগে "নজরুল রচনাবলী" (৪র্থ খণ্ড)-এর প্রকাশ-সমস্যা প্রকট হ'য়ে পড়ায়। ১৯৭০-এ এর মুদ্রণ কার্য শুরু হ'লেও ২৫শে মে, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত একে পাঠকের নৃবর্ধন করতে অপেক্ষা করতে হ'ল। ইতিমধ্যে ১৯৭৬ সালের ২৯শে অগাস্ট প্রায় চৌত্রিশ বছর নজরুল ইসলাম বুক থেকে মৃত্যুবরণ করলেন। বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ হ'ল। নতুন ক'রে তাঁর চর্চা শুরু করার আয়োজন চলল। সেই প্রথম ডাবাবেগের প্রচাপে বেরিয়ে এল "নজরুল-রচনাবলী"-র চতুর্থ খণ্ড। বিলম্বে হ'লেও বখালাভ। কেননা "নজরুল-চর্চা" সম্প্রসারিত হওয়ার আরও একটি পথ সৃষ্টি হ'ল।

এই খণ্ডে নজরুলের যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হ'য়েছে সে-গুলি হ'ল: ১. নতুন চাঁদ; ২. বন্ধ-ভাঙার; ৩. বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড) ৩. জুলফিকার (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪. শেষ সঙ্গপাত; ৫. কবিতাব্যবহি-

৩৬. বৈরাগ্য ; ৬. ঝড় ; ৭. রাগাজবাবা ; ৮. দেবী স্তুতি ; ৯. হরপ্রিয়া ; ১০. দশবহাবিধ্য ; ১১. সঙ্গীতভলি ; ১২. কুহেলিকা ; ১৩. যমুনা ও ১৪. প্রবন্ধ।

বলা বাহুল্য ৪র্থ খণ্ডে গ্রন্থিত অধিকাংশ গ্রন্থ কবির নূর হ'য়ে বাওয়ার পরবর্তী ঘটনা। সম্পাদক তাঁর নিবেদনে বলেছেন :

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে-যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ রূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোন গ্রন্থই কবির সম্মিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি।

"কুহেলিকা" ছাড়া যে গ্রন্থসমূহ কবির 'সম্মিতহারা হওয়ার' পর প্রকাশিত হয় সে-গুলোর নামকরণ কি কবির নিজের ? এই খণ্ডে গ্রন্থিত কাব্য 'সঙ্গীতভলি' নামটি সম্পাদকের দেওয়া। সম্পাদক বলেছেন :

এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতভলি' নামে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কিনা তা কে বলতে পারেন ?

যা হোক কবির অসুস্থ হওয়ার পূর্ব প্রকাশিত অনেকগুলো গ্রন্থের নামকরণ তাঁর নিজের দেওয়া নয়, যেমন 'বুলবুল' (২য় খণ্ড) ; 'জুলফিকার (২য় খণ্ড)', 'শেষ সঙ্গীত', 'ঝড়', 'রাগাজবাবা'। "নতুন চাঁদ" গ্রন্থটির নামকরণ সম্ভবতঃ প্রকাশকের। কবির 'নতুন চাঁদ' দৈনিক কবিতার নামকরণে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। 'মক্কাভ্রম' কবির দেওয়া নাম। এটা নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে রচিত একটি অসম্পূর্ণ কাব্য। সম্পাদক বলেছেন :

আধুনিক কালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাব অসামান্য জীবন-বৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস-সম্পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মক্কাভ্রম' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু মাত্র ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিম্প্রভ হ'য়ে বাওয়ার এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

'দেবীস্তুতি' ও 'হরপ্রিয়া' নাটিকা দুটির ও 'যমুনা' গীতি-নাট্যটির নামকরণ কবির নিজের। 'দশবহাবিধ্য-ই-ওমর বৈরাগ্য'-এর নামকরণও কবির নিজের। সম্পাদক লিখিত 'গ্রন্থপরিচয়'-এ 'দশ-বহাবিধ্য' গ্রন্থটির কোন পরিচয় পেলাম না।

যা হোক বোঝা যায় কবির সাহিত্য জীবনের চতুর্থ পর্বে তিনি যা লিখেছিলেন তাঁর অধিকাংশ অগ্রন্থিত ছিল, গ্রন্থবদ্ধ করার আগেই তিনি ব্যাধির শিকার হ'য়ে পড়েন। সেই সব রচনার সংখ্যা কম নয় এবং সে-গুলো দিয়ে আরো কয়েক খণ্ড 'নজরুল-রচনাবলী' তৈরী হবে আশা করা যায়।

“নজরুল-রচনাবলী”তে এ পর্যন্ত যে-সব গান সংকলিত হয়েছে তাদের সংখ্যা ১৫০০তে পূর্ণ হয়নি। কবির আরও দেড় বেক বৃহত্তর গান কিংবা আরও বেশী গান সংগ্রহের অপেক্ষার আছে। সে-সব সংগ্রহ করা সম্ভব হ’লে হয়ত ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড নজরুল রচনাবলী তৈরী হ’তে পারে। বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পাদক নজরুলের নিও এবং কিশোর সাহিত্যটিকে তিনু খণ্ডে প্রকাশের পদ্ধতিকল্পনা করেছিলেন। এটা ‘বাঙলা উনুয়ন বোর্ডে’র পদ্ধতিকল্পনা ছিল। সে খণ্ডটিও অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা নজরুলের এই বিভাগের রচনা বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। যাহা এই পাঁজাচ্ছে সম্পূর্ণ নজরুল ইসলাম এরনও “নজরুল-রচনাবলী”তে আসেনি। নজরুলের মূল্যবান অভিজ্ঞাষণ, তাঁর চিঠিপত্র, তাঁর কিছু প্রবন্ধ এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত “নজরুল-রচনাবলী”-র অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর একটা দিক। বর্তমান মনে হয় “নজরুল-রচনাবলী” কিছুটা তাড়াহুড়া ক’রে সম্পাদিত। এর কারণও ছিল। নজরুলের বহু গানের মত তাঁর অন্যান্য রচনারও ছাতিয়ে বাওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হ’য়ে উঠেছিল। নজরুলের অসুস্থতার পরে নজরুল যে পশ্চিম বঙ্গে থাকতেন দীর্ঘ বিপ বহুরের মরোও সেখানে তাঁর রচনাবলী প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। ১৯৬৪ সালের পূর্বে পূর্ণ পাকিস্তানেও সে-চেষ্টা হয়নি। কলে প্রয়োজন ছিল সেখানে যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ক’রে গ্রন্থবদ্ধ করা। সমস্ত রচনাকে সামনে বেবে স্থাপনিকল্পিত উপারে সম্পাদনার দ্বারা কবির রচনাকালের ক্রমবিন্যাস অনুসারে স্তরে স্তরে কবির ক্রমপরিণতি দেখানো প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পাদকের দ্বারা সম্ভব হয়নি। সে-অন্যো বর্তমান রচনাবলীতে কিছু কিছু রচনা খণ্ডের ক্রমিক অনুযায়ী আগে পিছে হ’য়ে গেছে। এ-খণ্ডের “কুহেলিকা” উপন্যাসটি ঘেরন দ্বিতীয় খণ্ডে সাওয়া উচিত ছিল। আরও কথা আছে, নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “অগ্নি-বীণা” হ’লেও তাঁর কবিতাগুলি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা নয়। আবার “অগ্নি-বীণা”র প্রকাশিত প্রথম কবিতা ‘প্রলয়োদাস’-এর প্রকাশকাল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মে-তে, ৯নং কবিতা ‘শান্ত-ইল-আরব’-এর প্রকাশকাল ১৯২০-এর মে-তে, আর ১২নং অর্ধাৎ শেষ কবিতা ‘মোহররম’-এর প্রকাশকাল ১৯২০-এর সেপ্টেম্বরে। বলা বাহুল্য “অগ্নি-বীণা”-র দ্বিতীয় কবিতার প্রকাশকাল ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী ১৩২৮-এর কাটিক অর্ধাৎ ১৯২১-এর অক্টোবরে। (কবিতাটি কনরেন্ড মৃত্যুকর আচরনের মতে ভিসেবরে রচিত। ‘নোসলের ভারতের’ অনিরমিত প্রকাশের জন্য প্রকাশ তারিখ পিছিয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে কবিতাটি ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে প্রকাশিত হয়। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ ১৯২১ সালের ভিসেবরের কোন এক দিন।) কলে ক্রমিক অনুসারে তাঁর লেখাকে এখানে সাজানো সম্ভব হয়নি। সে-দিক থেকে সম্পাদনার বিপুলনা ঘটে গেছে। সম্পাদক অথবা অসামান্য পরিশ্রম ক’রে প্রতিটি খণ্ডের শেষে “গ্রন্থ-পরিচয়ে” কবির রচনাগুলির প্রকাশ কাল, মূ’চারটি বাদে, এবং তা কোন পত্রিকার কর্ণ প্রকাশিত হ’য়েছিল তাঁর সন তারিখ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন খণ্ডে কোন কোন কবিতার পাল্লমূলেও এই রচনাটির প্রকাশ তারিখ দিতেও তিনি চেষ্টা করেছেন। অর্ধাৎ যোঝা যায় কবির ক্রমিক পরিণতিটা পাঠকের বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয় সেটা সম্পাদকের মনে পড়ীরভাবে আশ্রিত ছিল। এবং বলা বাহুল্য এই ঐতিহাসিক দাবির স্তম্ভসম্পূর্ণ করার, এই বর্তমানে, তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। অর্ধাৎ “নজরুল-রচনাবলী” তাঁকে নিরোই পুনরায় সম্পাদনা করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। যে সম্পাদনা কেবল নজরুলের গ্রন্থ প্রকাশের কালকে সামনে রেখে সম্পন্ন হবে না, হবে তাঁর কবিতা রচনার কালকে সামনে রেখে। (কেবল প্রকাশের কালকে সামনে রেখেও,

সম্পাদনা করলে অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো বাবে না। কেননা অনেক সময় বহু আগের ঘটনা বহু পরে প্রকাশিত হয়েছে।) মনে রাখতে হবে গ্রন্থ-প্রকাশে প্রবীণ নজরুল গৃহীণীপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হননি। কেননা বতবার তাঁর কামনা “শেকালীর মত শুভ স্মরণি” বিস্তার করে উঠতে চেয়েছে “নির্মম” দারিদ্র্য ততবার কাঁদুরিয়ার মত তার “দলবৃত্ত শাখা”কে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছে।

আর একটা কথা, কিছুটা বাস্তবানে প্রকাশিত হওয়াতে সংকলনে কিছু কিছু মূত্র প্রমাণ রয়ে গেছে। বিশেষ করে নজরুলের “নতুন চাঁদ” কাব্যটিতে। (অন্য গ্রন্থগুলোতে সে-জুলনার জুলের পরিবাহ অনেক কম।) এখানে অতি-সতর্ক-শৃঙ্খল করা পাহারা না থাকতে এই প্রমাণ হয়েছে বলে মনে হয়। এখানে কয়েকটি প্রমাণ দেখানো গেল:

“নতুন চাঁদ” কবিতার “এদেরি বকে; ভাঙিয়ে বাঁশ” পংক্তিটি ছাপা হয়েছে “এদের বকে ভাঙিয়ে বাঁশ,” “মুক্তপক্ষ নির্ভা এরা উড়ন্ত” ছাপা হয়েছে “মুক্তপক্ষ নির্ভর এরা উড়ন্ত,” “হাতের লাঠি এদের প্রাণ” ছাপা হয়েছে “হাতের লাঠি এদের প্রাণ”; “চির-জনমের প্রিয়া” কবিতার পংক্তি “চির জনমের প্রিয়া নোর। চেয়ে দেখে ঐ নীলাকাশে,” ছাপা হয়েছে “চির-জনমের প্রিয়া মোর। চেয়ে দেখে নীলাকাশে,” (‘ঐ’ শব্দটা বাদ পড়েছে), “এত জ্যোৎস্নায় চাকিতে পারিনি তোমার মধুর মায়া,” ছাপা হয়েছে “এত জ্যোৎস্নায় চাকিতে পারিনি তোমার মধুর মায়া।” (‘পারিনি’ স্থানে ‘পারিনি’ হওয়াতে অর্থ অন্য রকম হয়ে গেছে), “চোরের মতন চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল।” ছাপা হয়েছে “চোরের মত চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল।” (‘মতন’-এর স্থানে ‘মত’ হওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে), “মুজা হয়েছে, অঙ্কলি দিতে তাই গাঁপি তারে গানে,” ছাপা হয়েছে “মুজা হয়েছে; অঙ্কলি দিতে তাই গাঁপি গানে,” (‘তারে’ শব্দটি বাদ পড়াতে ছন্দপতন হয়েছে।); “আমার কবিতা তুমি” কবিতার পংক্তি-“যত রস-ধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে,” ছাপা হয়েছে “যত রসধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে (‘কবিতার’ স্থানে ‘কবিতার’ ছাপা হওয়াতে পংক্তির অর্থ বিকৃতি ঘটেছে।)। “কল্প-লোকের প্রিয়া আসে না গো ধরণীতে ধরি কামা।” ছাপা হয়েছে “কল্প-লোকে প্রিয়া আসে না গো ধরণীতে ধরি কামা।” “কৈদে কৈদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো ধামি” ছাপা হয়েছে “কৈদে কৈদে রাতে যদি মোর হাতের লেখনী যায় গো ধামি” (‘হাতে’ স্থানে ‘হাতের’ হওয়াতে ছন্দ পতন হয়েছে।) “নিরুক্ত” কবিতাটির ‘চির-পবিত্রা অমৃতময়ী, বল কোন্ অতিমানে’ পংক্তিটি ছাপা হয়েছে “চির-পবিত্রতা অমৃতময়ী, বল কোন্ অতিমানে” (‘পবিত্রা’র স্থানে ‘পবিত্রতা’ হওয়াতে ছন্দ-পতন হয়েছে এবং অর্থবিকৃতি ঘটেছে); “আসিবে তুমি কি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে বন” ছাপা হয়েছে “আসিবে তুমি কি বেণুকা লইয়া সেদিন অধরে বন” (‘হইয়া’ “লইয়া” হওয়াতে পংক্তিটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে।); “সে যে আমি” কবিতাটির “ভূত নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা, কে সে জানিয়াছে হেলা?” ছাপা হয়েছে “ভূত নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা, কে জানিয়াছে হেলা” (‘কে জানিয়াছে’র মাঝখানে ‘সে’ শব্দটি বাদ যাওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে)। “তোমার প্রেমের রাশী কে নিল না, কে গো সেই গরবিনী?” ছাপা হয়েছে “—তোমার প্রেমের রাশী কে নিল না কে সেই গরবিনী?” (‘গো’ শব্দটি বাদ যাওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে), “ততই লুকাতে চাহি; আজিও যে আমি অপূর্ণা জানিয়া,” পংক্তিটি হয়েছে “ততই লুকাইতে চাহি; আজিও যে আমি অপূর্ণা

জানিয়া" ("লুকাতে" স্থানে "লুকাইতে" হওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে); "অভেদর" কবিতাটির "কেবলই রূপের আচরণে বিনি ঢাকিছেন নিজ কায়" পংক্তিটি ছাপা হয়েছে "কেবলই রূপের আচরণে বিনি ঢাকিয়াছেন নিজ কায়" ("ঢাকিছেন" স্থানে 'ঢাকিয়াছেন' ছাপা হওয়াতে ছন্দ পতন হয়েছে); "কেন আগাইনি তোরা?" কবিতাটির "দিশ দিগন্তে প্রসারিয়া শাখা বাঁধেনি সেখার নীড়?" ছাপা হয়েছে "দিশ্দিগন্তে প্রসারিত শাখা? বাঁধেনি সেখার নীড়," ("প্রসারিয়া"র স্থানে 'প্রসারিত' ছাপা হয়েছে।) 'জিজ্ঞাসা চিহ্নটি ব্যবহারে হবে না শেষে হবে নইলে বাক্য অর্থহীন হয়।), "আমারে খুঁজিতে সহসা সেকোন শক্তির পরশিনু" পংক্তিটি "আমারে খুঁজিতে সহসা কোন শক্তির পরশিনু" ছাপা হয়েছে ('সে' শব্দটি বাদ যাওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে।); "লুনার যৌবন" কবিতাটির ৭ম পংক্তির "বাঁধিল" হয়েছে "বাঁধিলে," "দেখে না তাহার প্রাণ-তরঙ্গে ডুবিল তরঙ্গী কার" পংক্তিটির "তাহার" স্থানে "তার" ছাপা হয়েছে, স্তব্ধরাং একটি মাত্রার পতন ঘটেছে; "শান্ত হইয়া ঘুরারে রহিবে—উনিম্নাঙ্ক কতু কেউ" পংক্তিটি "কেউ" স্থানে "কে" হয়েছে (এটা অবশ্য পাঠক বুঝে নিতে পারবেন); "খোলো অর্পণ পামাণে, খুঁচী বহক অনর্পণ" পংক্তিটির "খোলো" স্থানে মুদ্রণ প্রমাদে "খোলে" ছাপান হয়েছে। "আর কতদিন" কবিতাটির "শরাধ পিয়ায়ে আগায়ে রাখিবে, প্রীতন্ আসিবে নাকি" পংক্তিটি হয়েছে "শরাধ পিয়ায়ে আগায়ে রাখিবে, প্রীতন্ আসিবে নাকি?" ("পিয়ায়ে" স্থানে "প্রিয়ারে" হওয়াতে ছন্দ ও অর্থের পতন হয়েছে।) "শিরাজী পিয়ায়ে শিরার শিরার কেবলই আগাও নেশা" হয়েছে "শিরাজী পিয়ায়ে শিরার শিরার কেবলই আগাও নেশা" ("পিয়ায়ে" স্থানে "পিরারে" হওয়াতে অর্থ বিপর্যিত ঘটেছে), "মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি: মূলে ওঠে কুতুহলে" স্থানে "মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি: মূলে উঠে কৌতুহলে।" ("কুতুহলে" স্থানে "কৌতুহল" হওয়াতে একমাত্রা বেড়ে গেছে); "ফিরদৌস আলা হ'তে যেন লালা কুলের সুরভি আসে" পংক্তিটি হয়েছে "ফিরদৌস-আলা হ'তে লালা কুলের সুরভি আসে" ("যেন" শব্দটি বাদ যাওয়ার ছন্দপতন হয়েছে।); "কে যেন হাসিয়া হুঁটয়া আমারে পলাল অনর্থ-পথে।" পংক্তিটি হয়েছে "কেন যেন হাসিয়া হুঁটয়া আমারে পলাল অনর্থ-পথে।" ("কে" স্থানে "কেন" হওয়াতে ছন্দ ও অর্থের পতন ঘটেছে।); "ওঠ রে চায়া" কবিতাটির "তেরনি আকাশ ফর্সা আছে ভরসা শুধু নাই" পংক্তিটি হয়েছে "তেরনি আকাশ ফর্সা ভরসা শুধু নাই" ("আছে" শব্দটি বাদ পড়াতে ছন্দপাত হয়েছে); "মোবারকবাদ" কবিতাটির "তোমাদের মহফিলে আমি সেই নুকুলেরে আজ চাই" পংক্তিটি "তোমাদের মহফিলে আমি সেই নুকুলেরে চাই" ছাপা হয়েছে ("আজ" শব্দটি বাদ পড়াতে ছন্দপতন হয়েছে)। এছাড়া "শিখা" কবিতাটির "কোথা সে অনাগত সাগ্নিক পুরোণা" হবে "কোথা সেই অনাগত সাগ্নিক পুরোণা," "হইনাছে ভারতে জনগণ পতি" হবে "হইরাছে ভারতের জনগণপতি?" "নরন নাকিয়া। যৌবনে এ লাজনা" হবে "নরন নাকিয়া। যৌবনের এ লাজনা", "যেন, নাহি বাঁচে আর। সরাধি হইতে" হবে "যেন নাহি বাঁচি আর। সরাধি হইতে।" "আজাদ" কবিতাটির "কোথা সে 'সারিক', কোথায় সে ইমার, কোথা সে শক্তির?" হবে "কোথা সে 'সারিক', কোথা সে ইমার, কোথা সে শক্তির?" ("কোথায়" হবে না।)

অবশ্যই এ-প্রমাদ জ্ঞানসিক কবি আবদুল কাদিরের নয়, এ-প্রমাদ প্রাক-সংশোধক অথবা মুদ্রাপালকের কর্মচারীদের। তাঁরা বখেট সাবধান ছিলেন না। এখানে বলা প্রমোজন মুদ্রণ সংশোধকের ব্যাপারে সম্পাদক আবদুল কাদিরের উপর এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করলে চলবে না। তাঁর বরস সত্তর পেরিয়েছে।

চোখ পূর্বের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হারিয়েছে। তাই তাঁর সম্পাদনার ও গ্রন্থ সংশোধনের কাজে একজন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহযোগীর প্রয়োজন। (প্রসংগত তিনি আমাকে বলেছিলেন চতুর্থ খণ্ডের প্রথম দিককার কয়েকটি কথা তাঁকে দেখিয়ে নেওয়া হয়নি।)

নজরুলের যেকোন রচনা মুহূর্তে আমাদের সাধামত সতর্ক হ'তে হবে। কেননা আমাদের জাতির প্রমাদ কবির উপর পড়তে পারে। যা অনেক সময় হয়েছে। কবির কাব্যের বৃহৎ জাতি মোচকের চোখে কবির ছন্দজাতি বলে গণ্য হয়েছে। এর একটা বাস্তব প্রমাণ আমি পেরেছিলাম। আমাদের “নজরুল একাডেমী পত্রিকা”র একজন পণ্ডিত একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: নজরুল মাঝে মাঝে ছন্দে তুল করেন। যেমন: “স্বরাঙ্গীরা ভাবে নারাজী, নারাজীরা ভাবে তুহাদের অন্ধুশি।” মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছ'মাত্রার এই কবিতা পংক্তির দ্বিতীয় পর্বে একটি অভিন্নিত মাত্রা বেড়ে গেছে। বস্তুত: এই জাতি কবির নয় এ-প্রমাদ ছাপাখানার ভুতের। কবির আসল লেখার পংক্তিটি ছিল: “স্বরাঙ্গীরা ভাবে নারাজী, নারাজী ভাবে তাহাদের অন্ধুশি।” স্বতরাং মাত্রা পতনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অতএব আমাদের যেন শোন দৃষ্টি থাকে যাতে আমাদের তুল কবির তুলে পরিণত না হয়। নজরুলের শেষ পর্বারের দু'চাষটি কবিতায় ছন্দ-পতন হয়ত দেখা যায়। কিন্তু সে তাঁর ঋগ্ভা পর্বারের লেখা। যা তিনি দ্বিতীয় বার দেখেন নি। “নজরুল-রচনাবলী”র চতুর্থ খণ্ডের কোন কোন কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কাব্যপংক্তিকে ছন্দ-দূর্বল মনে হয়। মনে রাখা দরকার এর কোন গ্রন্থ কবির চোখের সামনে মুদ্রিত হয় নি। কবি এর লেখাগুলিকে শেষদেখা দেখে দিতে পারেননি। অনেকগুলি গ্রন্থ ঋগ্ভার আকারে ছিল, যেমন ‘মরুভাষ্য’। কবির অনুপস্থিতিতে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ছাপানো হয়—স্বতরাং এতে কোথাও ছন্দপাত হ'লে সে-ভাবেই হয়েছে। কবির দ্বারা পরিমার্জিত হয়নি। “শেষ সপ্তগীত”-এর এমন একটি কবিতা ছন্দ সম্পর্কে কবি আবদুল কাদির গ্রন্থ-পরিচয়ে এই বক্তব্য রেখেছেন :

‘ভুলিতা’ গীতি-গুচ্ছের প্রায় সবগুলি গান সংস্কৃত বৃত্তছন্দে বিরচিত। তাহাতে ‘দীপক-মালা’ ১৬-মাত্রা : তাহার আদ্যারী—

দীপক-মালা	গাঁথ গাঁথ গাঁথ সই।
মাধব আসে	পারিজাত কই ॥

সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহার প্রথম পংক্তিতে হয় ৮+১১ মাত্রা, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে ঠিক ৮+৮ মাত্রা। ইহার প্রকৃত পাঠ হইবে—

দীপক-মালা	গাঁথ গাঁথ সই।
মাধব আসে	পারিজাত কই

এখানে পংক্তিতে ৮+৮ মাত্রার দু'টি পদ।

এখানে স্পষ্টত: দেখা যায় যে, মুদ্রিত কবিতার “গাঁথ গাঁথ গাঁথ সই”—এ তিনটি মাত্রা বেড়েছে অভিন্নিত একটি “গাঁথ” পদ প্রয়োগে। আমার ধারণা এটি একটি প্রসিদ্ধ বৃহৎ প্রমাদ। কারণ

কবির কবিতাটির উপর রাজা সংখ্যা “১৬ রাজা” লেখা আছে। কবিতাটির শিরোনামিকা এমনি :

“দীপক রাজা —১৬ রাজা (তা—নানা—তা—তা, তা না তা না তা)”

বে-কবি রাজা সহজে এতদূর সজাগ তাঁর রাজা পতন হবে এমন মনে করা অনুচিত। অথবা “গীরকী”র নাটকীয়তার জন্য একটি অতিরিক্ত “গীথ” লব্ধ ব্যবহার হরত বা হ’তে পারে। কিন্তু তা পাঠবার সুবিধার জন্যো—রাজার পতন ঘটবে নয়। এই অতিরিক্ত লব্ধ বৃত্ত—বৃত্ত প্রমাণ ছাড়া আর কিছু নয় বলে আমি মনে করি। বলা বাহুল্য রস সজ্ঞারের জন্যে গীতের শব্দে উচ্চারণ দূ’বার করা যায় কিন্তু সেটা কবিতার জন্যে লেখা যায় না। সম্পাদক এবং ছাপাশিল্পী আবদুল কাদির এখানে ব্যাখ্যা দিয়ে এবং রাজা বিশেষণ করে আরাদের উপকার করেছেন এবং পারদর্শী সম্পাদকের উপযুক্ত পরিচালনা করেছেন।

সম্পাদক আরও একটি অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করেছেন। তা হ’ল কবির কবিতার পাঠ্যের দেরিবে দেওয়া। কবি সহজে একটি সাধারণ কথা প্রচলন আছে। নজরুল একবার বা নির্বর্তন সেটা তাঁর শেষ লেখা। তিনি তার দিকে আর ফিরেও চাইতেন না। ভক্তরা কবির অসাধারণ শক্তিকে প্রমাণ করার জন্য এটা পৌরষের কথা বলে প্রচার করতেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদী ওটাকেই কবিকে ঘায়েল করার একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার নেন। এবং “নজরুলের কাব্যে পরিবর্তন”র চিহ্ন নেই বলে তাঁরা বড় প্রকাশ করেন। কথাকাটা দূ’তরফ থেকেই আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ অথবা তীব্রমানস দাঁতের কিছু কবিতা দেখলে মনে হয় যে তাঁরা একটি কবিতাকে প’ড়ে তুলতে বিস্তর ঘসা রাজা করেছেন। হয়ত গোটা কবিতা নিয়ে কাটিতে কাটিতে তার একটি রাজা পংক্তিকে অথবা লব্ধকে নির্বাচন করেছেন অথবা একট রকম দশটা পংক্তি থেকে একটি পংক্তিকে বেছে নিয়েছেন। কবি যেখানে শিল্পী সেখানে রেখাকে অকল্পিত রাখার জন্য এ-প্রয়োজন পড়ে—ঠিক মনোমত লব্ধি অথবা পংক্তিটি ধরা না পড়া পর্যন্ত এই অপেক্ষার ও পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। শেকস্পীরারও এমন কাজ করেছেন—এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ব্যাতি সুবেদারের। কিন্তু বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রথম পাণ্ডুলিপিই শেষ পর্যন্ত একটি মনোমত অথবা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী হয়ে ওঠেনি। তাঁরও কোনো কোনো লেখা একটানে নির্ভুলভাবে বেরিয়ে এসেছে। নজরুল ইমানের পরিবর্তন অথবা পরিবর্তনের দায় দায়তেন না—এই বাক্য অসত্য। আমার “নজরুল-সাহিত্য বিচার” গ্রন্থে এ-কথার উল্লেখ করেছি—প্রমাণ সহ। আবদুল কাদির সাহেবও এখানে করে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দূ’একটি উপাত্ত। গ্রন্থ-পরিচয়ের একস্থানে তিনি বলেছেন :

১. ‘অঙ্গগত’ ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা ‘রূপায়ণ’ পত্রিকার “আর জিজ্ঞাসা করিব না কোন কথা” শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সংখ্যার ‘রূপায়ণ’ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও বাজারে বাহির হয় নাই। অতঃপর কবিতাটি ১৩৪৮ মাসের ‘সংগঠন’ পত্রিকার ‘সাপের দেউ’ শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘সংগঠন’ মুদ্রিত কবিতাটিতে ২৪ সংখ্যক পংক্তির পরে আছে এই শ্লোকটি :

যেহ কবিতার কবুতরগুলি তোমার জ্বরাকালে
উড়িতে বধন তার, কেন লেখা যেন বদাইয়া আসে ?

এই শ্লোকটি “শেষ সওগাত” কাব্যে নাই। সেখানে কবিতাটির শেষ ১০টি পংক্তির মূত্রণেও বিপর্যয় ঘটায়, — শেষের ৪টি পংক্তি ভাষার পূর্ববর্তী ৬টি পংক্তির উপরে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত ১০টি পংক্তি ‘সওগাত’-এ প্রকাশিত ‘সাগরের চেষ্টে’ কবিতাটিতে নাই। সে স্থলে আছে নিম্নোদ্ধৃত ১০টি পংক্তি—

প্রেম দিয়ে এক পূর্ণ পরম প্রেমেরে পাওয়া যায় :
যখন পায় না লায়লীরে প্রেম দিয়ে হায় দুনিয়ায়।
প্রেম যে কি চায়, প্রেমিকও জানে না, বিশেষ জানে না কেউ ;
চেউয়ে মিশে চেউ শান্ত হয় না, কেন ওঠে আরো চেউ ?

দেহ চায় পেছ, মন চায় মন, আত্মা আত্মা চায় ;
প্রেম তবু বলে কাঁদিয়া নিভা—কিছু পাইল না হায়।
বিরহের মধু মস্তুরী তুমি প্রিয়া,

নহ মিলনের মধুমালা ;
কাঁবার তীর্থ-পথে কেন এত মরু-ভুঙ্কার জ্বালা ?
কে বলিতে পারে কেন অনুরাগ ‘লোহিত সাগর’-তীরে
ভুঙ্কা-কাড়র গোবী-সাহারার মরুভূমি আছে ঘিরে ?

উপরন্ত ‘সাগরের চেষ্টে’ কবিতাটিতে অনেক পংক্তির পদ পরিবর্তিত।

একটা কথা রহস্যময়। উদ্ধৃতিতে সম্পাদককে ‘মূত্রণেও বিপর্যয় ঘটায়’ লিখিতে দেখছি। ‘বিপর্যয়’ বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? “শেষ সওগাত” কবির অনুপস্থিতিতে প্রকাশিত হয়েছিল—পরিবর্তনটা তা হ’লে কি কবির হাতে হয়নি? “শেষ সওগাত” সম্পাদনা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র ব্রিত্ত। এই পরিবর্তনে তাঁর কি কোন হাত আছে? অথবা তিনি কবির হস্তনির্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে “শেষ সওগাতে” কবিতাটি তুলেছেন—বার অন্যো এই ওলটপালট। নজরুল ইসলাম অনেক সময় তাঁর লেখার পুস্তক দেখতেন এবং পুস্তকেও পরিবর্তন করতেন বলে মনে হয়। আমাদের মত অনেকের, বাদে মূত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট আছে, তাঁরা পুস্তকের উপর রচনা পরিবর্তন করেন অনেক সময় পুস্তক-সংশোধনে আবুল পরিবর্তন ঘটান। সে-জন্য তাঁর পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট কবিতার বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই চতুর্থ বইতে তার একটি বাস্তব প্রমাণ আছে। ‘বড়’ কাব্যের ৪নং কবিতা ‘কর্য্যভাষা’র পাঠ এই :

কর্য্যভাষা কইতে নারি চর্ছ কথা ভিন্ন
নেড়ার আমি নিম্ন বলি (কারণ) হেঁড়ার বলি ছিন্ন ॥
গোঁসাইকে কই গোঁসাই, তাই মশাইকে মোঁসাই।
ধানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি ॥
চাষার আমি চপ্প বলি, আশার বলি জব্ব।
কোটকে বলি কোট, আর সাগর বলি নয়া ॥

নশারে কই শিষ্য আনি, ডাষারে কই ভীষ্য ।
 পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসীয়ে মাহিষ্য ॥
 পুকুরকে কই পুন্সকরিনী, কুকুরকে কই কুহু ।
 বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে গুড়ুহু ॥
 চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, ডাই আড়ালকে অণ্ডাল ।
 শালায়ে কই শলাকা, আর কানায় বলি কছাল ॥
 শুষুরকে কই শুষু, আর দাদাকে কই দড় ।
 বাষারে কই বধু, আর কাপারে কই কড় ॥
 আরো অনেক বাত্রা আনি, বুঝলে ডার মিশ্ট ।
 ভেবেছ সব শিখে নেবে বলছি নে আর কিছ ॥

কবিতাটির একটি পাণ্ডুলিপি এখানে ছাপা হ'য়েছে তার পাঠ মূত্রিত কবিতাটি থেকে অনেকখানি
 পৃথক । এখানে তারও উদ্ধৃতি দিলাম :

হাসিয় গান

আনি পেরায়া ভাষা কইতে নারি সংস্কৃত ভিঙ্গু ।
 নেড়ায় বলি নিগু, কারণ ছেঁড়ায় বলি ছিঙ্গু ॥
 গোসাইকে কই গোস্বামী, ডাই বনাইকে কই বোস্বামী,
 কানকে বলি কন্যা, কারণ বানকে বন্যা কই আনি ।
 চাষার চশম বলি ব'লে আশায় বলি অশু
 হাসায় বলি হাস্‌সো আনি ডাষার বলি ভীষ্য ॥
 টাকার বলি টকা আনি কাকার বলি ককা ডাই ।
 মাথ্ বন্ডে ইক্, বলি টাক্কে বলি টিক্ ডাই ।
 বসার কই বিনু আনি, নশারে কই শিষ্য,
 পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসীয়ে মাহিষ্য ॥
 পুকুরকে কই পুন্সকরিনী, কুকুরকে কই কুহু
 বদনকে কই বদনা আর গাড়ুকে গুড়ুহু ॥
 চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল আর আড়ালকে কই অণ্ডাল,
 শালায় বলি শলাকা, জুলায় বলি জুড়াল ।
 বুধকে বলি বুধ স্রানি, বোকার বলি বোর্কা,
 হাড়কে বলি হাড়কা আনি চোখকে বলি চুকা ॥
 দাদারে কই দড় আনি বাষারে কই বধু,
 হানকে বলি হস্তা আনি, লোমকে বলি লম্বু ।
 আরো অনেক বাত্রা আনি বুঝলে ডার মিশ্ট ?
 ভেবেছ সব শিখে নেবে বলছি নে আর কিছ ॥

এটাই সম্ভবতঃ প্রথম বসুড়া ছিল। তারপর প্রেসে যাওয়ার আগে তার চেহারার যে বথেষ্ট পরি-
বর্তন হয়েছিল, কবি যে তাকে 'ওসটপালট ক'রে বৃত্তিত কবিতার রূপ দিয়েছিলেন তাতে আর
সন্দেহ নেই। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে নজরুলও তাঁর লেখার বসুড়া করতেন এবং অনেক সময়
সাজাযবাও করতেন। চতুর্থ ঋণ্ডে যে-সব কাব্য গ্রন্থ ছাপা হয়েছে তাঁর উপস্থিতিতে সে-সব ছাপা হ'লে
তার দুর্বল পংক্তিগুলোকে তিনি নিশ্চয় সবল ক'রে তুলতেন। সে-সব সবল ক'রে তোলার
শক্তির তাঁর অভাব ছিল না।

এর প্রমাণ নজরুলের 'রুবাইয়াত-ই-ওমর-খৈয়াম'। 'রুবাই'গুলো "বোহাঙ্গনী"তে যে-ভাবে প্রকাশিত
হচ্ছিল গ্রন্থবদ্ধ 'রুবাই'গুলোর অনেকগুলি তেমন আর নেই। প্রথম রুবাইটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা
আমি আমার প্রবন্ধ "ওমর খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম" প্রবন্ধে দেখিয়েছি, সম্পাদক তাঁর "অনুবাদক
নজরুল" প্রবন্ধেও এই ঋণ্ডের "গ্রন্থ পরিচয়ে" তা বলেছেন।

এই সংগে বলি অনেকের মতে নজরুল ইসলাম ১৯৪০/৪১ সালের দিকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে
ফেলেছিলেন। তাই তাঁর তখনকার লেখা কবিতার হ্রস্বপতন হয়েছে এবং তাঁর চিন্তার অস্বস্থতার ও
বিপর্দয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা নজরুলের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণাকে তাঁর অস্বস্থতার লক্ষণ ব'লে
তাঁর তখনকার চিন্তা ও চেতনাকে গোপ ব'লে চিহ্নিত করতে চান। আসলে এটাও প্রত্যেকের
নিজস্ব দৃষ্টিকোণকে প্রমাণ করার একটা চেষ্টা মাত্র। কবি তাঁর অস্বস্থতার পূর্বে আত্মগোপন হয়েছিলেন,
আধ্যাত্মিক চেতনাশূন্য হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর রচনার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল—বলা যায় না।
ঐ সময়কার কিছু রচনা যা এই চতুর্থ ঋণ্ডে বৃত্তিত হয়েছে তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সজাগ
সমালোচকদের রচনা ব'লে আমার ধারণা। সম্পাদক যে ভূমিকায় বলেছেন :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত গায়ত্রী নামের আনন্দ সংবাদ
দিয়েছেন, সার্বজনিক ঐক্য ও আর্ড-মানবতার প্রতি স্বগভীর সমানুভূতি তাঁদের অনুরা শিখার
এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ ঋণ্ডে 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম' তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও প্রেম
বিস্ময়তা পেয়েছে প্রগাঢ়তার রূপ, কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসঙ্গ ধ্যানের আসনে
ব'সেই নিশীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনাবোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও
তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। নজরুল রচনাবলীর চতুর্থ ঋণ্ডে এই বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

আবদুল কাদির সাহেবের এই কথার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। একেবারে যেদহীন অভিজ্ঞতাকে
বখোঁপবুদ্ধ শব্দ ও উপমা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে নজরুল তাঁর এ-ধূপের কবিতায় তুলে ধরেছেন।
মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা, বাঙালার মুসলমানদের অধঃপতনের জন্যে তাঁর দরদী বনের
তীব্র ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক জীবনের নিবিড় উপলব্ধি তাঁর এই ধূপের কবিতাকে নতুন বৈশিষ্ট্য
দান করেছে।

সম্পাদক আবদুল কাদির সাহেবের আর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই চতুর্থ ঋণ্ডে 'রাডাছবা'
(নাটক প্রকাশকের দেওয়া) ও 'দেবীজতি' নামে দুটি গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। 'রাডাছবা' প্রীতি-
কাব্য গ্রন্থ এবং 'দেবীজতি' তত্ত্বাত্মক ব্যাখ্যা গ্রন্থ। 'দেবীজতি' হিন্দু দেবী কালির মহাকালি,
মহালক্ষী, মহাসরস্বতী, রক্তপতিকা, শক্তাকী ও জামরী অবতার রূপের ব্যাখ্যা।

গ্রানবোকেন কোম্পানীর সংগীত রচয়িতা ও ট্রেনার হিসাবে এবং শেষের দিকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগীত রচয়িতা হিসাবে নজরুলকে এক সময় কোম্পানীর ব্যবসায় বাঁতিয়ে নানা বর্বর ও সম্প্রদায়ের লোকের বনোপযোগী গান লিখতে হয়েছে। এ-গুলো রচনার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত ছিল কি না সেটা অনেকের জিজ্ঞাসার কারণ। বিশেষ ক’রে নজরুল রচিত শ্যামা সংগীত, শিব সংগীত ও বৈষ্ণবগীতি বিখ্যাত বলে বিবেচিত হয়েছে। কারণ কারণে ধারণা অনুভূতিতে আশ্রয় না নিলে এমন চিত্তাকর্ষক গান লেখা কেমন ক’রে সম্ভব? বলা বাহুল্য নজরুল যেমন জাগরণের গান, বিশ্ববের গান, স্বদেশী গান, প্রেমের গান, প্রকৃতির গান, নেবার চরম সাক্ষ্য অর্জন করেছিলেন তেমনি একদিকে ইসলামী সংগীত, শ্যামা সংগীত, শিব সংগীত ও বৈষ্ণব গীতি ইত্যাদি ধর্মীয় গীতি ও অনাদিকে সুন্দর, ডাটগালী প্রভৃতি লোকগীতি রচনার অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচনার ও মূর সংযোজনায় অপূর্ব শৈল্পিক সিদ্ধি লেখে ঘোঁড়া কঠিন হয় যে কোন্টা তাঁর বিশ্বাসের অন্তরল থেকে উৎপত্ত আর কোন্টা নয়, কোন্টা আসল ও কোন্টা নকল। বিশেষ ক’রে তাঁর শ্যামা বিষয়ক গানগুলি কাব্য হিসাবে এমন উচ্চাঙ্গের যে যেন না করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে যে তিনি শ্যামা ভক্ত নন।

পাঠকের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগার কারণে কোন কোন ঘোর শরীরতপস্বী মুসলমান যেমন নজরুলের মুসলমানত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তেমনি একদল ডাব্রিক হিন্দু তাঁকে ‘মাতৃসাধক’ বলে আখ্যায়িত করেন।

আবদুল কাদির সাহেব ভূমিকাতে লিখছেন:

নজরুলের ‘দেবীজ্ঞতি’ নামক রচনাটির রূপকাক্রান্ত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার ‘ভূমিকা’র অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল বুধোপাধ্যায় বলেছেন: ‘নজরুলের আসল পরিচয়: কাজী নজরুল ইসলামের স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।’

আবদুল কাদির সাহেব এই মতের প্রতিবাদ ক’রে বলেছেন:

এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের গ্রীষ্ম-আশ্বিন সংখ্যক ‘জয়ন্তী’ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম: ‘নজরুল ইসলাম বাঙালার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম চক্কারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চার ইসলামের নিয়ম কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neo-paganism-এর সাহায্য গ্রহণেও অগ্রণী।’—আমার সেই লেখাটি প’ড়ে নজরুল ইসলাম গৃহে বসে হতবাক করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত: neo-paganism বলে বা আনাদের কাছে প্রতিভাত হ’চ্ছে: তা প্রকৃতপক্ষে pseudo-paganism।

এই বক্তব্য স্বাধার পর আবদুল কাদির সাহেব বলেছেন:

নজরুলের কোন কোন রচনার বৈষ্ণবীয় মীলবাস ও শৈবমূলক শক্তি আরাধনা দেখে’ বীরা তাঁকে মূল কথায় প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই পাগান বা নিপ পাগান নন, তিনি কখনও কখনও কাব্যবিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের

অনুপ্রাণিত ডাক-প্রকাশের প্রয়োজনে পরেছেন pseudo pagan-এর (নকল প্যাগানের)
সাময়িক কবি বেশ।

এই বিষয়টি নিয়ে সমালোচকের মধ্যে স্পষ্ট মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
একজন হিন্দু লেখক। কিন্তু তাঁরও মত কিছুটা আবহুল কাদির সাহেবের কাছাকাছি। এ-ব্যাপারে
তাঁর মতব্য উদ্ধৃত করলাম :

কাজী নজরুল ইসলামকে ঈশুর প্রেরিত বা তাত্ত্বিক সাধকের আশীর্বাদ-পূত কবি বা সাধক
ব'লে প্রচার করবার একটা ঝোঁক দেশের এক শ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৭৭
সালের (ইং ১৯৭০) নজরুল-সংখ্যা “কথা সাহিত্য” পত্রিকার ১২২৫ পৃষ্ঠার “ভারাক্ষাপা
নজরুল” নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীসমীরকুমার বোষ মহাশয় লিখেছেন:—“ভারাপীঠের
তার। মায়ের আশীর্বাদে এক মুসলমান কাজী পরিবারে আবেডোলা সন্ন্যাসী মাতৃসাধক
নজরুলের জন্ম হয়।” এ কথা বোষ মহাশয় কোথায় পেলেন? আমরা নজরুলের পুরাতন
বন্ধুরা যতদূর জানি, চুরুনিয়ার খানদানী কাজী পরিবার বর্ষ বিধানে পুরাতনকালে এবং একালেও
অত্যন্ত গৌড়া এবং বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। আবেডোলা নজরুলের ঐ পরিবারে জন্ম
হয়েছিল এবং নির্বাচনের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। সেইজন্যই তাঁকে ভের বছর বরসেই
(১৯১২) গৃহছাড়া ও লক্ষ্মীজাড়া হ'তে হ'য়েছিল। এমন কোন তথ্যই নেই যে তিনি
বা তাঁর মাতৃদেবী কোন সময়ে ভারাপীঠে গিয়েছিলেন।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে :

কবির মনোজগত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং নিমকলঙ্ক দর্পণের মত। তাই বালককাল
থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যখনই যে রাস্তায় মোড় ঘুরে গেছেন তাঁর রস গ্রহণ করার
ক্ষমতা তাঁর ছিল ব'লেই তিনি মুসলমানের সন্তান হ'য়েও উদার মন নিয়ে নানা
ভাবগর্ভন প্রভৃতি অন্তর্নাস্তিকের তলে ডুব দিতে পারতেন। তাই ইসলামী সাধনা
থেকে বৈষ্ণব, সহজিয়া, সূফী ও তাত্ত্বিক সাধনার ভাবমণ্ডল হ'য়ে তার সৃষ্টি রূপ কৃষ্টিয়ে
তুলতে পারতেন। তাঁর এই শক্তিতে কোন আলৌকিক হিন্দু-সাধকের কোন আশীর্বাদের
প্রত্যক্ষ জিয়া ছিল না। এর কোন তথ্য নেই। কষ্ট কল্পনা দ্বারা প্রমাণ ক'রে কবির
জীবনকে লোকসমাজে বোলাটে ক'রে তোলা উচিত নয়।

যুক্তিটা পুরোপুরি আবহুল কাদির সাহেবের বক্তব্যের সমার্থক নয়। এবং একটু পরে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
তাঁর ঐ লেখার যে উক্তি করেছেন সেটা সত্য হ'লে আবহুল কাদির সাহেব ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের
বক্তব্যও চিহ্ন ঋণ। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন জীবন পরিক্রমায় কয়েক মুহূর্তের আহরণের
প্রেরণা, সারাবাদী হ'লেও পরবর্তী কালে তিনি “উক্তিপথের” সাধক হ'য়ে ওঠেন। তিনি বলছেন :

যুক্তি-আন্দোলনের বহুরূপ প্রায় সকলেই স্বরূপ ও দীর্ঘদিন কারাগারে আবদ্ধ হ'য়ে থাকার
কিছু উক্তিপথের বহুরূপ তাকে পেয়ে বসেন। এই সময় বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, তাঁর

যেহেতু বুনবুনের বৃত্তান্তে নজরুল শোকর্ত হ'য়ে শাস্তির পথ বুঝতে থাকেন। তখন তাঁর ভক্তিমার্গের বন্ধু কালিদাস গুহরার (বোগীরাজ) ও অত্যাংসাহী বিপ্লবী ও বোগসামন্ত কবি অবলেন্দু দাপগুপ্ত তাঁকে এই পথে শাস্তি সন্ধানের জন্য প্ররোচনা দিয়ে বোগসামন্ত পথে টেনে আনেন। বিপাকে পড়েই নজরুল বোগসামন্ত পথে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাধনা তিনি মিটার ও আন্তরিকতার সঙ্গে করেছিলেন, এটা অবিসংবাদিত সত্য তথা।

এই বোগসামন্ত paganism-এর ব্যাপার কি না। Paganism বল্যার্থে প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ এক কথায় প্রকৃতি উপাসনা। অভিধান-এর অর্থ নিকট ধর্ম বা ধর্মচারণ বা অ-দার্শনিক প্রকৃতি উপাসনা। আবদুল কাদির সাহেব paganism অর্থে পৌত্তলিকতা বা প্রতীক-পূজা বুঝিয়েছেন। এবং তিনি বলছেন যে তিনি যখন লেখেন যে নজরুল নব্য প্রতীকবাদের উদ্বোধক তখন নজরুল বলেন যে তাঁর কাব্যে যে প্রতীক দেবা বার—তা নব্য প্রতীকবাদ নয় তা নকল প্রতীকবাদ।

আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে নজরুল প্রতীক পূজা বা পুতুল পূজাকে সমর্থন করতেন কি না?

"দেবীমতি"তে ব্রহ্মশক্তির ব্যাখ্যায় আত্মা দেখি নজরুল পুতুল পূজার সমর্থক নয়। অথবা এই বর্ণনায়ই বলছে সে পুতুল পূজার সমর্থক নয়। [দেবী-মতির ভূমিকায় শ্রীনিভাই ষটক সংকলকের ভূমিকায় লিখেছেন—“১৯৩৮ সালের জাসুয়ারী মাসে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে কবি 'দেবীমতি' লেখেন।” (ঐকান্তিক আগ্রহ তা হ'লে নজরুলের ছিল না?)] মহানন্দী পরিচ্ছেদে নজরুল ব্যাখ্যায় বলছেন :

জোবরা। রাঙতার ঐশ্বর্য দিয়ে যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী শ্রীদুর্গার নগর বছর পূজার অভিনয় কর। তিনি ভিখারিণী হ'য়ে ঘরে ঘরে তোমাদের জন্য শক্তি তিকা, কল্যাণ কারনা ক'রে বেড়াচ্ছেন। তাঁরই পূজা রঙপে শিবশক্তি বাসেন ভিখারী-ভিখারিণীর রূপে। জোবরা। মাটির প্রতিমা পূজা কর। তাই প্রাণের প্রতিমাকে দেখতে পাও না, বাক্যে পাও না।

[উক্ত অংশ নজরুল রচনাবলীর বর্তমান চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত 'দেবীমতি' থেকে বাণ বাওয়ার কারণ বুঝতে পারলাম না। আবদুল কাদির সাহেবের কাছে যে বই আছে তা কি অসম্পূর্ণ?]

উপরের উদ্ধৃতির "জোবরা। মাটির প্রতিমা পূজা কর, তাই প্রাণের প্রতিমাকে দেখতে পাও না।"

স্বস্পষ্টভাবে বলে না কি? ব্যাপারটা পুতুল পূজার ব্যাপার নয়।

বলা বাহুল্য 'শায়া' নজরুল-কাব্যে পরম শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে অর্থাৎ তাত্ত্বিক মতে বিনি সকল শক্তির শক্তি সকল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠা—তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন।

ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নয়, নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যের উপাধান হিসাবে যেমন একদিকে শায়া, শায়, শিব, কল্যাণ, পরভবান, রাম, রামণ, সীতাকে প্রতীকার্থে ব্যবহার করেছেন তেমনি অন্যদিকে তিনি এজিব, কালেন, জুলফিকার, ফেরাউন, নুহ, নবহুদ, ইস্রাঈলকে প্রতীকার্থে ব্যবহার করেছেন। এর কারণ সহজভাবে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সাম্য, স্বাধীনতা, শোষণ বহন্যার রূপটিকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আরও একটা ব্যাপার, রূপক ও প্রতীকের অলঙ্কারে কবিতা বড়টা কাব্য হয়—অন্য কিছুতেই তা হয় না। তখন কোন কবিতামূলিক বলে—নজরুলের ইসলামী গানের চেয়ে তাঁর শায়াসঙ্গীত কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট।

কথাটা আংশিক সত্য। নজরুলের সব শায়াসংগীত উচ্চাঙ্গের কাব্য নয়—আবার ইসলামী গানের অনেকগুলি অবশ্যই উচ্চাঙ্গের কাব্য। “রাঙাঝরা” কাব্যের ১ম গান ‘বল্ রে জবা বল’ ভাবগত দিক থেকে উচ্চাঙ্গের কবিতা। ‘রূপক’-এর ঊৎকর্ষের জন্যে কবিতাটি একটি অমূল্য রত্ন বিশেষ। তেমনি ‘সঙ্গীতগুলি’ কাব্যের ৩৫নং গান “কুলে পুছিনু—বল্, বল্ ওরে কুল” (ছাপা হ’য়েছে “বলো, বলো ওরে কুল”। আমার ধারণা “বলো” হবে না, কেননা পরবর্তী পংক্তিতে জিজ্ঞাসা হ’ল—“কোথা পেলি” দ্বিতীয় স্তবকে “কে তোরে” “কোথা পেলি”; তৃতীয় স্তবকেও “কোথা পেলি”। এখানে সমস্ত সন্ধান অতি আদরার্থে।) আজিকাগত ও কাব্যগত দিক থেকে উচ্চাঙ্গের কবিতা—রত্ন। প্রতীক ও রূপক ব্যতীতই কবিতা সরল প্রত্যক্ষ বাক্য ও শব্দবিন্যাসের অপূর্ব কোণে শ্রেষ্ঠ কাব্য হ’য়ে ওঠে—সেই সংগে উচ্চাঙ্গের ভাবনার যদি সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য এ-কাব্যেও সুক্ল কৌশলে প্রতীকের ব্যবহার করা হয়েছে। সুকীদের ধারণা সৃষ্ট প্রাণী মাত্রই, জড়, অজড় সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের অংশ বিশেষ। প্রকৃতির এই ষ্ণাংশসমূহ সেই ঈশ্বরের প্রতীক। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ সেই নিরাকারকে এই আকারের মধ্যে দেখান। এই গীতি-কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবে সেই দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। কবি বলছেন :

“ওরে রবি-শশী, ওরে ও গ্রহ তারা,
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিঃবারা ?”
কহে, “আমরা তীহারি রূপের ইশারা
মুসা বেহাশ হ’লো হেরি যে খুবজ”।

“রবি-শশী” “তীহারি রূপের ইশারা”। কার ? অবশ্যই আল্লাহর। অতএব “রবি-শশী” সেই আল্লাহর ষ্ণ ও রূপাংশ। সুতরাং রূপকের আশ্রয় এখানে আছে। বলা বাহুল্য যেখানে কবিতা কাব্য সেখানে কবিতা শাস্ত্র নয়। শায়া সংগীতে নজরুল যেখানে বলছেন :

আমার কালো মায়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে,
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ সিঁড়ি বিরাট নীল গগন।

*

সিঁড়িতে মার বিলু খানিক—
তার ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক।

তখন উল্লিখিত ‘হাফ্’-এর সংগে এর কাব্যগত অর্থের কোন পার্থক্য থাকে না। টিক এইজন্যেই যথুসূচন যথু রাজনারায়ণকে বলেছিলেন—When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. বেতার বাংলার ১৯৭৫-এর জানুয়ারীতে প্রকাশিত আমার “বাক্সী জাতীয়তাবাদ ও কাছী নজরুল ইসলাম” গ্রন্থে (পরে আমার “নজরুল সাহিত্য বিচার গ্রন্থে সংকলিত) এই উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলেছিলাম—“শিল্পীর আদর্শ সৌন্দর্য। কোন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় অথবা পাত্র

নিম্পীর আদর্শ নয়। আবদুল কাদের সাহেব বর্তমান সংকলনের ভূমিকাতো সে কথাই উল্লেখ করেছেন। (নজরুল ইসলাম জনাব আনওয়ার চৌসেনকে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন ‘বর্ষের বা শাস্ত্রের বাপকাঠি দিয়ে কবিডাকে বাপতে গেলে তীব্র হটগোলের সৃষ্টি হয়।’) বলা বাহুল্য নজরুল ইসলাম ১৯১৯ সালে এলবাট হলো নাট্যনী জাতির অভিনয়ন পত্রের জবাবে বলেছিলেন : “সুন্দরের বেরানী পূলাল কীটসের মত আমারও নয়—“Beauty is truth, truth beauty.” “সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর,”—এটা কবির কাব্যাদর্শের মত ব’লে বিশ্বাস করলে মনে হয় কবি সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারী সম্বোধন ঘুচে যাবে। কবিকে যদি আমরা কবি হিসাবে দেখি তাহ’লে তাঁর মধ্যে আমরা বৈশাদেশ্যের অবস্থান দেখতে পাব না—বৈশাদেশ্য আমাদের চোখে পড়বে তখন কখন আমরা তাঁকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়বৃত্ত ক’রে দেখব। কিন্তু নজরুল ইসলাম নিজেকে কোন সম্প্রদায়ের একক সামগ্রী হিসাবে বোধ করি দেখতে চাননি। সে-জন্যই তিনি উল্লিখিত এলবাট হলের ডাফনে বলেছিলেন :

আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব’লেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নয়। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই স্নানগ্রহণ করি, সে আমার দৈন্য। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব’লেই কবি।

কিন্তু সম্বোধনের পর্দা তাতোও ঘুচে না ব’লে তিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্বের ব্যাখ্যাও করেছেন এই ব’লে :

কেউ বলেন, আমার বাপী যখন, কেউ বলেন, কাকের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধ’রে এনে হ্যাণ্ডশেক করার চেষ্টা করেছি, গানাগানিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে চাতে-হাতে মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হ’য়ে থাকে, তা হ’লে ওরা আপনি আলাদা হ’য়ে যাবে। আমার গাঁট ছড়ার বাঁধন কাঁটে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আঁতুনে আছে চুরি।

নজরুলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। “ওরা” শেষ পর্যন্ত আলাদা হ’য়ে গেল। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ’লেও সেটা যে নিম্পীর, কোন শাস্তিকারী মানুষ সে-কথা বলবে না।

প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলাম শাস্তিকারী। কিন্তু একদিকে সম্প্রদায়ের পাহাড় থ’লে, যে সম্প্রদায় লুক্কায়িত শোষণমস্ত্রের নিষেধবধে সৃষ্টি হয়,—অন্য দিকে শাস্তির বাণী প্রচার করলে সে শাস্তি কোন দিন ব্যস্তবাহিত হয় না। সুবর ধনবন্তদের মধ্যেই শাস্তির বীজ লুকানো আছে। সেটাকে ব্যস্তবাহিত করার জন্য নজরুল ইসলাম সারা জীবন যুদ্ধের জন্য সকল মজলুম মানুষকে আহ্বান করেছেন। আর এই যুদ্ধ-কাব্য রচনার তিনি কখনো সামগ্রীক অস্ত্র, কখনো ইসলামিক অস্ত্র, কখনো গীত্রীয় অস্ত্র আবার কখনো তত্ত্বের অস্ত্রকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই চতুর্ধ বণ্ডে ‘দেবীমতি’তে সেই বস্ত্র বীজ যেমন লুকানো আছে, তেমনি আছে “নতুন চাঁদে”র “কৃষকের ঈদ”, “ঈদের ঈদ,”

‘কেন আগাইনি তোরা’, ‘আজান’, ‘নতুন চাঁদ’, ‘ওঠ যে চাখী,’ এবং ‘শেষ সওগাতে’র বহু কবিতায়; এমনকি কিছু কিছু ইসলামী গানে। বিশেষ ক’রে কবির “শেষ সওগাত” কাব্যে কবির মানবিক ভাবনা গভীর বেদনার ভাষা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপ্লব ও শ্রম, নজরুলের কাব্যে প্রথম থেকেই পাশাপাশি বিরাজ করছিল। এই শ্রম বেদন ব্যক্তিগত ভেদনি বিপ্লবগত। চতুর্থ খণ্ডেও সেই ব্যক্তিগত ও বিপ্লবগত শ্রমের গভীর উপলব্ধির পরিচয় প্রকাশিত। বিশেষ ক’রে কবির আধ্যাত্মিক চেতনা ও উপলব্ধির গভীর জটিল প্রকাশ হয়েছে কয়েকটি কবিতায়। যা পড়লে যোদ্ধা যায় যে নজরুল মানব জীবনের গভীরতম জিজ্ঞাসার শেষ দিগন্তে পৌঁছানোর ত্রাণহীন সাধনার নিবন্ধ ছিলেন। এই ক্ষেত্রে নজরুল যে যোগসাধনার আশ্রয় হওয়ার চেষ্টা করেন তা তাত্ত্বিকদের যোগ নয়, সুফীদের যোগ। “লে যে আমি”, “অভেনর” ও “আর কতদিন?” এই তিনটি কবিতার অপূর্ণ শির শ্রবণের ভাষার নজরুল তাঁর সুফী ধ্যান-ধারণার গভীর অনুভূতিকে রূপের ক’রে তুলেছেন—যেখানে সৃষ্টি সৃষ্টির সংগে বিচ্ছেদে অভেন রূপে রূপসা করে। যেন রাবতে হবে কবির beauty বেদন truth সুফীর beauty ভেদনি পরম আদির সত্য-স্বরূপের সত্য—সৌন্দর্যরূপে বা বিরাট বিশ্বে বিচ্ছুরিত। এই ভাব-রূপনার কবি ও সুফী অভিন্ন।

এ-খণ্ডে নজরুলের গদ্য রচনার মধ্যে তাঁর ‘কুহেলিকা’ উপন্যাসটি (আকর্ষণের দিক হ’ল বাজারে প্রকাশিত উপন্যাসটিতে যে পরিচ্ছেদটি ছাপা হয়নি গ্রন্থ-পরিচয়ে সম্পাদক সেই পরিচ্ছেদের পুরোটা এখানে ছাপিয়ে দিয়েছেন। এটা “নওরোজ” পত্রিকার ভাষ্য সংখ্যায় ১৩৩৪ সালে ছাপা হয়েছিল)। “বধূমালা” নাটকটি ও পাঁচটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি হ’ল ‘নাটক’, ‘পোলিটিকাল ড্রাম্যাটিক-বাজি,’ “নজরুল ইসলামের পত্র”, “গণবাণী ও মুজফফর আহমদ” ও “গাঙালীর বাঙলা”। সমগ্র নজরুল ইসলামকে জানতে তাঁর এই গদ্য রচনা যে বিশেষ সহায়ক সে-কথা বলা বাহুল্য।

পরিণেবে বলি স্বাধীন মহলের প্রবল অপচেটায় কলে নজরুল ইসলামের বিলুপ্ত হওয়ার সাময়িক সজ্জাবনা আজ অবলুপ্ত। আজ প্রমাণ করা আদৌ দুর্ব্বল নয় যে পৃথিবীর মহত্তম কবিরের অন্যতম নজরুল ইসলাম—ভাষার, চিত্রকরনার, ভাব-ব্যক্তনার, অবল করনা-প্রতিভার, দৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ-জটায় প্রজ্ঞার এবং বিবাদবিমুক্ত শ্রীভঙ্গল সংযোজনায় মহাকালবিজয়ী সকল মহাকবিরের তিনি সহযাত্রী। বিংশ শতাব্দীতে আব্বা যে অভ্যন্তর মিকটে থেকে তাঁর কাব্যের বসাবাসন করতে পেরেছি—এ আমাদের অতি বড় সৌভাগ্য; এবং নিশ্চয়ই সেই সৌভাগ্যের অবিকারী হবেন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। প্রকৃতপক্ষে “নজরুল রচনাবলী” সংকলিত হ’ল তাদের জন্যে। আর এই সংকলন যার উজ্জ্বল-প্রভাট চিত্তের নিবেদন সেই আব্বুল কাদির সাহেব হলেন আমাদের সংগে তাদেরও নব্বা।

—শাহাবুদ্দীন আহমদ

সংকলনে নজরুল ইসলাম

সহস্রাব্দ আবেগের অকৃত্রিম ও অবলীলাবর বজ্রোৎসাহে নজরুল ইসলাম কবি। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুবাহিক। বিপ্লব ও বিদ্রোহ, শান্তি ও সংঘাত, সারা ও শ্রেণী-সচেতনতা, প্রেম ও অপ্রেম, মিলন ও বিরহ, হিংসা ও ভালোবাসা, বারিকতা ও অব্যবহিকতা, আন্তরিকতা ও দাঁড়িকতা, ইসলাম ও অইসলাম, হিন্দু ও মুসলমান নজরুল-সাহিত্যে পাশাপাশি বর্তমান। প্রতিভার এই বহুবাহিক জাই নজরুল-রাসনের বর্ষা বুলারনে অস্তরার স্রষ্টা করে থাকে।

‘নজরুল সর্দীকণ’* গ্রন্থের শুরুতে সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ মদিকুজ্জামান বলেছেন :

এ বাবু নজরুল সম্পর্কে বিচিত্রবিধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। নানা দিক থেকে নানা বর্ণের আলো পড়েছে; সে আলো উৎসাহে সয়ল, তীব্রক, মৃদু, তীব্র, মদ্র, প্রবর। তার মধ্যে জিন্দাবাদ দিলাবাদ উভয় প্রসঙ্গে সবুৎসুক নিকিউ বধ্যবিত্ত বাঙালীমূলভ কখনো উজ্জ্বল প্রাণনা, আবেগের আতিশয়া, বিশেষণের বাছনা, কখনো অনর্গল দিল্লা, অসহিষ্ণু বিজ্ঞপ, ধর কটাক বেশ প্রাচুর্যে বিদ্যমান—সন্দেহ নেই। বড়ত খুব কম চিন্তাই সেই বধ্যবিশ্রুতে উপনীত যেখানে সরল দিল্লা-প্রশংসা, কি ব্যক্তিগত সাধারণ ভাল-লাগা মন্দ-লাগা বুঝা মর, বুঝা কবি-প্রতিভার ধনাত্মক বুলারনের প্ররাস। তবু, থনা বাছনা, সেই প্রয়াসই বিরল হলেও প্রাণিত।বর্তমান গ্রন্থ...কাছী নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী, সুস্থ, ধনাত্মক প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত সংকলন। (পৃ—১৫)

‘নজরুল সর্দীকণ’-এর পরিচয়ের জন্যে এই প্রাক-কখনই যথেষ্ট। সাধারণত এ ধরনের সংকলনে প্রায়ই সম্পাদকের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটা গভীনগতিকতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আলোচ্য সংকলন সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য কারণেই ব্যতিক্রম।

প্রথমত: প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বইটিতে একটি পরিচ্ছন্ন, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় বিদ্যুত। দ্বিতীয়ত: একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতার প্রবন্ধসমূহের বিন্যাস বইটিকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। “নজরুলের সাহিত্যিক সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি, নজরুল-প্রতিভার বুলারনের প্রশ্ন, নজরুলের বহুবাহিক কবিতামণ্ডল, নজরুলের কবিতার বিবিধ প্রসঙ্গ, মন্দ, উপমা, অলঙ্কার, ছন্দ, নজরুলের উপন্যাস, গল্প, নাটক, শিশুসাহিত্য, গান ও প্রবন্ধ—এই বিচিত্রবিধ বিষয়ের প্রত্যেকটির পুখানুপুখ বিশ্লেষণ এইসব প্রবন্ধে বিদ্যুত।” (পৃ—১৫-১৬)

সকল বহু প্রতিভাই দেশ-কাল ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের পটভূমিতে পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম বধ্যবিশ্রুতির সামাজিক অবকর ও বিকোড এবং ঔপনিবেশিক সমাজব্যবহার আধা সামন্ততান্ত্রিক আবহাওরাকে ধারণ করে সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব। ইসলামের প্রবল রাসমতাবাদী আদর্শ ও ঐতিহ্য, কর্মসী ও রূপ বিপ্লবের ইতিহাস, শেলী-ইটম্যান-গোকার সাহিত্যচিন্তা এবং খেলাকত ও অলহবোশ আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হৃদয় ও স্বকালের পটভূমিট প্রভৃতি তাঁর বানন-পরিমণ্ডল, গঠনের

*নজরুল সর্দীকণ ॥ ডঃ মোহাম্মদ মদিকুজ্জামান সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৯। প্রকাশক : আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা। দাম কারো টাকা।

উপাধান। মজরুলের সহজাত প্রতিভা এই বিস্তৃত পটভূমিকে আচ্ছাদ্য করেই বহুমাত্রিক আত্মপ্রকাশের শক্তি লাভ করেছে। ‘বাংলার কাব্য ও মজরুল ইসলাম’ (জহাঙ্গীর কবির), ‘মজরুলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা’ (আতাউর রহমান), প্রভৃতি প্রবন্ধ এই পর্বাণে উল্লেখযোগ্য।

মানবতার চারণ-কবি সেনের্সাগের অগ্রদূত চির-বিশ্রোহী মজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এক নতুন বৃণ ও নতুন ধারার পথিকৃৎ। অসন্তোষ, অতৃপ্তি, অস্বস্তি, উত্তেজনা, প্রচণ্ড আশাবাদ আর অদম্য স্বতন্ত্রকৃতি তাঁকে প্রতিনিহিত সৃষ্টিবীন রেখেছে। তাঁর বিশ্রোহ একাধারে ভাববাদী ও বস্তুবাদী। প্রথম সৈন্যলিনতাকে তিনি কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কালের প্রয়োজন মিটিয়েই মজরুলের কবিতা কালোত্তর মহিমায় ভাস্বর। ‘মজরুল মানসের একমিক : একটি প্রশ্ন’ (হাফিজ হাকিমুর রহমান), ‘শিল্পীসত্তার লালন ও মজরুল’ (আহসান হাবীব), ‘মজরুল সাহিত্যে নতুন ধারা’ (বেগম হুম্মিরা কামাল), ‘মজরুলের কবি-প্রতিভা (মুহম্মদ এনাযুল হক), ‘মজরুল কাব্যে বিশ্রোহের স্বরূপ’ (কবীর চৌধুরী)। ‘মজরুলের কবিতা : কালের অব্যাহতি প্রাপ্তবলী’ (মহম্মদ ইসলাম) প্রভৃতি প্রবন্ধে মজরুল-প্রতিভা মূল্যায়নের প্রশ্ন এবং তাঁর বহুমাত্রিক কবিরাম্যসম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার মজরুল ছিলেন অকৃত্রিম। তাঁর প্রবল মানবতাবোধই ঐতিহ্য-প্রীতিক্রমে জীবন সম্পৃক্ত করেছে এবং বর্তমানকে পরিণত করেছে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ারের। “সামান্যদের অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধজাত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা মজরুল মানসের এক প্রধান অংশ।” (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ‘মজরুল ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক’, পৃ—৬৩)। “মানবতার উদ্বোধনই কবির বিশেষ লক্ষ্য।” (পূর্বোক্ত, পৃ—৫৮)।

‘মজরুল ইসলামের ধর্ম’ নামক প্রবন্ধে কবির ধর্ম সম্পর্কে বহুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন ডঃ আহমদ শরীফ। তিনি বলেন : “মজরুল ইসলামকে কোন বিশেষ ধর্মের অনুসারী বলা চলে না।” (পৃ: ১১৬) তাঁর “কাব্য সাধনা ছিল একাত্তরে মানবনিষ্ঠ। মজরুলের ধর্মও ছিল তাই মানবনিষ্ঠ। (পৃ: ১১৫) আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় বোধ মহৎ প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ। মজরুল-মানসে আধ্যাত্মিক বোধ বিশ্রোহী চেতনার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টির পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিবিরোধ সাবুজো বর্তমান। এই আধ্যাত্মিকতাই কবির আত্মোপলব্ধির নিয়ামক। জনাব আবুল ফজল ‘মজরুলের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

কবিতার ভাব ও শরীর গঠনে শব্দ নির্বাচন ও এর সূত্র প্রয়োগ অপরিহার্য। মজরুল ইসলাম অত্যন্ত সাবলীলভাবে শব্দকে একটি প্রবল শ্রোতব্যতার প্রবাহের মতো ব্যবহার করেছেন। এই শ্রোতবের বেগে আরবী, ফারসী সংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দ সহজভাবে বিশেষ গেছে। ‘মজরুল ইসলামের কবিতা : শব্দের অনুযজ্ঞে’ (সৈয়দ আলী আহসান), ‘মজরুল কাব্যে শব্দ ব্যবহার : আবেগ-উদ্দীপনার অনুযজ্ঞ’ (আবু হেলা মোতফা কামাল) এবং ‘মজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ’ (সৈয়দ আলী আশরাফ)—এই প্রবন্ধ তিনটি মজরুল ইসলামের শব্দ প্রয়োগের শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পরিস্ফুট।

মজরুলের ছন্দ ও উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কবি আবুল কাসিম ও মোহাম্মদ আহকুজ্জামান যথাক্রমে ‘মজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ’ ও ‘মজরুল কাব্যে উপমা : পেশপর্শ’ প্রবন্ধদ্বয়ে। এ বিষয়ে আলোচনা আরো পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত ছিল।

মজরুল ইসলাম তিনটি মাত্র উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর প্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। ‘উপন্যাসিক মজরুল প্রবন্ধে জনাব মুহম্মদ আবুল হাই দেখিয়েছেন—“মজরুলের

উপন্যাসত্রীতে কাহিনীর গাঁড় বিমল এবং উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণ আমরা পাইলে সভা, কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের স্বপ্ন ও সাধ, কবিভা ও সংগীতে যেমন, এতলোতেও ভেদনি বিবৃত হয়েছে। (পৃ: ২৬৪)। প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনা নজরুলের কাব্য-ভাবনার এক মূলীভূত উপাদান। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নজরুল-রামস মূলতঃ প্রেমের ব্যাধা-বিবৃৎ পরিণতলে আবর্তিত। জগদ্ব্যবহার রহস্যমের 'নজরুলের ছোট-গল্প' প্রবন্ধে এই সভাই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

শিল্প সম্রাট ও স্বীকৃত নজরুলের খডাব থাকলেও সঙ্গীত মাধুর্য এবং কাব্যরসের সমৃদ্ধিতে নজরুলের নাটকসমূহ উপভোগ্য। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম ও জগদ্ব্যবহার আবদুল হক 'নজরুলের নাটক' নামক দুটি প্রবন্ধে নজরুলের নাট্য-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

শিও-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নজরুলের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রমেন শিও-চিত্র-মূলতঃ সাধনা এবং শিও-মনত্বের সহজ ও স্বাভাবিক অবিকার একেত্রে তাঁর সফলতার কারণ। যেমন শাহমুদ্দাহার বাহুবু তাঁর 'শিও সাহিত্যে নজরুল' প্রবন্ধে আরো দেখিয়েছেন—নজরুলের শিও সাহিত্য তাঁর জীবন ও সাহিত্যের প্রধান স্তরের সঙ্গে সমান্তরাল।

নজরুলের কবি-প্রতিভা গজল-গানের ভূমিতে সর্বাধিক পরিষ্কৃত। 'বাংলা গানের নবা গীতে গর জোয়ারের স্টিকতা' হিসেবে নজরুলের অবদান ও কৃতির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন জগদ্ব্যবহার-উদীয় আহমদ 'গীতিকার নজরুল' নামক প্রবন্ধে।

স্বকাল-বিক্ত প্রাবৃত্তিক নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সাহিত্যের অসামান্য প্রণাধার তুলনায় স্বল্পবিস্তৃত। কিন্তু 'আবেগসজরা' প্রাণের সৌন্দর্যবহুত্বের এতলো তাঁর কবিসম্রাট নিকাতা। 'নজরুলের প্রবন্ধ: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পদান' প্রবন্ধে জগদ্ব্যবহার আবদুল হোসেন প্রাবৃত্তিক নজরুলের মানস-লোকের গঠনপ্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধগুলোর শিল্পমূল্য পরীক্ষা করেছেন।

ছত্রিশ জন প্রাবৃত্তিকের ৩৭টি প্রবন্ধের সংকলন 'নজরুল সনীকণ' গ্রন্থে আমরা নজরুল-প্রতিভার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত দেখতে পাই। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহে কবি-প্রতিভার বর্ণনাত্মক মূল্যায়নের প্রয়াস বইটির অপর বৈশিষ্ট্য। একেত্রে সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যে নিষ্ঠা মিরপেক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর জন্যে তিনি প্রশংসিত ও ধন্যবাদার্থ।

বাংলাদেশে নজরুল-চর্চা ক্ষেত্রে 'নজরুল সনীকণ' নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য সাংগোষ্ঠ্য। বলা বাহুল্য, প্রয়োজন মেটাবার সাধারণ্যেই বইটি স্বীকৃতভাবে, বিশেষতঃ নজরুল-চর্চায় অনুপ্রাণিতদের কাছে স্বীকৃত এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটির প্রচ্ছদ অলঙ্কারসম্পন্ন। বাঁধাই উত্তম। কিন্তু একটি জটিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও ব্যাপক বলে এর উল্লেখ না করে পারা খেল না। বইটির আদ্যোপাত্ত অল্পস্বল্প প্রমাণে অতিথির পীড়াদায়ক। বোঝা যায় বইটি সভাই "অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সঙ্গে মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এট অবাঞ্ছিত জটিল মুদ্রিত হয়ে বইটির অলঙ্কারের বুদ্ধি পাবে বলে ভরসা রাখি।

—মোহাম্মদ কাসেম

শেষ সালসম

বাংলাদেশে নজরুল : তাঁর মহাপ্রয়াণ

আবদুল মুকীত চৌধুরী

কবি নজরুল ইসলামের বাঙালি সাহিত্যে অবির্ভাব হওয়ার সময় থেকে লক্ষ্য করা যায় একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল। “বঙ্গদেশের ভারতে” প্রকাশিত তাঁর কবিতা ‘শাভ-ইল-মারব’, ‘কোরবানী’, ‘নোদররম’, ‘ফাতেহা-ই-দোরাহ জহম’, ‘খেরাপায়ের তরবী’, ‘রখাতেরী’ প্রভৃতি কবিতায় যে সাধারণ অনুভূতি প্রকাশ পায় তা ছিল উপন্যাসের মুসলমানদের মুক্তি-কামনার ও জাতিত্বের আকাঙ্ক্ষা। পরবর্তীকালে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত হ’লেও শিকারীকার হীনবল এবং পশ্চাৎপদ, এবং পরাধীনতার জন্যে বঞ্চিত সর্বহারা মুসলমানদের পাখির উন্নতির জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর রচনায় বর্তমান ছিল। তাঁর কবিতায়, তাঁর গদ্যে, তাঁর অভিভাষণে ও গানে নিরন্তর সে পরিচয় কুটে উঠেছে। মুসলমানের, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের, আশা ও ভাষা তাঁর কাব্যে, তাঁর সাহিত্যে সার্থকভাবে রূপায়িত হওয়াতে বাঙালী মুসলমান তাঁকে জাতীয় কবি হিসাবে বরণ করে নিয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হ’লেও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান নজরুল ইসলামের অবলম্বন বিস্মৃত হন নি এবং তিনি পশ্চিম বঙ্গে থাকলেও (তিনি সেখানে ছিলেন কারণ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে জীবিত থাকলেও তিনি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে কেনেছিলেন।) পূর্ব বঙ্গের মুসলমানগণ তাঁকে নিজেদেরই জাতীয় কবি ভাবতেন। সে-ভাবেই প্রতি বছর উদযাপিত পূর্ব পাকিস্তানে এই জাতীয় মহাকবির সন্মানার্থে পূর্ব বঙ্গবাসীরা “নজরুল-জয়ন্তী” করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন নিকুণ্ঠ চিত্তে। শুধু তাই নয় বাঙালী মুসলমানের জাতীয় কবির স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরবর্তীকালে মাসিক ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন।

বলা বাহুল্য। তৎকালের পূর্ব পাকিস্তানে মহাকবিকে কয়েকবার নিয়ে আসার প্রচেষ্টাও হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভব হয় নি। বাঙালী মুসলমান তাঁর প্রাণের কবিকে নিজেদের কাছে পাওয়ার চেষ্টা করেও সফল হয়নি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের সামরিকের কবিকে কাছে পাওয়ার প্রয়াস ঘটে। ১৯৭২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুমোদনক্রমে তাঁরও সরকার

কবিকে ঢাকার পাঠাতে সম্মত হন। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে বে একটি বিশেষ কোয়ার ক্রেতশীপ
বিশাদ কবিকে নিয়ে সকাল ১১-৪০ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

সংকীর্ণ জ্ঞানের জন্য সকাল থেকেই বিমান বন্দরে তীব্র জ্বরে ছড় ছড়। বিমান-বন্দর ভবনের
ছাদ এবং বান্ডরের একাংশ সকাল ১০টার মধ্যে সকল বয়সের দাবী-পুরুষে ভরে যায়। সকলের
হাতে ছিল কুলের বাল। ও তবক। কবির আগমন উপলক্ষে সে-সব পত্রিকাসমূহে যে বিবরণ
প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি উদ্ধৃতি:

দৈনিক বাংলা/১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৯ সাল। প্রধান সংবাদ শিরোনাম: “নজরুল বাঙালীর
স্বাধীন সত্তার রূপকার”:

“অবিরাম কূলবর্ষণের মাঝে কবি বাংলাদেশে পদার্পণ করলেন। বাঙালীর নিশীড়িত বঞ্চিত মানুষের
কণ্ঠস্বর ‘অগ্নিবীণা’র বিজ্ঞানী কবি কাজী নজরুল ইসলাম গতকাল বুধবার সকালে ঢাকার
এসেছেন। সকাল ১১-৪০ মিনিটে বিজ্ঞানী কবিকে নিয়ে বাংলাদেশে বিমানের একটি কোয়ার
ক্রেতশীপ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। কবিকে বহনকারী বিমানটি বিমানবন্দরে অবতরণ
করার সাথে সাথে অপর্যায়ন বিশাল জনতা গণমণ্ডলীতে হোঁচলে মগ্নিত হয়ে ওঠে। জনতা
আবেগে নিরাপত্তা-বহনী ভেঙে বিমানের চারপাশ ঘিরে ধরে। কাল কবিকে বিমানের তেতর
থেকে বাইরে আনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা পুলিশ বিন বিমিটি চেষ্টা করেও জনতাকে
দূরে সরাতে পারেনি। কাজী সবাসাচী মাইক্রোফোনে বলেন, ‘কবি অত্যন্ত অসুস্থ। আপনাদের
খুশী করার জন্যে তবুও আমরা তাঁকে বাংলাদেশে এনেছি।’ ছাত্র-সেতারাও অনুরোধ জানান।
এরপর বিমানের সামনের দরোজা দিয়ে কবিকে কোনমতে একটি গ্রাউন্ডলেসে তোলার চেষ্টা করা হয়। জনতা
এবুলেসের উপর অবিরাম পুষ্পবর্ষণ করেন।

এবুলেসটি কবিকে নিয়ে সরাসরি ধানমন্ডিতে কবির জন্য নির্মিত বাড়ীতে চলে আসে। রাষ্ট্র-
প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে শুভানুশঙ্গ করে যান।
বুধবার কবির ধানমন্ডি বাসভবন কবির সাক্ষাৎপ্রাপীদের তীর্থে পরিপূর্ণ হয়। কবি এর আগে
১৯৩৯ সালে শেখবার ঢাকার এসেছিলেন। সেবার তিনি বনগ্রামে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসভবনে
উঠেছিলেন। পাকিস্তান আমলে একবারও আসেননি।

বিমানবন্দরে পদার্থীদের তেতর ছিলেন স্বাধীনতা, সাংগঠনিক, কণ্ঠশিল্পী, ছাত্র-কলেজ বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ছাত্র-নেতা। আর এসেছিলেন নজরুল একাডেমিস্ট বিভিন্ন সাংস্কৃতিক
প্রতিষ্ঠানের উচ্চ নিম্পীরা।

কবিকে তাঁর বাস-ভবনে বসতিভুক্ত করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ
চৌধুরী বলেন, ‘আমি এসেছি সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে
বহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কবি নজরুলের বাংলাদেশে আগমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।
এই ঘটনা তিস্তুরগীর হয়ে থাকবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামকালে আমরা
নজরুলের কাছ থেকে অশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তাঁর ‘দুর্গম গিরি’ গান তিস্তিন মানুষকে

সংগ্রাহের অনুপ্রেরণা দেবে।' বাংলাদেশ সরকার কবিকে বাসে এক হাজার টাকা ভাতা প্রদান করেছেন। এ যোষণার পর থেকে জা কবিকরী করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ধানমন্ডি বাসভবনে দেখে আসার পর এই সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।"

দৈনিক বাংলার (১২ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯ সাল) এই সংবাদ পত্রিবেশিত হয় :

'রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী বিদ্রোহী কবি নজরুলের সমগ্র রচনাবলীর প্রকাশ এবং দেশের আগামী নাগরিকদের জন্য তা সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কবি নজরুলই বাঙালীজাতিকে সভ্য, ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন। নজরুলের কাব্যসত্তা, গীতিমালা, স্মরণিপি ও অন্যান্য রচনা সংরক্ষণের দায়িত্ব দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে বলে রাষ্ট্রপ্রধান উল্লেখ করেন।"

পত্র-পত্রিকার কবি-সভার মূল্যায়ন :

জীবিত কবিকে শ্রবণে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যে প্রথম 'নজরুল-জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হয় সে সরকারি অনুষ্ঠিত নয়। পড়েছে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। এখানে পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত করেকটি সম্পাদকীয়ের আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

১৯৭২-এর ১১ই জ্যেষ্ঠের "দৈনিক বাংলার" সম্পাদকীয় 'নজরুলের শ্রেয়ণার সাথে'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

"বাংলার মান্নির পলির রসে, বাংলার আত্মায় রক্তের দ্রবত্বে উৎকীর্ণ তাঁর নাম। ত্রিলে ত্রিলে নিজেকে উজাড় করে তিনি ভালবেসেছেন এ দেশের মান্নিকে। মানুষের দুঃখের, যন্ত্রণার, সংগ্রামের এত বড় শরীক হতে পেরেছেন খুব কম কবি এবং শিল্পী। বাংলাদেশের মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কৈশোর আর যৌবনের স্মৃতি। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম এখানে। এ মান্নির সংগে সংযোগ তাঁর নাড়ীর। আমাদের সবচেয়ে বড় সাহসনা, তাঁর কবিতার, অগ্নিবীণার, গানের স্নিগ্ধ সরোবরে নৈঃচেতন হয়েছি। তাঁর এ আলোর পথ ধরেই যাত্রা করছি আমরা। তিনি আমাদের সংগে। চিরকাল থাকবেন।---"

"দৈনিক ইত্তেফাকে"র সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

"বলা বাহুল্য, কবি নজরুলের নামের পুরোভাবে সংযোজিত 'বিদ্রোহী' বিশেষণ বেহন তাঁহার সামগ্রিক কীর্তির পরিচয় বহন করে না, একটি বিশেষ সৃষ্টি বা রূপকেই ডাকের করিয়া তুলে,—তেননি তাঁহার বিদ্রোহ কোন ব্যক্তিবিশেষ, শ্রেণীবিশেষ বা সরকার বিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁহার বিদ্রোহ ছিল অসভ্য, অনাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। যে কবির জীবন ও বোধনের জরথখনি দুঃসহ গ্রন্থের অভিক্রমের অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল এবং বাহ্য আত্মার দিনের চমার পথেও সঠিক যোগাইবে, সেই কবি আজ আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নাই।"

‘দৈনিক সংবাদ’র ‘সুসাগত যে বিদ্রোহী কবি’ বীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

“পৃথিবীর জ্যোৎস্নার জাগী জোয়ারের মতো আমরা আনন্দিত। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পেরেছি আমাদের মধ্যে। --- আজ আমরা ধন্য। আজ আমরা বাংলাদেশের সাথে সাত কোটি মানুষ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে ফেলে মনের সমস্ত জ্বিরে স্বাধী কথা কবিকে পোনোড়ে বাধ্য। --- সাবোধ নামে, সত্যিকার স্বাধীনতার নামে আমরা সত্যিকার সোনার বাংলা পড়ার শপথ নিচ্ছি। বীর কবিতা গড় পঁচিশ বছরে বারবার আমাদের এই শপথকে নানিত করেছে, তাঁকে একেবারে সামনে পেরেছি। কবির কবিতা আর গানের অগ্নিবীপাতেই তাঁকে আমরা বরণ করে নিয়েছি।”

‘দৈনিক গণকণ্ঠ’র সম্পাদকীয়—‘সুপ্র বিপ্লবভাষ্যের গান্ধীবা’ :

“দাঁত থাকতে দাঁড়ের নর্যাদা যে আমরা বুঝি না, হুজু নজরুল তাঁর জাজুলা প্রমাণ হিসাবেই আমাদের মাঝে উপস্থিত। অজাব, অনটন, লাঞ্ছনা, উপেক্ষার মাঝেও মর্যাদা তিনি বাংলায় বাংলায় ও বণতুর্গ বাড়িয়েছেন, তখনও তাঁকে শোষণ করা হয়েছে যতি নির্মমভাবেই। চৈতন্য সেদিন আমাদের আসেনি বলেই আমরা বুঝতে পারিনি, কি অনুনা বহু ধারায় চোরাতে চলেছি। --- তবুও তিনি যাচ্ছেন শুধু দেখে নয়, আপন সৃষ্টির মধ্যে এবং সেট সৃষ্টির মাঝেই চিরদিন বেঁচে থাকবেন। কারণ, বহুকাল সব বাহ্যিক সৃষ্টিকে গ্রাস করলেও মস্তকের সৃষ্টির কাছে সে পরাজিত। সবথ মানবজাতির নয় না হওয়া পর্বন্ত এই সৃষ্টি অবিনশ্বর থাকবেই। তাই, তেজসি অবিনশ্বর এক সৃষ্টির অধীনশকে আজ আমরা অন্তরের অন্তরাল থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।---অমৃত নজরুল বলে।”

Morning News-এর সম্পাদকীয় :

A prodigal son of nature—he gave with both hands... ..It is natural that the rebel poet should be close to the hearts of the people of Bangladesh Some of our dreams have yet to be realised. Nazrul Islam, who stood for the down-trodden and oppressed, has a message for us as we move forward.

‘দৈনিক পূর্বদেপ’র ‘কানের জনগায় নীরব কেন কবি?’ বীর্ষক সম্পাদকীয় :

“নজরুল সম্পর্কে বহু জানী শুধী ব্যক্তি বহু বছরের মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সব কিছু বাধ দিয়ে নজরুল সম্পর্কে যে সত্য সবার মূখ দিয়ে বেরিয়েছে, তা হলো নজরুল মানবজাতির কবি। সাক্ষিত মানবজাতির হ্রাসের জন্য তিনি প্রত্যেক সংগ্রামে অসতীর্ণ হয়েছিলেন। --- প্রকৃতপক্ষে কবি বিদ্রোহ করেছিলেন অনাগর, অবিচার, অসচ্চারের বিরুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বের কণাভাতের দ্বারা তিনি শুধু শাসক-শোষকগোষ্ঠীকেই জাগাতে চান নি, সাধে সাধে জনসংগঠনও জাগাতে চেয়েছেন। --- অগোঁড় চাকচ মূখে দিয়ে তিনি পৃথিবীতে আসেননি। জীবনে বহু দুঃখকষ্ট তিনি পেরেছেন। তাই সর্ব-হানির দ্বারা তাঁর কবিতার মধ্যে বৃত্ত হয়ে উঠেছে।”

The People-এর Homage to Nazrul শীর্ষক সম্মানকীর :

Nazrul sang of man, of man groaning in tyranny and oppression. The profound vigour and vitality of his forceful poetry and charming songs inspired the enchained people to rise against the Britishers and the historic liberation movement which led to the emergence of Bangladesh owed much to the spirit of freedom pervading his poetic creations. Endowed as he was with creative vision, he dreamt of a society based on equality and free from exploitation, tyranny and oppression. Nazrul can inspire us now as much in building an ideal society as he did during the liberation movement.

.....The message of Truth and Beauty Nazrul's poetry and songs convey will continue to captivate and vitalise the present as well the future generations. *

‘বাংলার কবী’র ‘স্বাক্ষর আত্মীয় নজরুল’ শীর্ষক সম্মানকীর :

‘মানুষের কবি নজরুল, বিপ্লবানবতার কবি নজরুল তাই দেশের হয়েও বিশ্বজনীন আবেদনে বরা দিয়েছেন। ‘আর্ট ফর আর্টস সেক্’ এর মহান পুণ্যারীচ চেয়ে তিনিই একমাত্র প্রতিভা যিনি ব্যক্তিগত গোপনীয় ভাষায়, ‘আর্ট ফর হেনন্স সেক্’—এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্বাপন করতে চেয়েছিলেন। --- বাংলা ও বাঙালীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ নজরুল তাই আবহমান রূপসী বাংলার প্রাণের প্রিয়তম কবি, অবহেলিত মানবাত্মার পূজ্য নিনাদ। সাহিত্যের সাধনা করে কারাগার বরণের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে তিনি অনন্য। --- সত্যভাষণ এমন নিতীকতার আর তুলনা হয় না। --- আমরা বলব বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণের বলিরে যে নজরুল আসন পেয়েছে, তার কোন কয় নেই--- বাংলার আবহমান সংস্কৃতি আর নজরুল অবিচ্ছিন্ন সত্তা। নজরুল চিরকালের। জয়ন্তু নজরুল।’

১১ই জ্যৈষ্ঠে মহানমারোহে ঢাকায় বিদ্রোহী কবির জন্মদিবস পালিত হয়। পরের দিন পত্রিকা সমূহে সেই উদ্দীপনাময় জন্ম-জয়ন্তীর সংবাদ যে-ভাবে প্রকাশিত হয় তার করেকটি উদ্ধৃতি :

‘বিদ্রোহী কবি নজরুল সকল শোষণ নির্বাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত ‘প্রতিবাদ’ বিরোনানে ‘ইন্ডেক্সক’ লেখেন :

‘সত্যিক কবির মহাপ্রাণী—এই মূর্ত প্রত্যয় লইয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকাসহ বিংবস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র ‘জগ্গিবীণার’ চিরবিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। বিদ্রোহী কবির বশু শোষণবুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্ত পরিবেশে তাঁহার ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্য কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষসহ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, স্বাভাবিক নেত্রা ও কর্মী ছাড়াও মুক্তচিত্তে সর্বশ্রেণীর নাগরিক এইবারই প্রথম বাংলাদেশে কবির জন্মোৎসবে জাতীয় বর্ষাদার সহিত অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্টানে বোম্বের কবি, জীবনের কবি, এবং সর্বোপরি মানুষের কবি কাজী নজরুল

ইসলামের সাহিত্য-কর্মের নুতন মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে কবির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।”

‘কয়েকটি পূর্ণত্ব যুগুত্ব’ শিরোনামে “সংবাদ” বলেন :

‘পঙকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে কবির বর্তমান বাসভবন ধানমন্ডীর আশিষ নগর বোডের বাড়ীটি বাংলার চারু-কবি নজরুলের অনুতিধি উপলক্ষে একটি পূণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। সববেত দর্শনার্থীরা নির্বাক কবির কতকগুলো পূর্ণত্ব যুগুত্বের সান্নিধ্য লাভ করেন। বাকহারা কবি সমাগত শিল্পীদের গান শুনে একসবর হেসে ওঠেন আবার কাঁদেন, আলস করে শিল্পীদের পিঠে হাত মুলিয়ে দেন।...

দুপুরের দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যখন নজরুল গীতির অনুষ্ঠান চালাচ্ছিলেন তখন ‘কুনের জলসায় নীরব’ ক্লাউ কবির বুধে হাসি ফুটে উঠেছিল এবং স্মিতভাবে তিনি মালাগুলো গিচ্ছিলেন এবং যেন বুশী হয়ে সববেত গায়ক-গায়িকাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। --- কবি তবলা বড় ভালবাসেন। তাই তবলটী যখন তবলা বাজানো বন্ধ করেন, তখন তিনি ইশারা করে তাঁকে বাজাতে বলেন। আরে আরে তিনি শিল্পীদের দিকে কুনের পাগড়ি ছুঁড়ে দেন।”

বাসসের উদ্ধৃতি দিয়ে Morning News/Over 50,000 visit Nazrul’ শিরোনাম দিয়ে বলেন :

Over fifty thousand visitors men, women and Children of all ages defied inclement weather yesterday, greeted the rebel poet Kazi Nazrul Islam at his Dhanmondi Residence on the occasion of the poet's 74th birthday.

২

সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে এক বিশেষ সমারোহ-উৎসবের আয়োজন করেন। কবিকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে—১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ গ্রহণ করেন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে :

Extract of the Minutes of the Syndicate held on the 13th April, 1974. Conferment of degree of Honoris Causa on some distinguished persons : With reference to the recommendation of the Academic Council (23.3.74) RESOLVED : That the Degree of Honoris Causa be conferred on the following persons has noted against each :

- I. Professor Satyendranath Bose (D. Sc)
- II. Dr. Muhammed Shahidullah (D. Litt)
- III. Kazi Nazrul Islam (D. Litt)*

- IV. Ustad Ali Akbar Khan (D. Litt)
 V. Hirendra Lal Dey (D. Sc)
 VI. Muhammad Qudrat-Khudai (D. Sc)
 VII. Dr. Kazi Motahar Hussain (D. Sc)
 VIII. Prof. Abul Fazal (D. Litt)

Sd/-
 Registrar

এক সম্মানপত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁরা কবির কষ্টির মূল্যায়ন করেন:

“দেশকানের অরাক্ষণিক-অবক্ষণ-অঙ্ককারকে মৌলকণ্ঠের মত ধারণ করে প্রজ্জ্বলিত আকাংক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যারা বিশ্বলোকে পৌছে দিতে সক্ষম, তাঁরাই মহান। তেমনি এক মহৎ প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ নিরঙ্কিত বাংলার অসম্পূর্ণ পুনর্জাগরণে আহুত সকল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন দষ্টদশ্পে মজ্জমান, তাদের চেতনামোহিত যখন অঙ্ককার বৃষ্টি আর্ষিত, বাংলা সাহিত্যে তখন আপনার আবির্ভাব প্রমিথিউৎসব মত।

আপনার অত্যাঙ্কুল আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের প্রাণে ও শরীরে সঞ্চার করেছিল বিপুল তাকশ্যের ঐশ্বর্য, বেগের আবেগ, গতির উচ্ছ্বাস, স্বাধ্বাধান কল্পনার উদ্ভাস।

আপনি কবি; এবং আপনার কবিত্বপ্রতিভার প্রাণশক্তি বাঙালী জীবনের বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঐক্যে ছিল প্রতিষ্ঠিত। সে-কারণেই আপনার সৃষ্টি মিশির্ভিত জন-মানুষের আকাংক্ষার, সম্ভাবনার, প্রতি-বাদের, বিদ্রোহের ব্যক্তিক্রমী উচ্চারণ। আপনার সাহিত্যকর্ম সত্যস্বপ্ন আর মানবতার উচ্চকণ্ঠ নিকলরূপ। আপনি ছিলেন আপোষহীন সত্যসঙ্গ কবি। ব্রিটিশের রাজদ্রোহ, কারাগার আপনাকে বন্দী করেছে, কিন্তু অকুতোভয় আপনি বিত্তম আনলে প্রজ্জ্বলিত হয়েছেন সত্যের স্বপক্ষে। আপনি সর্বহারার সাম্যবাদী কবি, কল্যাণ আর প্রেম-সাধনার কবি। তাই আজ পর্যন্ত আপনি জন্মগণপ্রিয় কবি, এবং আপনিই সবকাল ও শিরীরীতির সাথে যটিয়েছেন বিস্ময়কর একান্ত সমন্বয়।

কেবলমাত্র জীবনের বহিরঙ্গ সংলাপে নয়, অন্তরঙ্গ অস্তিত্বে আপনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। মানুষের বর্ষে, আয়শক্তির আন্তর্জাতিকতার উৎস হরে কবিতার, প্রবন্ধে, সম্মুখে আপনি তরুণ সমাজকে নামকতার উল্লার আদর্শে প্রানিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রদায়িক সংকটে আপনার লেখনী ছিল সদাশতর্ক, সৃষ্টিশীল ঐক্যবদ্ধ আত্মশক্তির উদ্বোধনে নিরলস।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনিই একমাত্র কবিত্বপ্রতিভা যিনি ঐতিহ্য সন্ধানে এবং নির্মাণে ছিলেন সজ্জল, নির্বন্দ্য। হিন্দু ও মুসলমান, জাতিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ঐতিহ্যকেই আপনি আপনার স্বায়ত্তশাসিত চেতনার নল্লরূপে ব্যবহার করেছেন। আপনার জীবন সম্পৃক্ত ঐতিহ্যবোধ, ধর্মকথার মৌরীবদ্ধতা থেকে ঐতিহ্যকে মুক্তি দিয়েছে। আপনি বাঙালী ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, মনভাষাকার।

আপনি ছিলেন শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারের বিস্ময়কর কাকশিল্পী। প্রবন্ধ এবং অতিজ্ঞাত শব্দ-শৃংখলিত সীমানাকে আপনি প্রসারিত করছেন বৌদ্ধিক নল্ল-সম্ভারের এলাকার, কর্বনো বা

কিমনী ভাষার গীতগদ্য। আপনার কবিত্ব-প্রতিভার প্রবল আবেশে বিচিত্র-উৎসর্গে কল্যাণী
ব্যক্তির হয়েছেন পুষ্টিভিত্তিক।

সঙ্গীত জগতে আপনার অবদান অতুলনীয়, বিচিত্রবর্নী ও স্বতন্ত্র। আপনার স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গীত
সর্বকালের বাঙালীকে করবে উত্থাপিত, উত্তেজিত। আপনি কেবল বিশুল সংখ্যক গানের স্বতন্ত্র
নয়, সুরের সূত্রী পদ্ধতিতে আপনি সঙ্গীত জগতের নতুন পথ-নির্দেশক। আজও আপনি বাংলা-
দেশের বিচিত্রবর্নী সঙ্গীতের অনতিক্রম্য নীতিগত সীমার সীমার সীমার।

আপনার দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ বয়সি স্বতন্ত্র আপনি স্বতন্ত্র। আপনার সাহসী অভিব্যক্তি-সাহসের স্বতন্ত্র
ঐশ্বর্য থেকে আনন্দ বহিত। আপনার দু'নগের সঙ্গীতজগতের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং অভিন্নত্বের
উচ্চাধিকারের সৌভাগ্যে চিরকৃত জাতি দিগন্ত প্রাধান্য করে যে, আপনি আনন্দ স্বতন্ত্র
হয়ে উঠুন। আজ আপনাকে সন্তান আনবার স্বপ্নের পেয়ে আনন্দ দিগন্তের অন্য বহন করছি।"

৩

সময়কাল প্রথমতঃ অতিথি হিসাবে এলও বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে আপনমনে হিসাবে দিগন্তের বহন
দেখতে চেয়েছিলেন। ভারত সরকার এ-দেশের মানুষের সৌভাগ্য বৃদ্ধি তাঁকে কিয়দে নেওয়ার
ভেদন কোন চেষ্টা করেননি। বাংলাদেশে থাকাকালীন কবির স্বাভাবিক প্রথম দিকে উদ্ভূতি লাভ
করে। তাঁর স্বাভাবিক অন্য সুচিন্তিত্বের ব্যবস্থা করা হয় এবং একটি চিকিৎসক কমিটির তত্ত্বাবধানে
তাঁকে রাখা হয়। এ-কবির বাংলাদেশের মানুষ মাথা করে যে কবি তাঁদের দেশের নাগরিক
পাঠবেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার
তাঁকে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দান করেন।

১৯৭৬ ইংরেজীর একুশে কেন্দ্রীয় শহীদ দিবস উপলক্ষে সরকার সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার একুশে
পদকে ভূষিত করেন মহান এই কবিকে।

১৯৭৬ সালের ২৪শে মে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর "মার্স-ক্রস্ট"
উপহার দেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গ-এর কবিতা নিয়ে Bangladesh Times-এ খবরটি এইভাবে
প্রকাশিত হয়:

Major General Ziaur Rahman Chief of Army Staff and Deputy Chief Martial
Law Administrator visited the rebel poet Kazi Nazrul Islam at the P. G. Hospital
on Tuesday and presented him the Crest of Bangladesh Army.

কবিকে চিকিৎসকদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের জন্য কবিকে ইতিমধ্যে তাঁর বাসভবন গৃহ থেকে
ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে কবি পি. জি. হাসপাতালে
অবস্থান করছিলেন। হাসপাতালে আসার পর থেকে কবির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে
শুরু। কবির স্বাস্থ্য বারংবার। তাঁর পায়ে কিছু কিছু পানি জমা ছিল।

১৯৭৬-এর আগস্টে এসে কবির বাহ্যের আরও অবনতি ঘটে এবং আগস্টের ২৯ তারিখে বেল ১০টা ১০ মিনিটে কবি এতকাল করেন। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী কবির বাহ্যে পোড়ানো ডানাই বাড়িল। তত্ত্বাবধায় (২৭শে আগস্ট ১৯৭৬) বিকেল চারটার দিকে তাঁর পায়ে লাঠাল জ্বর আসে। শনিবার (২৮শে আগস্ট) সকাল ১১টার পর জ্বর বাড়তে শুরু করে। জ্বর ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। ডাক্তার তাঁকে দেখে বলেন, কবি ব্রুজো দিব্যানিরার আক্রান্ত হয়েছেন। উভয় দেহা হয়। রাতে তাঁকে ঘুম ও পাউলিট খেতে দেয়া হয়। রোববার (২৯শে আগস্ট) সকালে জ্বর আরো বাড়ে। একশ' পাঁচ ডিগ্রীরও বেশী। কবি অধিরতাবে কক্ষগোচরে কাকে দেখা যেতেন। কবিকে তখন অজ্ঞান দেয়া হয়। কবির কুসকল থেকে কক্ষের কক্ষর জন্য সাক্ষাৎ দেয়া শুরু হয়। বিগত বছরের ২২শে জুলাই পট্টভূমিতে কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী আসেন সকাল ৮-১০এ। সকাল পৌনে ৯টার নিচাঁর শামসুন্নাহার কবির বুখে চার চাবচ পানি তুলে দেন। এরপর কবি আর কিছু খাননি। গোরা ৯টার বোর্ড কবির বাহ্যে আবার পরীক্ষা করেন। জ্বর কমাবার শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁর পরীর একবার স্নান করা হয়। এর আগে কবিকে জীবনরক্ষাকারী ঔষধও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কবির অবস্থা তত-পতিতে আরো খারাপ হতে থাকে। সন্ধ্যা কাটে সকলের অস্বাভাবিক উত্তেজনার। চিকিৎসকরা কবির আশা ছেড়ে দেন—যত্নের সুহৃদের অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। দশটার দিকে কবি আরো নিশ্বেদন হয়ে পড়েন। একসময় শ্রীদার ওয়াহিদউল্লাহ ডুইরা টেঁচিয়ে বলেন, 'কবির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।' ডাক্তাররা শেষবারের বত পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন : কবি আর জীবিত নেই। তখন সন্ধ্যা দশটা দশ মিনিট। শোকাক্ত কণ্ঠে সবাই উচ্চারণ করেন : 'ইনশাআল্লাহে ওয়া ইলাইহা ইলাইহে রাজেউন।'

রেজিও, টেলিভিশনের সিরমিত প্রচার বন্ধ রেখে কবির মৃত্যু' সংবাদ ঘোষণা করা হ'তে থাকে। অপ্রত্যাশিত এই সংবাদে সারা নগরী শোকাভিত্ত হতে বিশেষভাবে হয়ে পড়লো। আবানবৃদ্ধবসিত অশ্রুভেজা চোখে ডীড জ্বাতে শুরু করলো পি. জি. হাসপাতালের আতিনার ও কবির অতিন দিনগুলোর আশুর পোস্ট গ্রাফুয়েট হাসপাতালের ১১৭নং কেবিনের সামনে। বাত পনের মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে ছুটে এলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সারেন, এলেন বেকর জেমারেল জিরাউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল এম, এইচ, খান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যমূল, রাজনৈতিক নেতৃমূল, কবি, বিলম্বী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, সাংবাদিক, দিনরজুর, রিকসাওয়ালা তথা সর্বস্তরের মানুষ—আশায়ের জনসাধারণ। বর্ণগাভীতে সেই টাফল জনসমূহের উচ্ছ্বাস প্রবাহ করলো, এসেবের মানুষের ছন্দে কবির জন্য কী বিপুল শ্রদ্ধার আসন পাতা হয়েছে। জনতার হাতে কুল, সোঁদাল, আগরবাড়ি—আর চোখুডরা অশ্রু—আপনজন হারানোর খেঁচনার মর্ষাস।

স্মৃতিসংগ্ৰহ

পি. জি. হাসপাতালে কবির সাথে একবছরের যথু সাহচর্যের স্মৃতিসংগ্ৰহে অনেক চিকিৎসক ও কর্মচারীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কবির আবাস সেই কেবিনটি, যেখানে কবি এক বছর,

এক ঘাট এক সতীর চিকিৎসারীণ ছিলেন, সে ককট বহু করে সেবা করেন কবির ব্যকবৃত্ত
 বিশিষ্টতায় ইত্যাদি সোনার কথা নিম্নে উক্ত হয়ে উঠে। হাসন প্রতিদিন বেধেন, নত নত হাসন
 কেমিনটিকে বিয়ে হয়েছে। পদম আত্মহ নিয়ে তারা দেখছে কবি কি ব্যকবৃত্ত করতেন, কি পদম
 করতেন ও কি তাঁর পরিবেশ। কবির দীর্ঘ জিন করতেন তুতা ও সাধী কিশোর সাহ প্রবীণ
 স্টুডেন্ট সৈরন হাসির আলী, স্টাক নার্স বিলকিন বেসন এবং কবি উভয়ের চৌকিদার বুজিবুর রহমান
 উৎসাহ নরকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন বিবশুধু, অশ্রুসিক্ত চোখে।

পি. জি. হাসপাতালের স্টুডেন্ট সৈরন হাসির আলী বলেন, 'আমি কেবিনে চোকার সাথে সাথে কবি
 কাঁদতেন। আমি ভর পেতাম। কবি কেন কাঁদতেন-আমি জানতাম না। আমি কোন কারণ বুঝে পেতাম
 না। আমরা তাঁকে কখনো রোগী হিসাবে দেখিনি, দেখছি নায়েবে রতুল হিসাবে। তাঁর কবিতা, গান,
 গল্প আমাদের মনে এই ভাববুড়ি এঁকে দিয়েছে।' উল্লেখ্য মানসীর উপদেষ্টা কর্ণেল এম, এম,
 হকের উদ্ভাবনানে সৈরন হাসির আলীই কবিকে শেষ পোশাক দেন জামাআ ও গার্মেন্ট পূর্বে।

কবির সাধী ও তুতা কিশোর সাহ বলেন, 'বাঘা বছর বয়সে কবি পরিবারে এসে কবির আকর্ষণেই
 আমি এতো দীর্ঘদিন এ পরিবারে থেকে যাই। পক্ষান্তরে আত্মহ হয়ে কবি-পত্নী বাবা বেলে
 কবি দারুণ আঘাত পান। কবির বাঘার জন্ম দীর্ঘকাল আমি আমার মা-বাবাকে দেখতে যাইনি।
 আজ সকালবেলা দুবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কবি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর শেষ সিঁদুল
 ত্যাগের সময় আমি এখানে ছিলাম না। তাঁর বাবার আদতে বীচে পিরেছিলেন। সকালে কবিকে
 বুঝে বিবশু দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয়, কবির শেষ ডাক আসল।'

কবির কেবিনের দরিতে নিবৃত্ত স্টাক নার্স বিলকিন বেসন বলেন, 'আমি আমার সহকর্মী ও ভূমিরক্ষা
 কবিকে দাদু বলে ডাকতাম। দাদু আমাদের চিনতে পারতেন। আমরা তাঁকে বাওরাজনও।
 তাঁর শরনের কপড় কবিরে দিতাম। বিছানা পরিপাটি করতাম। দাদু আমাদের আশ্রয়ভবন
 বজাে ভালবাসতেন। আমরা আমাদের ছুটির দিনেও তাঁর পরিচর্যা করতাম। কবির আমাদের
 সব পছন্দ করতেন।

কবি আত্মহ সতীর্থকাত্ত ছিলেন। আমাদের সব বন্ধন তাঁর পছন্দ না হতো তখন তিনি বিব্রত বোধ
 করতেন। একদিন আমি এক বজার কথা বলার কবি বুনি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিরেছিলেন।'

কবি-উভয়ের চৌকিদার বুজিবুর রহমান বলেন, 'কবিকে তাঁর পত্নী কিংবা তাঁর তরুণ বয়সের
 ছবি দেখলে তিনি হাসতেন। তাঁর গানের টোপ বাজালে কিংবা কোন নিন্দা তাঁর লামনে
 তাঁর বিশেষ কতকগুলো গান করলে তিনি কাঁদতেন। আমার কতকগুলো গান বাজালে বা
 গীতগাহ হলে তিনি হাসতেন। কবি মিষ্ট এবং গান ভালবাসতেন। বাংলার দিতে দেখা হলে কবি
 বিরক্ত হতেন। কবি কুম ভালবাসতেন। কুম সেবা হলে তিনি বুনি হতেন।'

পূর্ববর্তী বছরের পঁচাত্তর আশ্রয় থেকে কবির জন্য নিবৃত্ত এ্যাটেন্ড্যান্ট দ্রাবার ওয়াহিদউল্লাহ দুইয়ার
 সাথে দৈনিক বাংলার প্রতিবেদকের আলোচনায় হর পি. জি. হাসপাতালে। তিনি বলেন, 'সাহা

বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন কবির স্বজন। কবির জীবন হলো আনি কবিকে সেবা করতে পেরেছি।’ তিনি দুঃখ করে বলেন, ‘কবি এতদিন হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন আত্মীয় তাঁকে দেখতে আসেননি। পিতাকে সেবা করে কেমন আনন্দ পায় সন্তান, তেমনি প্রিয় কবিকে সন্তানের মতো সেবা দিতে আশ্রয় চেষ্টা করেছি সবাই।’

৪

অনন্ত-যাত্রার

সবাই যাতে কবিকে শেষ দেখা দেবতে পার তাঁর জন্য সোরা এগারোটার তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে বের করে এনে রাখা হয় আউটডোরের দোড়ার হলবয়ের উঁচু বকে। কিন্তু কিছুকণের মধ্যে এখানেও ভাঁড়ের চাপ বোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লোবানের ঘোঁষা আর আন্দর-বাতির গন্ধের পবিত্র পরিবেশে তাঁর নশুর দেহের পাশে চলাছিল পবিত্র কোরান পাঠ। পুলিশ জনতাকে লাইন করাতে গিয়ে হিবসির বাঁজিল। অবশেষে অস্ত্রহীন লোকের মিছিল ক্রমেই দূর্বীর হয়ে ওঠে। দুঃসাহ্য হয় শৃংখলার ব্যবস্থাপনা। কবির মরদেহ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের গোলা চব্বরে নিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে অধ্যাপক আবুল কক্সলকে সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট সারের নিজে বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গল এলাকার গিরে বিজোহী কবির কবরের স্থান নির্বাচন করেন।

বেলা আড়াইটার দিকে কবির লাশবাহী ট্রাক টি, এস, সি পথে রওয়ানা হয়। জনসমুহের মিছিল ঠেলে এই সামান্য পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে পুরো আধঘণ্টা। পথের দুপাশে অশ্রুশিক্ত চোখে উদ্বেলিত জনতার মুখে ছিল কলেকা খাহানাত।

কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দলে দলে জনপ্রবাহ ভেঙে পড়তে থাকে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। কবির মরদেহ নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর আগেই সেখানে স্ট্রীটের বিরাট ভীড়। কুলের তোড়া, মালা কিংবা কুল নিবেদন করে তারা শ্রদ্ধা জানায় কবির প্রতি। ক্রমশঃ সেখানেও ভীড় দুনিয়ার হয়ে ওঠে।

বিকেল সাড়ে চারটার বিরাট শোক-মিছিল লাশ নিয়ে রওনা হয় সোহরাওয়ারী উদ্যানের দিকে। নাথো মানুষের চল নামে সারা উদ্যান জুড়ে। বিকেল পাঁচটার সর্বতরের মানুষের সেই মহামেলার অনুষ্ঠিত হয় কবির নামাজে জানাজা। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এ জানাজা সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম নামাজে জানাজা।

প্রেসিডেন্ট সারের, সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বেজর জেনারেল জিরাউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিরায় এভবিয়ান এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনীর সহকারী স্টাফ প্রধান এয়ার জাইল মার্শাল এ. ডি. মাহমুদ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ; রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশুল সংখ্যক কবি সাহিত্যিক নিম্নী জানাজার উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে বিবুত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ খুরশীদও জানাজার অংশ নেন। কয় দুসদিন ঘোঁষা কুটনীতিমূলক উপস্থিত ছিলেন উক্ত জানাজার।

ভাঙ্গা কাঁচের লাল দাঁকনের জন্য আনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভিৎ প্রাঙ্গণের নির্ধারিত স্থানে। কবির শরৎকাল বীরা বহন করেছেন বঙ্গভিৎ প্রাঙ্গণ পর্যন্ত তাঁদের যথো ছিলেন। রাষ্ট্রপতি বিভাগ-পতি আবু সাদাত বোহাশম সারেন, সেক্স জেনারেল জিরাউর মহান, বিরা এডমিরাল মুশারফ হুসেইন খান, ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বি. ডি. আর. প্রধান সেক্স জেনারেল বঙ্গভিৎ।

আসরের নামাযের পর কবির সরদের পূর্ণ হাটীর বর্ষালার সমাহিত করা হয়। লাল কবরে নামাযের আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয় কবির পূর্ণ কাঁচী সমাহারীর আগমন প্রত্যাশার। কিছু তাঁর আসতে বিলম্ব ঘটে।

জুনিয়র টাইগার নামে পরিচিত সেক্স জেনারেল রেজিমেন্টে বিউগলে শেষ বিদায়ের কক্ষ বুরুশা তোলে। একশ বার জেগেবনীর সাথে সাথে বাংলা এই মহান কবির মমুর দেহ কবরে নামানো হয়। কবির সমাহিত করার সময় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের রাষ্ট্রবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন।

ইটবেজল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন সৈনিক দাঁড়িয়েছিলেন কবিরের অপেক্ষার। কবির আসে—লাই প্রেসেন্টে আসেন। একের পর এক বিশটি রাইফেল গর্জে ওঠে। সবশেষ হয় তলী কারার। প্রচার নির্দেশ স্বরূপ অবনতিত হয় রেজিমেন্টাল কালার—বীরত্বের প্রতীক, রেজিমেন্টের মিলন পতাকা। বিউগলে বেজে ওঠে লাস্ট পোস্টের কক্ষ স্বর। বিকল ৫-১০টা তবস—প্রদর্শিত লরে লাস্ট পোস্ট বেজে চলছিল। কাকনের উপর থেকে কুনের জুগ সরিয়ে কবির মমুর দেহ নামানো হয় কবরে। কঁপে কঁপে তিন মিনিট বরে বেজে যায় বিউগলের লাস্ট-পোস্ট। সমাহার পাশে দাঁড়িয়ে সেক্স জেনারেল জিরাউর মহান ইটবেজল রেজিমেন্টের বঙ্গভিৎ হিসাবে কবির বিদায় গান 'চল চল চল'-কে ঘোষণা করেন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ও বঙ্গভিৎ হিসাবে কবির স্বাধীনতা ঘোষণা সেদিন এ গানটিকে গ্রহণ করেছিলেন। কবির কবরে সবাই ছড়িয়ে দেন হাটী। পড়েন, 'বিন্ধা খালাক্সান-..... উবরা।' উচ্চারিত হয় হাজারো মুখে কালোয় শাহাদাত—'আশাহাদ, আল্লা-ইলাহা -.....' লোকস শেষ হয়। কবিরে দাঁড়িয়ে কবির করে দোয়া পাঠ করা হয়। অন্তিম কবির পোরে মাল্যদান করেন প্রেসিডেন্ট সারেন। মাল্যদান করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাহিনীর তরক থেকে সেক্স জেনারেল জিরাউর মহান, বিরা এডমিরাল এবং, এইচ. খান, এরার জাইন বর্ষাল এ. ডি. মাহমুদ ও সেক্স জেনারেল বঙ্গভিৎ। নামাযানের পর এঁরা সকলেই কবিরের সামনে দাঁড়িয়ে সার্বিক কারদার অভিযান করে কবিরে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

৪

শোকবাণী

কবি কাঁচী নজরুল ইসলামের মহাপ্রাণে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আবুসাদাত বোহাশম সারেন বলেন, 'কবির মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যিকদের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারিয়ে গেলো। কবি তাঁর অনাকরণ ও বহুবর্ণী প্রতিভা দিয়ে শুধু যে বাংলা সাহিত্যকে নতুন ও জর বর্ষা বৃষ্টি করেছেন তাই নয়, জাতিকে একটি স্বাধীন নতুন অর্থের সত্ত্বায়ে প্রেরণাও বৃদ্ধি করেছেন।'

সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান ও উপ-প্রধান সাহিত্যিক আইন প্রণালিক বেজব ভেনায়েস জিরাজির সহবাস গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'বিরোধী কবি নজরুল ছিলেন মানবতা ও সাহায্য কবি।' 'বিরোধী কবি তাঁর কবিতা গান শ্রবণ ও অস্বাভাবিক নজরুল সাহিত্যিকের মধ্য দিয়ে অবতরণ করে থাকবেন।'

সেনার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সাময়িক রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি-বর্গ গভীর শোক প্রকাশ করে কবির রহস্যের হার্ষকোষে কান্না করেন এবং তাঁর কবির স্মরণে সোচ্চার হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলেন, 'নজরুল ইসলাম ছিলেন মিল্লিত কবিতা কবি।' সেনার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সেনার পর দিন শোকগভীর বকর আসতে থাকে।

বিভিন্ন সেনার স্টাফপ্রধান ও স্টাফসুভা তাঁর সহপ্রাণে শোকবাণী পাঠান:

ভারতের স্টাফপতি কবরুলীন আলী আহমদ শোকবাণীতে বলেন, 'কবির সেনাপ্রের এবং কিশোরী চেতনা ভারত এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিলেন ইলিরা গান্ধী তাঁর বৃত্তান্তে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'তাঁর সজীব জীবনে কবি বা নির্বোধের জাতিকে বাংলা সাহিত্যে অবতরণ করে রেখেছে। তাঁর বৃত্তা ভারত এবং বাংলাদেশকে রক্ত করে দিয়েছে।'

বালরেশিয়ার হাই কমিশনার জনাব ইলবাইল আখিরা ও বালরেশিয়ার নাগরিকতা কবি নজরুলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বুগোপ্লাভিয়ার স্টাফসুভা ডঃ ডিভেন কন্টিক এবং বাংলাদেশে বসবাসরত বুগোপ্লাভ নাগরিকতা বিরোধী কবি নজরুলের বৃত্তান্তে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

চাকার সোভিয়েট ইউনিয়নের দুজবাল বাংলাদেশে বসবাসরত সোভিয়েট নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিরোধী কবি নজরুলের বৃত্তান্তে শোক প্রকাশ করেন। দুজবালের এক শোকবাণীতে বলা হয়, 'নজরুল সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপরিচিত কবি। তিনি ছিলেন আধুনিক কালের অসামান্য শ্রেষ্ঠ কবি।'

বাংলাদেশে নিবৃত্ত নিবিরার স্টাফসুভা জনাব আলী হোসেন আবু-গাদাবলী 'বহান মুসলিম কবি' কান্ধী নজরুল ইসলামের বৃত্তান্তে বাঙালী জাতির প্রতি যথাসুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি কবির রহস্যের হার্ষকোষে কান্না করে কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানান।

ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্ন পরিষদ বিরোধী কবি নজরুলের স্মৃতি প্রতি শ্রদ্ধাভাষি নিবেদন করেন। কবির রহস্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পার্লামেন্ট সমন্বয় এক বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য খানস করেন। শোকগভীর স্পীকার শ্রী বি. আর. ভগত বলেন, 'নজরুলের জীবন ও রচনাবলী যুগ যুগ হয়ে জনসাধারণকে প্রেরণা দেবে।'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সি. পি. আই. গভীর শোক প্রকাশ করেন। সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দ্র হাও বলেন, 'কবি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিল্লিত প্রকৃতি।'

শ্রীনিহার্য পংকজ হার বলেন, 'কবির বৃত্তান্তে একটা স্মরণীয় মুহুর্ত অবতরণ ঘটবে।--

তদুপাত্রে বাংলাদেশ জনগণই কবিরে স্মরণ করবে যা, আশ্রয় করবে দেশবাসীই তাঁকে স্মরণ করবে।' এছাড়া সেনার বিভিন্ন একাঙ্গ থেকে বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি এবং কবিরের আত্মীয়স্বজন শোকবাণী আসতে থাকে কবির সহপ্রাণের পক্ষ।

কবির মৃত্যুর পনের দিন ১৩ই ডায়, ১৩৮৩ শাম (৩০শে অক্টো, ১৯৭৬ ইং) দৈনিক বাংলায় বকর ছিল এই: ২ দিন জাতীয় শোক, পূর্ব জাতীয় সর্বাঙ্গীয় সমাহিত, জাতীয় পতাকা অর্ধসম্বিত: আর সরকারী ছুটি ঘোষণা: সারা দেশে শোকের ছায়া। 'আজ জাতীয় ছুটি' শিরোনামের সংবাদে উদ্বোধন করেন: "জাতীয় বীর কবি নজরুল ইসলামের ইন্তেকামে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে সরকার আর সোমবার জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন।

পতাকার সোমবার জাতীয় পতাকা অর্ধসম্বিত থাকে। 'আজ সোমবারও জাতীয় পতাকা অর্ধসম্বিত থাকবে।' উদ্বোধন হাইকোর্ট সহ সবচেয়ে নিম্ন আদালত, বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজিস্ট্রার সমিতির সকল অফিস সবচেয়ে সরকারী ও বেসরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ, মহাশিলা এবং কল-কারখানা ইত্যাদি একদিন বন্ধ থাকে।

কবির মৃত্যুর পর: পত্র-পত্রিকার সম্মেলনের জলস্রাব

মহাকবির মহানৃত্যতে বাংলাদেশী জনরপ শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়েন। তাঁদের অন্তরল সর্বত্র মহাবীরের মহাপ্রাণে অশান্ত হ'য়ে ওঠে। কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল সীমাহীন। সেই সীমাহীন শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বাধীন দৈনিক সবুজে। সেদিনের সংবাদ শিরোনামগুলি ছিল নিম্নরূপ:

দৈনিক বাংলার প্রধান বকর ছিল "চির নিত্যের বিরোধী কবি নজরুল।" তাঁদের সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল, 'চির-বিরোধী বীর।' এতে উদ্বোধন করেন:

"বাংলা সাহিত্যের সেই বিহীন পুরুষদের তিনি সত্যত: শেষ প্রতিনিধি যিনি সাহিত্যের সঙ্গে জীবন, আবেশিকতা, আর সংগ্রামকে সিঁড়িতে সংযুক্ত করেছিলেন।...

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে কোমল-কঠোর বিপ্লবিত এবং ব্যক্তির আর চোখে পড়ে না।...

নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার অমল্য প্রতীক—বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারাকে তিনি বেহন পরিপুষ্ট করেছেন, তেমনি পশ্চাত্যের বাঙালী মুসলমান সবাইকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে।...

সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁর বহু, উল্লস আর মানবধর্ম।...

আমাদের সাহস, কবি নজরুল অমল্য, কবি নজরুল অনিশ্চয়, অমল্য তাঁর স্বাধীনতা আর বিরোধের বাণী।... স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর মনুষ্যত্বের নজরুলের কাছ থেকে বুঝে নেবে শক্তি, সাহস আর অনুপ্রেরণা।... জাতি হিসাবে আমরা তাঁর কাছে গণী।"

সেদিনের "সংবাদ"-সম্পাদকীয় ছিল 'যুগির বেছে শ্রান্ত হয়ে'। তাঁরা তাঁর সর্বাঙ্গীয় দিকে আলোকপাত করে বলেন: 'জাতিসীম কোমলভিত্তিক কবি ও স্বরকারী জীবিত থেকেও অনুভব করে যেতে পারেন যি যে, বাংলাদেশী সকল মানুষেরই শ্রদ্ধার বাসনা তাঁর অঙ্গ করে গিয়েছেন। পূর্বে শুধু এইক' যে, শ্রদ্ধা তাঁর সার্বিক শরীর প্রত্যঙ্গ অনুভব করতে পারেন না, অতঃপর অতঃপরই তাঁর মহাপ্রাণ আমাদের প্রত্যঙ্গ করতে হতো।...

নজরুল বিরোধে বাঙালী আত্ম হতবাক। বিরোধী কবিকে তাঁর অনন্তমোকে ব্যক্তিগত শেখ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আত্মাও বসি—‘কে বলে মরেছে তুমি যে অমর আছো চিরদিন।’

কবির ইন্তেকালে “আবাদের” সম্পাদকীয় ‘আবাদের কবি আর নাই’। তাঁরা বলেন : ‘সকলকে কেন্দ্রে নজরুলের অবদান শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়—কিন্তু সাহিত্যেও বিস্ময় সৃষ্টির দাবী রাখে।’

তাঁরা তাঁকে ‘মুসলিম সমাজের আগরণের চারণ কবি’ বলেন। তাঁরা আরও বলেন : “নজরুল আবাদের জাতীয় কবি। তাঁর প্রতিটি স্রষ্টাই আবাদের জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণ জাতির জন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অনুবাদের মাধ্যমে নজরুল সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যবোধীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাও আবাদের একটি প্রধান দায়িত্ব।”

Bangladesh Times “Undying Flame” শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলেন :

‘The Rebel Poet is dead. But the flame will burn undyingly. “Blood, imagination and intellect” ran together in him to produce one of the finest artisans of words. The brevity of his stay did not stand in the way of making him an immortal figure of Bengali literature. As long as Bengali is spoken, Kazi Nazrul Islam will be remembered with appropriate reverence. His melodies will ring in our minds eternally. A brilliant era in Bengali literature has come to an end the sparks from which will inspire posterity for earning new laurels in literature.’

তাঁর মহাবিদ্যারে ‘সম্পাদকের নজরুল খেতক’ সাপ্তাহিক ‘চিত্রাঙ্গী’ বলেন :

“বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসে ও জীবন-চর্চায় যে মানুষটি ছিল উজ্জ্বলতম নজরুলের মতো দেবীপামান, সূর্যের মত ডেহবশী সেই বিরোধী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর নেই।...

বাংলাদেশের ইতিহাসে নজরুল বুগুঠা। স্বাধীনতার সন-সাময়িককালে জন্ম নিয়ে স্বাধীন-প্রভাবের কালে পদচারণা করেও নজরুল সবিসবরের বাইরে নতুন চিত্র স্থাপন করে অনন্যতায় তাঁর বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। তাঁরা নজরুলকে বুগুঠের নর হুগুগুগের কবি বলে আখ্যায়িত করতে চান, তাঁরা হাত। নজরুল কোন অর্থেই হুগুগুগের কবি নন, সর্বঅর্থে তিনি বুগুঠা এবং সর্ববুগুগের। বুগুগে বুগুগে যদি আত্মা বিপন্ন হয়, যদি আবাদের অবিকার নিয়ে কোন নীতি ছিনিবিদি বেগুতে চায়, তখন আত্মা জানি, নতুন সংগ্রামের প্রেরণা হিসাবে তখনও নজরুল আবাদের অবলম্বন।”

কবির শেখ কাদেরের প্রেক্ষিতে ‘চিরন্তিন চিরবিরোধী’ সম্পাদকীয় নিবন্ধে ‘পূর্বাবনী’ বলেন :

“আবাদের সাহিত্য জগতের কীভাবে মহাপুরুষ আবাদের ঐতিহ্যের পরবর্তীকালীন মহৎব্যক্তি, আবাদের সাংস্কৃতিক চেতনার মৌল ধারার প্রগতি স্রষ্টাবনী নীতি বিরোধী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পামানী, বাংলাদেশের কোমল বাউন্ডে চিরনিরন্তর দায়িত্ব হারিয়েছেন। কবি নজরুল, সাহিত্যিক নজরুল, সাংবাদিক নজরুল, বানবৈজ্ঞানিক নজরুল, তাঁর চিন্তা, তাঁর চেতনার হিমেই নির্মিত ও আপোষহীন। নীলকণ্ঠের ন্যায় সনত হলাহল পান করে কবি আত্মীয় অনুভব সম্মুখে হুটোয়েন। কবির কবিতা কবির বানবৈজ্ঞানী আদর্শ আবাদের জন্য পথের দিশা হয়ে থাকবে।”

ইতিহাসিক, তাঁদের সম্পাদকীয় 'বিদ্রোহী কবির মহাসভা'র করেন :

'ভোমের কান্দার বড় আঁজ প্রভিজনের হৃদয়ে হৃদয়ে ব্যক্তিভেদে একটি করণ বেদার। 'জোমাদের পানে চাহিয়া বহু আর আরি জাগিব না' কবির এই ব্যাবিত উচ্চারণ আজ শাবিক অর্ধেই সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম যেখানে সত্য, সেখানে সত্যের চিত্র নাই। পাথক শিখার বড় তিনি জুলন্ত ও সেনীপায়ান। --- হিবালয়ের বড় উঁচু ও অটল শির ছিল তাঁর এবং গোটা ব্যক্তিকে তিনি চারপাশের পাহিয়া উন্মীল করিয়া গিয়াছেন সেই আত্মবোধের পর্যায়ে।

ভোলপাড় করা এক কীড়ির তিনি সস্ত্রাট। বলিষ্ঠ জীবনবোধের নায়ক। শত্রুসীল অন্ধকার তাঁর হাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। আনোর লীল মশান উড়ে তুলিয়া বহার অন্যতম প্রধান ভূমিকা তাঁরই।

--- সাহিত্যের যেখানেই হাত নির্যাজেন, কলাইয়াছেন সোনার ফসল। -----

বাংলা সাহিত্যে এমন বর্ণাচা ব্যক্তির এমন উচ্চকিত প্রাণস্ফূর্তির সজীর আর বিজীয়াট নাই।

--- নজরুল বলিতেই মুখার বেদনা-বিস্মল যা খাওয়া একটি চিরন্তনী প্রেমিককে, মুখার সংসার বিরোধী এক পুরুষকে। শিশুর মতো সয়ল-সুন্দর চোখ, সিংহের কেশরের মত বাঘরি, বজ্রের মত কণ্ঠ—এই ইন্দ্রজও নজরুলের। বাংলা সাহিত্যে তিনি শুধু নুতন বাণীই সংযোজন করেন নাই, নুতন সাহিত্য-ব্যক্তিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপবহাদেশে মুসলমান জাতির আত্মবোধের বিকাশে কবি জাতীয় কবির ভূমিকা পালন করিয়াছেন। নজরুল কখনো আপোষ করেন নাই। কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়া অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিপীড়নের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানেই নজরুল সত্য ও অমর।

কবির মৃত্যু আছে। কনিষ্ঠাঙ্কিত ও তাঁর সজীর মৃত্যু নাই। যতদিন স্রাব ও গোলমেলের জগত আছে, ততদিন থাকিবেন নজরুল। নয়নসমুখে না থাকিলেও তিনি থাকিবেন আমাদের নবনের নকশানে।"

১৯৭২-র ১০ই মে থেকে ১৯৭৬-এর ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে কবির আগমন, অবস্থান, নাগরিকত্ব, মৃত্যুবরণ এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভের এই চল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস আমাদের এই কথাটি বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চির-উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে—জনপ্রিয়তার, শ্রেষ্ঠতম কবির বর্ষাধার এবং ব্যক্তির সমুগুত মহিনায় তিনি চিরকালের চির-উন্মত শির মহাকবি কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুল একাডেমী পত্রিকা নিরঙ্কর

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—বছরের এই ছয় ঋতুতে—অর্থাৎ প্রতি দু'মাসে “নজরুল একাডেমী পত্রিকা”র একটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জীবন, তুহিকা, নামস, প্রতিভা, সাহিত্য, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে বননদীল, বিশ্লেষণবহী ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা এ পত্রিকার প্রধান উপজীব্য। নজরুলের অপ্রকাশিত বা বিস্মৃত রচনা ও পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর গানের স্বরলিপি এতে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এ পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

পত্রিকার প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম ১০'০০। বাৎসরিক চাঁদা ডাকসহ সহ ৭৫'০০ টাকা।
পত্রিকা ভাঙে পেতে হলে বনি-অর্ডারে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে অর্ডার দিতে হবে।

বিক্রেতাদের শতকরা ২৫'০০ টাকা কমিশন দেওয়া হবে। বিক্রেতার বাত কপি পত্রিকা চান, তার প্রতি কপির জন্য ৫'০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম পাঠালে তাঁদের নামে ভি: পি: পাঠানো হবে।

সাধারণ সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম কভার পৃষ্ঠা	৩,০০০'০০
২য় কভার পৃষ্ঠা	২,০০০'০০
৩য় কভার পৃষ্ঠা	১,৫০০'০০
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	১,০০০'০০
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	৫০০'০০

অর্ধ পৃষ্ঠার কমে কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

লেখক, গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

টেলিফোন: ২৫ ৩৫ ৫৫
৪০ ১৬ ৬৬

কর্মীধ্যক্ষ: নজরুল একাডেমী পত্রিকা
বেলালাবাদ কলোনি ময়দান, ঢাকা।
সম্পাদক/ব্যবস্থাপক



একাডেমী সংবাদ

নজরুল ইসলাম ও নজরুল একাডেমী

তালিম হোসেন
[সাধারণ সম্পাদক]

[এক]

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের গণমানসের কবি, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপকার। একই সঙ্গে, তাঁর কবিতা সর্বমানবের কবি-কণ্ঠ, তাঁর গান চির-মানুষের প্রাণের সুর। সাধারণ মানুষের, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা বিকাক্তকে তিনি নিজের জীবনে আয়ত্ব করেছেন, নিজের কণ্ঠে ধ্বনিত করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন একটু সঙ্গে বিদ্রোহীরূপে এবং প্রেমিক-রূপে। বিদ্রোহী ও প্রেমিক নৃত্তির মধ্যে ভাব ও মেজাজের যে আপাত-বিরোধিতা তা সাধারণ মানুষের চেহারাতেই অন্তর্য থাকে। এই অন্তর্যের প্রকাশ-নৃতিই ধারণ করেন তার কবি, তার জীবন-শিল্পী। নজরুল ইসলাম সেজন্য সাধারণ মানুষের গতি-কার্য প্রতিনিধি, তার সার্বিক বাণী-নৃতি। কেবল অসাধারণ ব্যক্তিত্বই এভাবে সর্ব-মানবের অন্তর-সত্যকে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করতে পারে।

মানবতার কবি-কণ্ঠ

নজরুল ইসলাম নেবে এসেছেন জীবনের ক্ষুদ্র কঠিন মাঠে, উঠে গিয়েছেন তার অধ্যাত্মের উর্ধ্ব-লোকে, প্রবেশ করেছেন তার রোমাণ্টিকতার নির্জন প্রদেশে। কিন্তু তাঁর এই সব যাত্রার, সব অবস্থানেরই সঙ্গী চিরন্তন মানুষ। নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতির তুরীর মার্গে আত্মরতি-সংগৃহীত তাঁর স্বভাবে ছিল না। জাই তাঁর হাতজানি তাঁকে চরিত্র-ঋণ করেনি। তার আক্রমণ থেকে তিনি ধারবার পালিয়ে এসেছেন। মানবতার বেলীতে সব অর্থা নিয়ে আপন চরিত্র-লগ্ন অতি মানবতাকে তিনি নিমূর্ণ করেছেন। নিরতি তাঁকে সর্বকালের মানবতার কবি-কণ্ঠ করে রাখতে চেরেছে বলেই হয়তো এমনটা ঘটছে।

বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর ভাষ্য যে সর্বকালের অন্যতম-শ্রেষ্ঠ এই মানবতাবাদী কবি তাদের মধ্যে জন্ম-লাভ করেছেন। অসামান্য প্রাটেক্সবর্বে নজরুল স্বদেশে নিজের মহিমাকে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করে-

ছিলেন বটে, তবে তাকে বিশ্বসর ছড়িয়ে দেবার আয়োজন বা সম্ভাবিতার নিজের করারত ছিল না। আর এখন পর্যন্ত বাংলাভাষা ও বাঙালীর নজর এই যে, তারাও তাদের এই অনন্য ঐশ্বর্যকে বিশ্ব-সত্যের পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত করতে পারেনি।

হিন্দু-মুসলমান

নজরুল নিজের অবদানে ঘন্য করেছেন তাঁর দেশকে, দেশের সবগু মানুষকে। তাঁর গুণ-বুদ্ধি ও শৈব-সিদ্ধ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়। বাঙালী হিসাবে তাদের যে ঐক্যবদ্ধ ও মিলিত সত্তা, নজরুল তার একমাত্র প্রতিনিধি। আবার উভয়ের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মানসেরও তিনিই একমাত্র দরদী রূপকার। ইসলামের ঐতিহ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধকে নতুন কালের প্রেক্ষাপটে স্ব-মহিমার উপস্থাপিত করে তিনি যেমন বাংলার মুসলিম সমাজকে আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীন-স্বাভাব্য অহঙ্কার থেকে গৌরবোজ্জ্বল নবজীবনের পথে তুলে দিয়েছেন, তেমনি আপন অলোক-সমান্য প্রতিভার অকুণপ স্পর্শ দিয়ে হিন্দু সমাজকেও তিনি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মাননী প্রেরণার উদার মানবতার পথে উদ্বোধিত করেছেন। তাঁর গাথনা ছিল—কুচুড়া ও ডেমনছির কবল থেকে উদ্ধার করে উভয় সম্প্রদায়কে একমেস-একপ্রাণে স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি-পথের আভিষেক করা। অথও মানবতার প্রেমিক ছিলেন বলে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তিনি উৎসাহবোধ করেন নি। তাই সাম্প্রদায়িক উপগ্রন্থের বড়ের লগ্নে প্রণী করেছেন—“হিন্দু না ওয়া মুসলিম—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন।” কিন্তু তাঁর ব্যাকুল প্রশ্ন সমুত্তর বুঝে পায়নি। বাংলাদেশের হিন্দু আর মুসলমান পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে ভালোবাসলেও তাদের রাজনৈতিক মানস একযোগে তাঁর মিলনের নদীকে উপেক্ষা করেছে। উপমহাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাঁর অদম্য মানবিক মিশনের জন্যে আপাত-ব্যর্থতার পথচা রচনা করেছে।

‘চির-কবি নজরুল’

কিন্তু ব্যর্থ হবার মত ক্ষতির পক্ষা নিয়ে নজরুল আসেননি। তিনি সেই হাতের এক অমর ব্যক্তিত্ব, সবকালীন মানুষের গ্রহণ-বর্জনে বীর মূল্য ও উপযোগ নিঃশেষ হয়ে যান না। “পারোবা করি না বাঁচি বা না-বাঁচি/মুগের দৃষ্টি কেটে গেলে”—তিনিই বলতে পারেন, বাঁচ হাতের মুঠিতে থাকে কালের বেয়াড়া গোড়ার খুঁটি। তারই জোরে তিনি ঘোষণা করেন—“আমি বুগে বুগে আছি, আঁসিয়াছি পুনঃ মহানিস্পন্দ-হেতু।” সেই ‘মহা-বিশ্রুপ’ কি অতিক্রান্ত হয়েছে? হবে কখনো? ‘বংশ উত্তীর্ণিতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিতবে না/অত্যাচারী বড়-কৃপাণ ভীষ বর্ণভূমে ধ্বনিতবে না’—সেদিনের আগে তো তাঁর চুটি নাই। সেদিন কি কখনো আসবে? কবে আসবে? মানুষের এই পৃথিবীতে সেদিনতো চিরায়ত, অথবা মহাপন্থের কাল পর্যন্ত প্রসারিত। কাজেই ব্যর্থতার মাল্য গম্বীর দিয়ে কে তাঁকে বিনাম তানাতে পারে। তিনি যে বলেছেন, তিনি ‘বর্তমানের কবি,’ যে বর্তমান তে অনন্ত! বিগত কাল, সমকাল ও অনাগত কালে প্রসারিত যে বর্তমান। সেই চির-বর্তমানকে তিনি ভাষা দিয়ে বুগ্ন করেছেন, জ্বর দিয়ে জ্বাঙ্গ করেছেন। যে অতীত অনিশ্চয় যশে বনকিত, তারই দাবীদারক নজরুল; যে বর্তমান চিরজ্ঞান সংগ্রাহে আশোমিত তারই তুর্বি-বানক নজরুল; যে ভবিষ্যত

চিরন্তন আশার উচ্চকিত তাইই নিক-নির্দেশক নকশন। নকশনের নিজের ছিদ সেই অকণ প্রত্যয়।
তাই যুগি যোগ-কিট চেতনার প্রদোষেও তাঁর কণ্ঠিত কবনে বেধারিত হয়েছিল--“চির-কবি নকশন”
—এই অকণী আশ্রয়মাণ।

‘বাঙালী বলতে একজন আছে’

শ্রীঅনুগাণ্ডন যার একটা ছড়া কেটে স্থান করে বলেছিলেন:

জুল হয়ে গেছে বিস্কুন—
আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে,
ভাগ হয়েছিলো নকশন।
এই জুলটুকু বেঁচে থাক,
বাঙালী বলতে একজন আছে—
দুর্গতি তার বুচে থাক্।

আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেলেও ‘নকশন’ যে কোন ভাগ হয়নি তার কারণ তিনি বলেন নি। কারণ
এই যে, ‘চির-কবি’ কবনো ভাগ হয় না। শ্রীয়ার বলেছেন, “বাঙালী বলতে একজন আছে।”
তাকে আমার বলতে ইচ্ছা করে—‘আছে’ নয়, বাঙালী বলতে ছিলই বাস্তব একজন; তিনি নকশন।
দেশ ভাগ হবার পরে নয় বা তাঁর অমন আন্তরিক ছড়া দেখার কালেই শুধু নয়; অতঃপূ, অতঃপূর্ণে দেশেও
নকশন ছাড়া যে-বাঙালী কবনো আর বিত্তীয়টি ছিল না। সেজন্যই ত্রে নকশন না চাইলেও তার
ভাগ হয়েছে, বাঙালীও ভাগ হয়েছে। বস্তুতঃ দেশ ভাগ হওয়া বেধে নয়, তার অনেক আগে,
দেশের বিচ্ছিন্ন স্থানের চূড়ান্ত রূপ দেখেই কবি শুদ্ধ, বুক হয়ে গিয়েছিলেন:

তোমাদের পানে চাহিয়া বহু, আর আমি ভাগিনা,
কোলাহল করি’ সারা দিনমান কাছো ধ্যান ভাঙিয়া না।

অবশ্যাত্মী আসন্ন পরিণতির রূপ দেখেই কি তাঁর নিজের বাণী নিজের কাছেই ‘কোলাহল’ মনে হয়েছিল ?
এবং তাই কি এই বরণ-পণ অস্তিত্ব ?

বাংলা সাহিত্যের আর এক মহান নিকপাল রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘কালান্তর’-এর প্রবন্ধে এই পরিণতির হুঁসিয়ারী
উচ্চারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু অশ্লিষ্ট বাঙালী, সত্যের রূপায়নে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নকশনের
মৈত্রী সাধনার যে পথ তা তাঁরও চরণ-স্পর্শ পায়নি। পায়নি মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁদের পূর্ব
বা উত্তরসূরী অন্য কোন মহাপ্রাণের। তাই সমাজতান পথে পথচারণা করে দিলু বাঙালী এবং মধুসূদন
বাঙালী তাদের নিজ নিজ পথচো পৌছেছে, তার মস্তকনের সাধনা নিয়ে নকশন ইসলাম হারিয়ে
গিয়েছেন এক অমর্ত্যে—যার নাম ‘ভাল্লভ বাঙালি’।

রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের বৈত-বন্ধন

কিন্তু নকশনের অস্তিত্বে শুধু আশ্রয় বাঙালিদের সাধনার অনুভব নয়। তাঁর সাধনা ত্রে মূলতঃ
মানবতায়ই সাধনা। নকশন ‘হিন্দু-মুসলমানের মতর মতাকে অস্বীকার করেননি, তাদের বিশিষ্ট

সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মানবিক বহিবার উপস্থাপিত করে তিনি তাদের আনানবিক কৈরী সম্পর্কেই শুধু অধীকার করতে চেয়েছেন। তবু তাঁর কি এমন কোথাও ভুল হয়েছিল, যেখানে স্ববীজনাগের ভুল হয়নি, ইকবালের ভুল হয়নি? সম্ভবতঃ তাই। অতঃপর জাতির ইতিহাস তাই প্রমাণিত করেছে। নজরুল তাঁর একক ব্যক্তিতে স্ববীজনাথ ও ইকবালের বৈত-স্বত্বপক্ষে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। সৌন্দর্য ছিল সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জাতি-চেতনার দিক থেকে ব্যক্তি-সত্তার এমন এক সংকট-সত্তা, যার উত্তরণের সীমানা বিচ্ছিন্ন ছিল বাঙালিকে ছাড়িয়ে সমস্ত ভারতীয় জাতি-সত্তার মধ্যে। তাই, যখন ভারত বিভক্ত হলো তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশও দু'ভাগ হয়ে তার অনুগামী হলো; আর নিবর্তিত দুই নতুন দেশের দুই পৃথক জাতিসত্তা ভাগ করে নিল স্ববীজনাথ ও ইকবালকে আপন আপন মুখপাত্র রূপে। দেখা গেল, 'সোনার বাংলা'র কবি হয়েও স্ববীজনাথ হলেন ভারতের এবং 'চিশুঙা হাবারা'র কবি হয়েও ইকবাল হলেন পাকিস্তানের। নজরুল কার, তার নীমাংসা এইলো মূলতুর্বা।

নতুন বাংলাদেশ ও নজরুল

কিন্তু মাত্র সিকি শতাব্দীর ব্যবধানে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আর একবার পরিবর্তন ঘটলো। উপমহাদেশের ভাঙাগড়ার মূলতুর্বা ইতিহাস আজ আবার নতুন এক ভৌগোলিক জাতি-স্বাধীন সৃষ্টি করেছে—যার নাম বাংলাদেশ। এ এক নতুন বাংলাদেশ, যা স্ববীজনাগের ভারতবর্ষ থেকে এবং ইকবালের পাকিস্তান থেকে এক নতুন অবস্থানে নিজেকে চিহ্নিত করেছে এবং এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ সত্তার বিবর্তনের ধারাই বলে দেয়, কাকে সে গ্রহণ করবে জাতীয় কবি রূপে। উপমহাদেশের ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির যে চতুর্দশনের পরি-ক্রমায় নব-অভ্যুদিত বাংলা দেশের উত্তরণ, তারই আদর্শিক প্রতিনিধি নজরুল। আমরা জানি নজরুল সবার—যেমন স্ববীজনাথ সবার, ইকবালও সবার। কিন্তু সবার স্ববীজনাথ যেমন ভারতের জাতীয় কবি, সবার ইকবাল যেমন পাকিস্তানের জাতীয় কবি, তেমনি সবার নজরুল আজ অনিব্যাহৃতাবে বাংলাদেশের জাতীয় কবি। কারণ আমরা এও জানিবে, আন্তঃমানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের বৈত-সত্তার সাগর-সঙ্গম বাংলাদেশ। নিয়তি-কর্তৃক সেই তুরিকাই তার জনা নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই নজরুলের মধ্যে স্ববীজনাথ ও ইকবালের বৈত-স্বত্বপক্ষে যে প্রতিনিধিত্বকে এককালে বিজ্ঞাতিকর মনে হতোছিল, তাই আজ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এক নতুন সত্যের বহিমা লাভ করেছে। বাংলাদেশ মুসলিম-গণ-প্রধান, তাতে কি হয়েছে? বাংলাদেশ যদি কোনদিন শতরুবা একশ' ভাগ মুসলিম গণ-ভূমিও হয়, তাতেই বা কি হবে? নজরুল যদি থাকেন আমাদের মুখপাত্র ও পঞ্চদর্শক, ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছেই অভেদ মানবিক সম্পর্কের পাঠ গ্রহণ করবে।

[ছবি]

১৯৪২ সালের দিকে প্রতিভার দীপ্ত সূর্য নজরুল-রাজস্বয়ং হয়ে পড়েন এবং বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ভোলপাড় অঞ্চল থেকে প্রায় লোকচক্ষুর অস্তরালে নীরবে বিদ্যার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিদেশী শাসনবৃত্তি এবং দেশবিভাগের আনুষ্ঠানিক ফলশ্রুতিরূপে বাংলাদেশও বিভক্ত হয়। বিভক্ত দেশের ভারতীয় অংশে কাল-ব্যাপ্তি-কবনিত কবি নিঃশব্দতন পড়ে রয়েছেন।

জন্মের পরিচালন এই যে, বিশেষী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিকণ্ঠ এই মহান কবি স্বদেশী শাসনের স্বাধীন প্রভাতে স্বাধীনতার আলো-স্বপন চাঁপেরার তলে কোথাও তাঁর নিজের আসনটি খুঁজে পেনেন না। তবু ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের চোখে পড়বার মত যে ব্যক্তিত্বী নিদর্শন তখন একমাত্র নজরুলের ক্ষেত্রেই চিহ্নিত হলো, তা হচ্ছে, তাঁর দীনতম রোগশয্যা এবং ন্যূনতম প্রাণাঙ্কানের আধিক্য স্বাক্ষার যবজ অথচ বৈরী বনোভাবাপন্ন দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম হেজ্জাবুলক সহযোগিতা।

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা

সে যাই হোক, সব চেয়ে বড় ধুংসের বিষয় এই যে, কবির বৃত্তান্তর জৈব অস্তিত্বের ন্যূনতম প্রয়োজন যেটানোর ব্যবস্থা যেখানে যাই-বা হলো, তাঁর সচেতন সৃষ্টিশীল জীবনের বনামিকা পাঠের দুই ধূন পরেও উপহাসাদেশের কোথাও, এমন কি বিভক্ত বাংলাদেশের কে-মংশে তিনি পড়ে রইলেন যেখানেও তাঁর মহনীয় তাৎপ্যুতি এবং উজ্জ্বল অবদানের লালনের কোন উন্মেষযোগ্য উদ্যোগ দেখা গেল না। অবশেষে ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা চাকার কবির গুণবৃদ্ধ, উক্ত ও সহচরদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলো নজরুল একাডেমী। স্বাধীনতার বিপ্লবাত্মক-প্রতীক মহৎ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা ছিল এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগদানের মনে। কিন্তু প্রধানতঃ প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার অভাবে আরো সে পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত নজরুল একাডেমী ন্যূনতম কর্মসূচী নিয়ে তার অস্তিত্ব স্বাক্ষর করে এসেছে যাত্রা।

ভূমিকা ও অবদান

তবু আনন্দ মনে করি, চাকার নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার ঘটনা একদিন ইতিহাসে তার যথানুলা পাবেই। ইতিমধ্যেই তার যে কলশ্রুতি, তাও কি দৃষ্টি এড়াবার মত? নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা তার উদ্যোগ-আয়োজন এবং প্রায়শ্চিত্ত কার্যক্রমেই তার অস্তিত্বের বৃদ্ধি অনেকখানি প্রমাণিত করেছে। এদেশে, এবং ভারতেও, বিদ্যারণ-ও-যবহেলার-কবলে-পড়ে-থাকা কবির প্রতি সরকার ও সুবীক্ষণের বনোযোগ বৃদ্ধি, তাঁর ভূমিকা ও অবদানের চর্চা ও বুলায়নে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি এবং তাঁর স্মৃতিকে আগুরুক রাখার উদ্দেশ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও প্রধান জনপদ তাঁর সন্মানিতকরণ—এর প্রায় সবই ১৯৬৪ সালে চাকার নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার অনুগামী ঘটনা। তাই বলা যেতে পারে, নজরুল একাডেমীই উপহাসাদেশের বনোভাগে নবপর্বীরে নজরুল আলোচনের দ্যোতক।

কবির বাংলাদেশে আগমন

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার কবিকে চাকার নিয়ে আসেন। সম্ভবতঃ সেটাই ছিল সে-সরকারের সর্বাপেক্ষা জনচিত্তরঞ্জক কাজ। ঢাকা বিধান বঙ্গের কবির বিমানের অবতরণ-কাল সম্পূর্ণ গোপন রাখা সত্ত্বেও সেদিন সেখানে দর্শনার্থী জনস্রাব যে বিপুল সমাবেশ হয়েছিল তা কে-কোন দেশের কে-কোন কবির জন্য প্রাচীর বিবর। সরকার কবিকে ধানমন্ডীর একটি অগ্নিজিত গৃহে সম্মানিত স্বাধীন অস্তিত্ব হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করেন। অবিদ্যায় জনপ্রোতের প্রবাহ বইতে

থাকে সেই কবি-তীর্থ অভিযুগে। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ যেন বছর পরে কবির পেরেছে তার প্রবলী প্রিয়তমকে নিজের বুকে—সবলত স্বাধীনতার প্রথম উপহার রূপে।

হারী হাসপাতাল শয্যা

কিন্তু পরিভ্রমের বিষয় সেই সরকারের আমলেই কোন কোন মহলের প্রবল পরামর্শে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নাম করে কবিকে ধানমন্ডীর বাড়ী খালি করে হারীভাবে হাসপাতাল-শয্যা বরাদ্দ করা হয়। সে ব্যবস্থা অনেকেরই মনঃপুত হয়নি। নজরুল একাডেমীর তরফে আমরাও তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। হাসপাতালে লভ্য চিকিৎসার বিশেষ সুবিধাদি কবি-ভবনেই আয়োজন করা যেতো, অথচ কবি-ভবনের যুক্ত ও অন্তরঙ্গ পরিবেশের আবহ হাসপাতালে লভ্য নয় এবং সেটা তাঁর বিশেষ বর্বাদীর্ঘ ও পোষক নয়,—এই ছিল আমাদের যুক্তি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা যেন নিতে পারেননি। ফলে হাসপাতালের বহুদূরে অপরিচিত ও স্বজনহীন পরিবেশে স্বভাবতই কবির স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে আর সেটাই নির্দিষ্ট করে দেয় তাঁর জন্য অনুভূত হাসপাতাল-বাসের নিরতি।

উমা কাজী

ইতিপূর্বে পারিবারিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে কবির বহুদিনের নির্দিষ্ট সেবিকা ও পুত্রবধূ উমা কাজী স্বাধীন সংগ্রহ ত্যাগ করে ঢাকার অন্য বিবাহ করেন। কবির ছোটপুত্র সব্যাচাঁর সঙ্গে বিবাহের আগে থেকেই তিনি বৌদ কবির সেবিকারূপে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সব্যাচাঁ অথবা কবি পরিবারের অন্য কেউই ঢাকার কবির কাছে থাকেন না—এই যুক্তিতে নতুন পরিস্থিতিতে উমা কর্তৃপক্ষের কাছে কবির সেবার অধিকার অব্যাহত রাখার আকুল আবেদন জানান। উমা কাজীর বৈবাহিক সম্পর্কের এই বিপর্যয়কে আমরা সমর্থন করিনি; কিন্তু যেহেতু জানতাম যে দুনিয়াতে এই একটি মানুষ্ট আছে একমাত্র যার কাছে রুগ্ন ও বোধশূন্য কবি, বধূ-মাতা-কন্যার অক্লান্ত ও আন্তরিক সেবায় পেতে পারেন, সেজন্য কবির প্রতি ভালোবাসার নির্দেশেই আমরা সুপারিশ করেছিলাম উমার আবেদনের পক্ষে। কিন্তু কবি-গৃহ ওদুবধানের কর্তৃপক্ষের জ্ঞান ছিল ততদিনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যার সন্মুখীন সব পক্ষই হয়েছিল বহু, এবং পরিণতি হয়েছিল উমার চূড়ান্ত বিদায়, কবির দাবজজীবন হাসপাতাল বাস এবং বৌদ কবি-ভবনেরই অবলুপ্তি। কে না জানতো—১০।১৫ বছর রোগশয্যাগ্রস্ত কবি শীগগির একদিন বিদায় নেবেন; আমরা তাঁকে ধরে রাখতে পারব না—স্বয়ংও না, হাসপাতালেও না। কিন্তু সেই তিনি গেলেন, তবে গেলেন হাসপাতালে দু'বছর বন্দীশা ভোগ করে। তাঁকে বরাদ্দ করা বাড়ীটি হাত বুলে কোথা হতে কোথায় গেল; আর আমরা কবিকে হারাবার সাথে সাথে হারানাম জাতির ঐতিহ্যের সজ্জা এক মহামূল্য সম্পদ 'কবি-ভবন'।

একাডেমীর উন্নয়ন

পাশ্চাত্য আমল থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত সরকার পরাম্পরায় অনেক পদমর্য ব্যক্তিই এতকাল ধরে নজরুল একাডেমীর উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের কক-বেণী আশায় বাণী উনিয়েছেন। আশায় বুক বেঁধে সব সরকারের কাছেই আমরা এ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের দৌলিকতা এবং এর বখাযোগ্য

উন্নয়নের পরিকল্পনা পেশা করে এসেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। একাডেমীর অবস্থারও কোন ইভার বিশেষ হয়নি। হজাশ হারে ডেবেছি, এর কারণ কি? নজরুল যে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কতখানি এবং তাঁর অবদান ও ভাষা-সৃষ্টির চর্চা, মানন ও সংরক্ষণের প্রয়াস আমাদের জাতীয় জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ, সত্তবত্ত সে কথা পরাবিকারী ব্যক্তিদের আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরবর্ত্তেই মনে হয়েছে, তাঁদের স্মরণোত্তর দায় কি শুধুই আমাদের? এর শুদ্ধর তাঁরা নিজে কেন বুঝবেন না? নজরুল একটি জাতীয় বিষয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, মানবিক বিষয়। নজরুল আমাদের পূর্ব, আমাদের পরিচয়। তাঁরা কি সে কথা জানেন না? তাঁরা কি বলতে পারেন—বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে আর কোন্ ব্যক্তিকে আমরা অধিকতর জীবন্ত প্রেরণারূপে পাব? আর কাকে আমরা বিন্দু-সত্যার আমাদের গৌরবের বহুস্তর নিদর্শনরূপে তুলে ধরতে পারব? মনে হয় তাঁরা এসব সামান্য জিনিষ ভাবেন না; কারণ পদম্ব হয়ে তাঁদের মাথার ভাবনার অন্যান্য সব অসামান্য বিষয় থাকে।

সরকারী সাড়া

বর্ত্তমান সরকারের আমলে নজরুল একাডেমী কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং তাঁকে জাতীয় কবি হিসাবে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিল। সরকার সে ভাষে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছেন। নজরুল ইসলাম আগে থেকেই জাতীয় কবির মহিমার বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের আসনে অঙ্গীন হয়েছিলেন। সত্তবত্ত: তাই কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা না বেবেই সরকারের তরফ থেকেও তাঁকে সর্বতোভাবে জাতীয় কবির উপযুক্ত বর্ধাণা ও স্মরণ-স্মৃতি দেওয়া হয়েছে, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

একাডেমীকে গৃহ বরাদ্দ

স্বাধীনতার পরে বহু বাড়ী-ঘর পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে বোধিত হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তা এতদর বরাদ্দ করা হতে থাকে। তদানীন্তন সরকারের কাছে নজরুল একাডেমীর জন্য আমরা একটি উপযুক্ত বাড়ী বরাদ্দের আবেদন আনিরেছিলাম। কর্তৃস্থানীয় কেউ কেউ তা মহানুজ্জ্বল সক্ষে বিবেচনার আশ্বাসও দেন। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে বীদেব উপরে সে আশ্বাস কার্যকরী করার ডায়, তাঁদের সহযোগিতা লাভে আমরা ব্যর্থ হই। অবশেষে বর্ত্তমান সরকারের কাছে থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা একাডেমীর জন্য মগবাজার বেলারাবাদ কলোনীর বর্ত্তমান বাড়ীটির বরাদ্দ লাভ করি।

এ প্রসঙ্গে প্রধান সাময়িক আইন পরিচালকের প্রিন্সিপাল টাক অফিসার শ্রিগ্রেডিয়াস মুন্সল ইসলামের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা আনি কর্তব্য মনে করি। প্রধানতঃ ঐদই কল্যাণে, করেক বছরে বা সত্তব হয়নি, করেকদিনের মধ্যে তাই সত্তব হলো। ঐর সহযোগিতায় নজরুল একাডেমী তার সত্তট-সুহৃদে শুধু বে বাড়ী বরাদ্দ এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কিছু অনুদান পেয়েছে তাই নয়, কবির সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব সমূহ এবং নজরুল একাডেমী সংক্রান্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনাও ঐদই মাধ্যমে আমরা উদ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে সক্ষম হই।

নতুন আশাবাদ

কিছুদিন আগে বঙ্গভবনের এক কনুটানে বহানানা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার কণিক আলাপের স্মরণ হয়েছিল। আমার তো প্রসঙ্গ একটিই : নজরুল একাডেমী। দু'এক কথা হতেই তিনি বললেন, “আমি জানি। এ-প্রতীকটিকে উন্নত করতে হবে।” শুনেছি প্রেসিডেন্ট জিয়া এক কথার মানুষ। তাঁর এই সন্ধিগত কথাটা আমাকে নতুন আশার তড়িৎ-স্পর্শ দিয়েছিল। কারণ, ইতিমধ্যেই আমাদের আশাবাদে আমার কিছু অবশতার ছোঁয়া লেগেছিল। এখানে সে-বিষয়েও কিছু আলোকপাত করতে চাই।

জাতীয় নজরুল স্মৃতি কমিটি

কবির মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য সরকারী উদ্যোগে ‘জাতীয় নজরুল স্মৃতি কমিটি’ গঠন করা হয়েছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল কবীর ছিলেন সে কমিটির সভাপতি। সরকারী-বেসরকারী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক হিগাবে আমাকেও সে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটির প্রথম বৈঠকে এর কর্মসূচী নিয়ে যে আলোচনা হয়, তাতে ছিল কবির রাজারে উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা। এ উদ্দেশ্যে সেই সভাতেই প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ ও স্মৃতি-সৌধের নক্সা প্রণয়ন বিষয়কে দু'টি সাবকমিটি করে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে ‘দুর্ভাগ্য’ কমিটির দ্বিতীয় সভায় একটি নতুন বিষয় কমিটির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হলো : কবির সাহিত্য ও সঙ্গীতের উপরে গবেষণা, সংকলন প্রকাশনা, ইত্যাকার সব কাজ—যা নজরুল একাডেমীর বিধোষিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত—এই কমিটিই করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

নতুন বিভ্রমণ।

একাডেমীর আরজ এবং উদ্দিষ্ট এসব কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়নে সরকারী সহায়তা বিষয়ে ইতিপূর্বে আমি একাধিকবার মাননীয় উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি; তা ছাড়া প্রথম সভাতেই আমি একাডেমীর কর্মসূচী, সম্পদ ও আরজ কাজ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র সভাপতিজিহ্ন সফল সমসার কাছে পেশও করেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় সভার উপস্থিতি হয়ে তার এই কল্যাণল দেখে আশ্চর্য হলাম। আমাকে সামনে রেখেই নজরুল একাডেমীকে এভাবে উপেক্ষা করা হলো, এমন কি, কেউ তার নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না দেখে আহতও হলাম। এই নতুন কর্মসূচীর জন্য যে পৃথক সাব কমিটি গঠন করা হলো তাতে অবশ্য অনুগ্রহপূর্বক আমার নামটো রাখা হলো। দু' একজন সদস্যই এ বিষয়ে উদ্যোগভার তুলিকা নিলেন, এবং অন্যদের কোন ব্যস্ততা ছিল না বলে অন্যায়সে সব কিছু পাশ হয়ে গেল। একাডেমীর বিষয়ে আমাদের এতদিনের সকল আবেদন-নিবেদনই অস্বপ্নো-রোদনে পর্যবসিত হয়েছে এবং তার দুঃখ ও হতাশা আমাদের হৃদয় করতে হয়েছে। কাজেই আজকের সভায় এ-কট্টা প্রতিযোগী প্রস্তাব পাশ হলেই যে তার কলে নজরুল একাডেমী বাঁচে মারা যাবে—এমন কোন নতুন আশা অবশ্য আমাকে অক্রমণ করলো না। তবে লোকে যে বলে—বাহানীর বাতাইক এই, কাজের কাজ কেউ কিছু করবে না, তবে সত্যি সত্যি কেউ কিছু করতে গেলে তাকে ভুল করার লোকের অভাব হবে না,—সে বিষয়ে আর এ-কটা নতুন অভিজ্ঞতার সাফল্য পাওয়া গেল।

স্মৃতি-কমিটির সিদ্ধান্ত

যদি হোক, আগের প্রণেতা কিংবা। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে ক্রিয়াকর্মেরই সিদ্ধান্ত-সংকল্পের উপদেশ। পক্ষে অধ্যাপক বাবুল কল্লের স্বাক্ষরিত হলেন অধ্যাপক গৈরদ আলী আহমাদ। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম সভাতেই আবার একটি নতুন ঘটনা ঘটলো। স্মৃতিগৌরব নির্মাণের কাজই কমিটির মূল লক্ষ্য, অথচ সেমিকে কোনও অগ্রগতি হয়নি যেহেতু তাঁর উপস্থিতি তিনি গুরুত্ব দিলেন। তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধায় ছিল—স্মৃতি কমিটি কি নজরুল বিষয়ে চর্চা ও গবেষণার জন্য নতুন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চান? সেজন্য ত্রো বাংলা একাডেমী, নজরুল একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।—যেখান থেকে কোন জবাব এলো না। নতুন করে সিদ্ধান্ত হলো : কমিটি স্মৃতিগৌরব নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে যত্নোযোগী হবে; বাংলা একাডেমী, নজরুল একাডেমী এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের বাংলা বিভাগ কবির সাহিত্য-কর্মের উপর গবেষণা চালিয়ে যাবে; এবং নজরুল একাডেমী কবির শ্রীলঙ্কা অনুষ্ঠিত প্রকাশের ব্যবস্থা নেবে। সরকার এসব কাজে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা দেবেন।

নতুন উপদেষ্টার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উৎসাহিত হয়ে, পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি একাডেমীর আভি সুরমাণি এবং উনুয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আনুপূর্বিক আলোচনা-আলোচনা করেছি। নজরুলের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ও কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ সম্পদ প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেই নজরুল একাডেমীর ব্যক্তি উনুয়ন স্থাপন করা যায় কিনা, সেমিকে, আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি এবং সে-প্রশ্নে তাঁকে সহানুভূতিশীলই দেখতে পেরেছি।

শেষ নিবেদন

একটি সমন্বিত, পূর্ণাঙ্গ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়েই সরকারী উদ্যোগে আমরা নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। বাংলাদেশে নজরুলের জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ এবং মৃত্যুর পর তাঁর বহুদেহের প্রতি সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান প্রদর্শনের ঘটনাবলী এখন সত্যতত্ত্বাধীন নজরুল একাডেমীর পরিপূর্ণ জাতীয় স্বীকৃতি ও পূর্ত্যপাশকতা লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারী প্রয়াস আর এ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরী অভিভাবক বা প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়িতা দিতে পারেনা। তাঁর পরিচয় এখন জনগণের সরকারকেই নিতে হবে। আমরা শুধু এটো আশা করবো, সরকারী ছত্র-ছায়ায় নজরুল একাডেমীকে তাঁর স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মর্যাদার একটি সমন্বিত ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই অধ্যাবাস্য উনুয়নের আওতায় আনা হবে; কোন বহুসংখ্যক বা অবিবেচনামূলক পরিবর্তন এর বিচিত্র ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে বিভক্ত করে অন্যান্য সরকারী সংস্থার অধীভূত করা হবেনা। কেননা, ত্রোতে এই মহান জাতীয় কবির অমর্যাদা হবে। এ শুধু আনন্দময় অভিরুচ নয়, আমরা নিশ্চিত যে কবি-ভক্ত সমগ্র দেশবাসীও তাই চায়। কেননা নজরুলের মতো কবির প্রকৃত স্মৃতি-কেন্দ্র তাঁর কবর নয়, সে হচ্ছে তাঁর অমর ভূমিকা ও অবদানের চর্চা, সমগ্রচার ও সংরক্ষণের উনুয়নীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান—জানকি ও জীবন্ত 'নজরুল একাডেমী'।

নজরুল একাডেমী

উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

জাতীয় ভিত্তিতে নজরুল-কেন্দ্রিক একটি সমন্বিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী নিয়ে ১৯৬৪ সালের মে মাসে নজরুল একাডেমী সংগঠনী পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান একটি সমিতি হিসাবে বিধিবদ্ধ করা হয়। একাডেমীর সংবিধানে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নিশ্চিত করা হয়:

- ১। নজরুলের সমগ্র রচনা ও জীবনের উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন, গবেষণা ও প্রকাশনা।
- ২। নজরুল গীতির বাণী ও সুর সংগ্রহ, সংকলন, স্বর-লেখন ও প্রকাশনা।
- ৩। নজরুল গীতির চর্চা, প্রশিক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং নজরুল-গীতির নতুন রেকর্ডিং।
- ৪। সাহিত্য ও সংগীতে নজরুলের অমর সৃষ্টিসম্ভার অনুবাদ, সাংস্কৃতিক বোধ্যাযোগ ও অন্যান্য মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে তুলে ধরা।
- ৫। নজরুল সৃষ্টিসম্ভারের মূল্যায়ন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, চিন্তাধারা ও সৃষ্টিশীলতার নিরবিরত প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে একাডেমীর মূলপত্র প্রকাশ।
- ৬। বিশেষভাবে নজরুলের অবদান ভিত্তিক এবং সাধারণভাবে দেশের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যনির্ভর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রগতিশীল বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা।
- ৭। একাডেমীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সমাজিক গ্রহণ প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং এতদ্বারা পূর্ণাঙ্গ মুদ্রণ ও প্রকাশনাগার প্রতিষ্ঠা।
- ৮। অধ্যয়ন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সুবিধাবিধানের জন্য লাইব্রেরী, পাঠাগার, বিদ্যালয়, মিলনায়তন নাট্যক, প্রেক্ষাগৃহ, টিভি ও ইত্যাদিসহ সমন্বিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, 'নজরুল ভবন' নির্মাণ।
- ৯। একাডেমীর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সহায়ক অন্য যে কোন প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ।

সম্পদ ও আয়তন তালিকা

সংগ্রহ, সংকলন ও গবেষণা

* ১০০০ অপ্রচলিত ও মুদ্রাশীর্ণ গ্রন্থ, ৪০০ গ্রন্থের আদি রেকর্ড এবং কবির স্বাক্ষর-লিখিত কিছু সংখ্যক রচনার পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে।

* বিভিন্ন সূত্র ও পত্র-পত্রিকা থেকে কবির জীবনী ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণামূলক বহুসংখ্যক প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, আলোকচিত্র ও তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

* প্রায় ২০০০ গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং প্রায় ৮০০ গ্রন্থের স্বরলিপির বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রণীত হয়েছে।

স্বরলিপি প্রণয়ন ও সংগ্রহ

* প্রায় ৪০০ গ্রন্থের স্বরলিপি প্রস্তুত হয়েছে এবং আরো ৪০০ গ্রন্থের স্বরলিপি সংগৃহীত হয়েছে।

প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা

* নজরুল একাডেমী পত্রিকা (বিশ্বাসিক) : এ পর্যন্ত ১৪টি বিশৃঙ্খলার সংখ্যা প্রকাশিত।

* নজরুল গীতি : ৫ খণ্ড। প্রতিখণ্ডে মপ্রকাশিত অথবা মসংকলিত ১০০০টি করে গান ছাপা হয়েছে।

* নবদ্বারার নজরুল ইমান : শাহাবুদ্দীন আচরন প্রণীত নজরুল-কাব্যের নন্দনৈলী বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তক।

* নজরুল কাব্যে নিম্পরূপ : মোহাম্মদ হাফিজউল্লাহ প্রণীত নজরুল-কাব্যের বিশ্লেষণাত্মক সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থ।

* নজরুল ইমান/কবি ও কবিতা : আবদুল বাসান সৈয়দ প্রণীত নজরুল কাব্যের মূল্যায়ন মূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ।

* নজরুল জরতী (পুস্তিকা) ৫টি।

* বিজয়ী বাংলাভাষা : একুশে ফেব্রুয়ারী (পুস্তিকা)

* স্বতন্ত্রিণি ভোরে : বিজয় দিবস (পুস্তিকা)

প্রকাশের অপেক্ষায় প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি

* নজরুল স্মৃতিকথা : (সংকলন) নজরুলের জীবন ও সাহিত্যিক কর্ম সম্পর্কে নজরুলের মাতৃ ও সমসাময়িক লেখকের স্মৃতি-চারণ।

* নজরুল দর্পণে নজরুল : শাহাবুদ্দীন আচরন প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক। নজরুলের জীবন ও কার্যের মূল্যে নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা।

- * নভঙ্গল-সাহিত্যের নির্বীক (প্রবন্ধ সংকলন) : প্রবাস্ত নেবকলের নভঙ্গল-সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনার সংকলন।
- * নভঙ্গল-কাব্যের ছন্দ : আবদুল কাদির প্রণীত। নভঙ্গল-কাব্যের ছন্দ-সম্পর্কিত গবেষণামূলক গ্রন্থ।
- * নভঙ্গল গীতি : ৫ খণ্ড। প্রতিখণ্ডে অপ্রকাশিত ও অসংকলিত ১০০টি করে গান।
- * নভঙ্গল সুরসিপি : ১০ খণ্ড। প্রতিখণ্ডে ৩০টি করে সুরসিপি।
- * নভঙ্গলের টেলনামী গান : সংকলন।

আও প্রকাশনা প্রকল্প :

- * নভঙ্গলগীতি সন্ধান : কবির সৃষ্টি গীত-রচনা সংগ্রহ। প্রথম দুই খণ্ডে ২০০০ গান থাকবে।
- * নভঙ্গল-জীবনী : ২ খণ্ডে বিধদভাবে লিখিত কবির প্রামাণ্য জীবনী।
- * নভঙ্গল-গীতি সনাতন : নভঙ্গল-গীতির বাণী ও সুরের ঐশ্বর্য সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন।
- * নভঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিতা : নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন।
- * The Rebel Poet of Bengal : ইংরেজী ও আরবী ভাষার নভঙ্গলের কবি-পরিচিতি ও নির্বাচিত রচনার অনুবাদ।

প্রশাংগার

নভঙ্গল একাডেমীর প্রশাংগার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়েছে। নভঙ্গলের এবং নভঙ্গল-বিষয়ক ভাব্য গ্রন্থাদিসহ কয়েক হাজার বই-পত্র সংগৃহীত হয়েছে।

সুর সত্যায়ন পরিষদ

নভঙ্গল গীতির সুর-বিকৃতি রোধ এবং গানের প্রামাণ্য স্বরসিপি প্রস্তুত ও প্রকাশের কাজকে সুগম করার জন্য নভঙ্গল-গীতির 'সুর-সত্যায়ন পরিষদ' গঠন করা হয়েছিল। এ পরিষদের সদস্য-দ্রুত চলেছিলেন—করললমণ গুপ্ত, নারনা আব্দুল বাসু, ফিরোজ বেগম, মোহরার হোসেন, বেদারউদ্দীন আচরন, শেখ লুৎফর রহমান, শুধীন লাস, হকিমুল ইসলাম, ফেরদৌসী রহমান, মোতাকা ভাষান বাস্বাসী, এ. এইচ. সাদেকুর রহমান, আব্দুল সাত্তার হক প্রমুখ। বিভিন্ন কারণে পরিষদের কাজ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক নভঙ্গল একাডেমীকে নভঙ্গল-গীতির স্বরসিপি প্রকাশের লক্ষ্যে অর্পণের প্রেক্ষিতে বর্তমানে সে পরিষদ পুনর্গঠন করে পুনোদ্যমে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সম্মানিত জীবন সদস্য

কবি মোহাম্মদ হক, ইব্রাহীম খাঁ, মোহাম্মদ মাসিরউদ্দীন, আব্বাসউদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কালাম শাবুতউদ্দীন, আবুল নসর আহমদ, শুকী জুলফিকার হারিস, খান মোহাম্মদ কলিউদ্দীন,

আবদুল কালাম, জলীলউদ্দীন, বেগমীর আহমদ, আবুল ককল, হুসিমা কামাল, জরদুল আমেদীন, মোহাম্মদ মোলায়েম, হুজিবুর রহমান খাঁ, জালির হোসেন, এ, কে, এম, মুকুল ইসলাম প্রমুখকে মজলল একাডেমীর সম্মানিত জীবন সদস্য পদ প্রদান করা হয়েছে।

মজলল একাডেমী স্বর্ণপদক

মজলল বিষয়ে গবেষণার আবদুল কালামকে, মজলল জীবনী ঘটনার খান মোহাম্মদ হইনুজ্জামকে এবং মজলল গীতিচর্চায় মোহাম্মদ হোসেনকে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিসূচক মজলল একাডেমী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে।

গ্রামোন্মোচন রেকর্ডিং

একাডেমীর উদ্যোগে বাংলাদেশের শিল্পীদের দ্বারা মজলল গীতির মজল গ্রামোন্মোচন রেকর্ড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পের লুৎফর রহমানের পরিচালনায় প্রথমে একাডেমীর শিল্পীদের দ্বারা 'চল চল চল', 'দুর্গম গিরি কাছাকাছ', 'কাবাল এনৌচ কপালি' ও 'শিকল পরা ছল'—এট চারটি কোবাল গান রেকর্ড করা হয়। বুল্লিবুচ্চ চলাকালে রেকর্ডগুলো শাখীম বাংলা যেতালি শুকু ধাবছত হয়।

মজলল-গীতির প্রলিঞ্চণ

মজলল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই একাডেমীর সচীত বিদ্যালয়ে বিশেষ অনুয়ের সজে মজলল গীতি ও উচ্চাচ সচীত বিশেষ প্রলিঞ্চণের কাচ চলতে। উতিবধো মজলল একাডেমী থেকে ললিঞ্চণ প্রাপ্ত অনেক লিলাখী লিচিষ্ট লিলাখী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

একাডেমীর সচীতানুষ্ঠান ও আলোচনাচলাসমূহ সচী মজলল বিশেষ লুঞ্চণা পুচ্চ করেছে। স্বভাবতঃই মজলল বিষয়ক উপলক্ষগুলো মজলল একাডেমী বিশেষ শুকুর দ্বারা উল্লাপন করে থাকে। করেকবার এলা উপলক্ষে একাডেমী ও লিলা থেকে সপুচ বাগলী অনুষ্ঠানবালার আয়োজল করেছে। লিচিগু অনুষ্ঠানে অনেক লিলাখী অতিথি এবং অতিথিলিলাখী অংশ গ্রহণ করেছে। এঁদের বরো করেক আচরণ করেক, লাজাকত খালী-সালারত খালী, কনরেত মুজকুর আহমদ, প্রমোদকুর লানাল, আকুর খাল চেবী, লীপালী লাল, লিচ্ছকুর লুঞ্চণাখাল, লজলল লুঞ্চণাখাল প্রমুখের লাল উল্লাখলো।

নজরুল একাডেমী পাঁচসালার উন্নয়ন প্রতিবেদন

লক্ষ্য

প্রধানতঃ জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের অবদানস্বাক্ষরিত এবং তাঁর ভাবনুভূতির স্যাপক চর্চা, উপস্থাপন, অনুবাদ, সংকলন, প্রকাশনা এবং সংরক্ষণের জন্য, এবং দাবানলভাব জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে, জাতীয় সংস্কৃতি পল্লীসংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবে, একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থায় উন্নয়নের রূপ-রেখা নিয়ে, নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমান অবস্থা

জাতীয় কবির স্মরণে তাঁর পৌরুষ উপযুক্ত অর্থ সাহায্য এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ার ফলে নজরুল একাডেমী এ মাসে নিম্নোক্ত কর্মসূচী এবং লক্ষ্যপথে জটিলতা সাক্ষ্য নিয়ে কোনমতে অস্তিত্ব রাখা কঠোর হয়েছে।

আশাবাদ

বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কবির স্মরণে তাঁর পৌরুষ উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ার ফলে নজরুল একাডেমী এ মাসে নিম্নোক্ত কর্মসূচী এবং লক্ষ্যপথে জটিলতা সাক্ষ্য নিয়ে কোনমতে অস্তিত্ব রাখা কঠোর হয়েছে।

প্রয়োজনীয় সরকারী সহযোগিতা

নজরুল একাডেমীকে তাঁর পূর্ণ অর্থায়নে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের তরফ থেকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অবলম্বনের জন্য অনুরোধ ও প্রস্তাবনা করা যাচ্ছে:

১। জাতীয় কবির স্মরণে তাঁর পৌরুষ উপযুক্ত অর্থ সাহায্য একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হতে হলে নজরুল একাডেমীর জন্য উপযুক্ত গৃহ-সংস্থান প্রয়োজন। এছাড়া একাডেমীকে বিনামূল্যে, প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরি, বক্তৃতাঘর, স্টুডিও, প্রকাশনা, সংরক্ষণাগার, অফিস-কক্ষ, বিজ্ঞানাগার, মুদ্রণাগার, প্রদর্শনী

কক, বিকর কেন্দ্র ইত্যাদির স্থান সমুদায়ের জন্য অর্ধস্থিত 'নজরুল ভবন' নির্মাণের উপযোগী প্রণয়ন করি বরাদ্দ করা সরকারি।

সম্পত্তি বর্ণনাভারবিত্ত বেলালাবাগ কলোনীর একটি ঘণ্ড নজরুল একাডেমীকে বরাদ্দ করা হয়েছে। বেলালাবাগ কলোনী একটি পরিচালিত সম্পত্তি। এতে প্রায় এক একর কবির উপরে কয়েকটি পুরনো দানান রয়েছে। এই পুরা সম্পত্তিটি নজরুল একাডেমীকে দানী নগো-বস্তের ভিত্তিতে নীচ মেডা যেতে পারে। শহরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণ সড়ক পরিবেশের সুবিধাযুক্ত এলাকায় অবস্থিত বলে, এবং পার্শ্ববর্তী আরও কিছু ভূমিতে এর সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে বলে, এই স্থানটি 'নজরুল ভবন' নির্মাণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে।

২। একটি পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে একাডেমীর অফিস ও সাধারণ কার্যকর পরিচালনার বায় বার্ষিক বছরে ১০,০০,০০০'০০ (দশ লক্ষ) টাকা পৌনঃপুণিমা খাতি এবং এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানের জন্য মোট ৩,০০,০০,০০০'০০ (তিন কোটি) টাকার উন্নয়ন উদ্বিল বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৩। নিম্নলিখিত লক্ষ্য অধীনে প্রণয়ন করা সরকারি নজরুল একাডেমীকে প্রয়োজনীয় প্রণায়নিক ও আইনগত সহযোগিতা প্রদান করবেন :

- (ক) বাংলাদেশের আওতাধীন নজরুলের সকল সেবা ও স্বচনান স্বত সম্পূর্ণভাবে নজরুল একাডেমীর কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে থাকবে। সেজন্য নজরুলের সর্বপ্রকার স্বচনান প্রকাশনা, উপলভ্য উৎপাদন, পরিবেশন, উপস্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে যেকোন স্বকর্ম অর্থকরী ব্যবসায় নজরুল একাডেমীর পূর্ব অনুমোদন এবং আর্থিক চুক্তি-সাপেক্ষ হবে।
- (খ) বাংলাদেশে নজরুল-গীতির স্বত্বলিপি প্রস্তুত, সংকলন, সুর সংগঠন ও প্রকাশন ব্যবস্থাদি সর্বপ্রত্যয়ে নজরুল একাডেমীর কর্তৃত্ব ও অধিকারভুক্ত হবে।
- (গ) প্রানোক্তোক্ত, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতির সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা—যারা বাংলাদেশে যেকোন ভাবে নজরুল গীতির প্রকাশনা, পরিবেশন, উপলভ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক পুনঃপ্রকাশন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত, তারা সকলেই নজরুল-গীতির স্বত্ব ও সুরের ব্যাপারে নজরুল একাডেমীর কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকবে।

সম্ভাব্য

আশা করা যাচ্ছে যে, সরকারের উপরোক্তোক্ত সাহায্য ও প্রত্যাশিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যজনক বাস্তবায়ন সম্ভব হলে পাঁচ বছর পরে নজরুল একাডেমী নিজের আয়ে নিজের চলার মধ্যে আর্থিক স্বরত্ত্বয়তা লাভ করবে।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

[সংক্ষিপ্ত রূপরেখা]

(ক) প্রকাশনা

		আনুমানিক ব্যয়
১। নব বঙ্গ সম্পূর্ণ নবজন্ম রচনাবলী ..	ট.	১০,০০,০০০'০০
২। পাঁচ বঙ্গ সম্পূর্ণ নবজন্ম প্রাচীনত্ব ..	ট.	৫,০০,০০০'০০
৩। বিন বঙ্গ সম্পূর্ণ নবজন্ম-সুরমি ..	ট.	১০,০০,০০০'০০
৪। দুইবঙ্গ পূর্ণাঙ্গ ও প্রাচীনা নবজন্ম কীর্তী ..	ট.	২,০০,০০০'০০
৫। ইংরেজী ও আরবী ভাষার নির্বাচিত রচনার অনুবাদ সহ নবজন্ম-পরিচিতি : ২টি প্রকাশনা ..	ট.	১,৫০,০০০'০০
৬। কবির অবদান ও চিন্তাধারার মূল্যায়ন, গবেষণা, বাণী ও তুলনামূলক আলোচনার ত্রিখন্ড বই ..	ট.	৭,৫০,০০০'০০
৭। নবজন্ম-রচনার বিভিন্ন বিষয়সমূহ-ভিত্তিক দশটি সংকলন ..	ট.	৫,০০,০০০'০০

(খ) সংগ্রহ ও গবেষণা

১। কবির জীবন ও চিন্তাধারা সংক্রান্ত উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ ..		
২। কবির রচনাসমূহের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ..	ট.	৫,০০,০০০'০০
৩। কবির অসংকলিত রচনা সংগ্রহ ..		

(গ) সুরমি প্রণয়ন

১। নবজন্ম-গীতির সুরমি সংগ্রহ ও প্রণয়ন ..		
২। নবজন্ম-গীতির আদি প্রানোফোন রেকর্ড সংগ্রহ ..	ট.	৭,৩০,০০০'০০
৩। নবজন্ম গীতির সুর-সত্যায়ন : নবজন্ম নিউজিক বোর্ড		

(ঘ) রেকর্ডিং ইন্ডিও

ট্রেন ও প্রানোফোন রেকর্ড প্রভৃতির যাক-সরঞ্জাম ..	ট.	৫,০০,০০০'০০
--	----	-------------

(ঙ) লাইব্রেরী ও পাঠাগার

নবজন্মের/নবজন্ম-বিষয়ক এবং অন্যান্য বই-পত্র ..	ট.	১,০০,০০০'০০
--	----	-------------

(চ) নবজন্ম ভবন

বিলম্বাভোগ, বজ্রাঘাত, নাটক, প্রেক্ষাগৃহ, ইন্ডিও, লাইব্রেরী, পাঠাগার সংরক্ষণাগার, অফিস কক্ষ, বিদ্যালয়, সুস্থাবলীর প্রভৃতি বিভাগ সহ 'নবজন্ম-ভবন' নির্মাণ ..	ট.	১,৫০,০০,০০০'০০
--	----	----------------

(ହ) ମାଜ-ସରଞ୍ଚାସ

ବେଲିନପତ୍ର, ବାନ୍ଧାବସ, ମାଜ-ଗଞ୍ଜା, ଆମବାସ, କିଟିଂ ଓ କିଙ୍ଗ୍-ଟାୟ ଟ, ୨୫,୦୦,୦୦୦'୦୦

(ଞ) ସୁତ୍ରମାଳର

ସୁତ୍ରମାଳର (ସ୍ତ୍ରବ ଡେରୀ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବାବଦା ମହ) .. ଟ, ୫୦,୦୦,୦୦୦'୦୦

(କ) ସ୍ତୁତି-ମାଳା ଓ ସଂରକ୍ଷଣମାଳ

ହସ୍ତଲିପି, ମାତୃଲିପି, ଆଲୋକିତ୍ତ୍ୱ, ଟିପ, ଗ୍ରାମୋଫୋନ
ରେକର୍ଡ ଓ ସ୍ତୁତି-ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଦି ସଂରକ୍ଷଣ .. ଟ, ୨,୦୦,୦୦୦'୦୦

(ଈ) ଶ୍ରେଷ୍ଠିକଣ ଓ ପରିବେଶନ

ମଣ୍ଡିତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ପରିବେଶନ ଏବଂ ମାଂସ୍ତୁତିକ
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନୟନ .. ଟ, ୫,୦୦,୦୦୦'୦୦

(ଊ) ସାନ-ବାହନ

ବାଇକୋବାସ, ମିକ୍ରୋବ୍ୟାପ ଡ୍ୟାମ ଓ ଅଫିସ କାର .. ଟ, ୫,୦୦,୦୦୦'୦୦

(ଋ) ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ଓ ଅସିଦ୍ଧିତ .. ଟ, ୩,୫୦,୦୦୦'୦୦

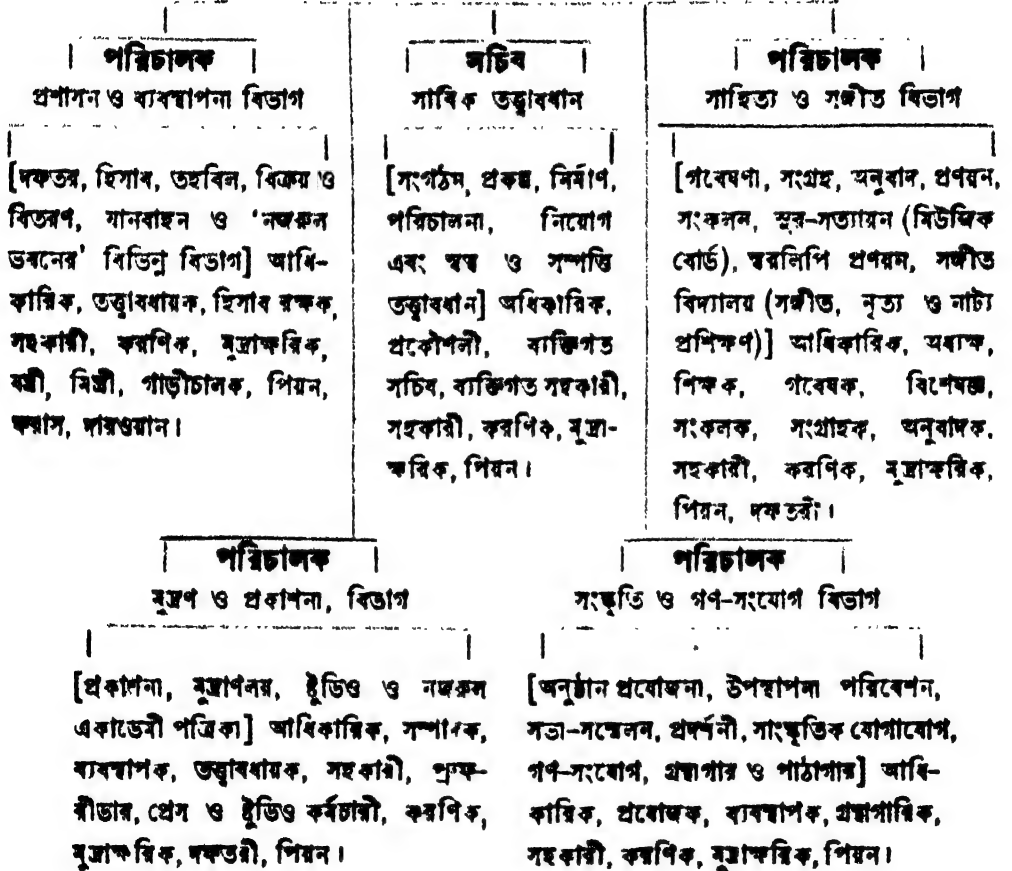
ମର୍ବୋଟ : ଟ, ୩,୦୦,୦୦,୦୦୦'୦୦

ଡିନ କୋଟି ଟାଣା ବାଜି]

বহুক্রম একাডেমী

প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ-রেখা

সহাপরিচালক



সম্ভাব্য : উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। অবশ্য প্রকল্পসমূহের কাজের জন্য যত ধরনের বিশেষজ্ঞের কাজ পাট-টাইম ভিত্তিতে এবং সম্মানী ও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করাতে পারা যাবে।

সাধারণ ও নিৰ্বাচিত কৰ্মসূচী বৰ্ষা সৰ্বীত বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, নথীভুক্ত একাডেমী পত্ৰিকা এবং সীমিত ভাৱে সংগ্ৰহ, গবেষণা, সংকলন, অৱলিপি প্ৰকাশন, পুস্তক প্ৰকাশনা, প্ৰকাশ্য ইত্যাদি পৰিচালনাৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় কৰ্মচাৰী, অফিস, বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য আনুষংগিক ব্যাপাৰে পঁচনালৈ পৰিকল্পনাৰ প্ৰতি বছৰ গড়ে ১০,০০০,০০'০০ (দশ লক্ষ) টকা ব্যয় কৰা হৈছে।

অতঃপৰেই একাডেমীৰ বিভিন্ন কৰ্মসূচীৰ পৰিচালনা-ব্যয় প্ৰায়ন্তকালীন অথবা বেঁকে উলুৱনৰ ভাৱে ভাৱে বাঢ়িব পাৰে। বাৰ্ষিক গড় হিচাবে ধৰা দশ লাখ টকা ব্যয়ৰ উপৰে বিভিন্ন খাতে প্ৰয়োজনীয় অধিক ব্যয়ৰ অন্য বাস্তৱি তহবিল উলুৱনৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ অন্য প্ৰদৰ্শিত ব্যয় বেঁকে পাপুৰা যাবে।

বৰ্ষিক প্ৰকাশ্য

বৰ্তমান নিৰ্বাহী পৰিষদ

- সভাপতি : কাজী আনোৱাফুল হক
 সহ-সভাপতি : আবুল কালাম শানুজ্জীন
 আবদুল কাদিৰ
 মোহাম্মদ আজমত
 সাধাৰণ সম্পাদক : তানিম হোসেন
 কোষাধ্যক্ষ : মুণ্ডাকুৰ ৰহমান শিকদাৰ
 সদস্য : লুৎফৰ ৰহমান সরকার, মোস্তফা কাবাল (বাৰ-এট-ল), উট্টৰ মোহাম্মদ বনিজ্জাৰান, মোহাম্মদ বাহকুজ্জোৱা, উট্টৰ ৰকিবুল ইসলাম, মুহাম্মদ আশকউজ্জোলা, লায়লা আৰজুমান বানু, আহাম্মদা আৱজু, বাফকুহা জৌহুৰী, বালেদা হাবীৰ, সিদ্দিকুজ্জাহান, বোলকাৰ শাহাদত হোসেন, এৱতাজ আলম, সৈয়দ জাকৰ আলী, বাইজুজ্জীন আহমদ।

বিভিন্ন সময়ে থকা নিৰ্বাহী পৰিষদৰ দায়িত্ব পালন কৰেছেন

এ. কে. এম. নূৰুল ইসলাম

আবদুল মওদুদ, মোহাম্মদ বৰকতুৱা, আকবৰ উজ্জীন, কাজী মোতাহাৰ হোসেন, সিকান্দাৰ আবু জাকৰ, বেনজীৰ আহমদ, মোহাম্মদ মোদায়েৰ, মুজীবুৰ ৰহমান বা, মোহাম্মদ নাসিৰ আলী, শাহজাদ হুদা জৌহুৰী, এ. এস. নূৰ মোহাম্মদ, কাজী নজবুল হক, এ. আৰ. জুইয়া, এম. এ. বাৰী, শাহিৰ আহমদ জৌহুৰী, বি. কে. পত্নী, আলী হোসেন, আশাফুজ্জাৰান, কুল মোহাম্মদ, মোহাম্মদ নূৰুল ইসলাম ও অন্যান্য।

মজরুল একাডেমীর প্রকাশনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রণীত

সম্ভ প্রকাশিত

মজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা

[মূল্য : ২৫'০০ টাকা]

মাহাবুবুল আহমদ প্রণীত

শব্দ-ধামুকী মজরুল ইসলাম

[মূল্য : ১৫'০০ টাকা]

মোহাম্মদ মাহবুবুল্লাহ প্রণীত

মজরুল-কাব্যের শিল্পরূপ

[মূল্য : ১৫'০০ টাকা]

এই ৩টি গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থ মজরুল-কাব্যের নব মূল্যায়নেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এদের ভূমিকা আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের নব দিক-প্রদর্শকেরও।

মজরুল-গীতি

'মজরুল-গীতি'র প্রথম পাঁচটি বইয়ের প্রত্যেকটিতে কবির বিভিন্ন ধরনের বহু অপ্রকাশিত গান ছাপা হয়েছে। প্রতি বইতে একশ কুরে গান আছে। প্রতি বইয়ের দাম : ৫,০০ টাকা। একত্রে পাঁচ বই : ২০'০০ টাকা

মজরুল একাডেমী পত্রিকা

মজরুলের সাহিত্য, সঙ্গীত, জীবনী ও চিন্তাবাদ বিষয়ক একমাত্র পত্রিকা। বছরে ছয় বৈভূতে ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মূল্য : প্রতি সংখ্যা ১০'০০ টাকা। দুই ভলিউমে যেখানে বাঁধাই ১ম ও ২য় বর্ষের বহু-সংখ্যক পত্রিকা বিক্রি করা যাবে সেভাবে রয়েছে। প্রতি ভলিউমের দাম : ৫০'০০ টাকা।

ফোন : ২৫ ৩৫ ৫৫
৪০ ১৬ ১৬

কর্মাব্যয় : মজরুল একাডেমী
বেলালাল কামোদী, মর্শবাখার, ঢাকা।

সমস্যা দূর
করতে হলে
আপনার চাই
একজন
নির্ভর যোগ্য
বন্ধু



উত্তরা ব্যাংকে সঞ্চয় করুন ।
সম্মিলিত প্রয়াসই আমাদের
উন্নতির মূল উৎস ।

উত্তরা ব্যাংক

[আবহমান বাঙলার ঐতিহ্যে লালিত]

নব্ব্বকল একাডেমী পত্রিকা/নব্ব্বকল স্মারক সংখ্যা

তীব্র প্রতিযোগিতা-মূলক ও উৎকৃষ্ট বিশ্ববাজারে
আমাদের উৎকৃষ্ট পাটজাত অব্যয়
চাহিদা সর্বত্র

বিদেশী গবেষণাগারে কৃত্রিম তন্তুর চেয়ে
পাটের উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত

অধিক পাটচাষ ও পাটজাত অব্যয় উৎপাদন
জাতীয় সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য

বাংলাদেশ জুট মিল্স কর্পোরেশন

বিজেএমসি ১৫৪৮

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং কাইনাল কর্পোরেশন
কর্তৃক

বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণের জন্য
বিশেষ সুবিধা প্রদান

-
- * হ্রদের হার : সরল বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা।
 - * ঋণ পরিশোধ মেয়াদ : ২৫ বৎসর।
 - * ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ : নির্মাণ ব্যয়ের শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ।
 - * প্রতি স্বয়ং সম্পূর্ণ তলা অথবা ক্যাটের ক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ : ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

বিস্তারিত বিবরণের জন্যে সমস্ত কার্পোরেশনের নিকটস্থ
অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন।

বন্দর থেকে বন্দরে
পণ্যের সস্তার চলে
বাংলার জাহাজে

সীমাহীন দিগন্ত পেরিয়ে বন্দর
থেকে বন্দরে পণ্যের সস্তার চলেছে
বি. এস. সি-র জাহাজে, বাণিজ্যে /
অনির্ভর বাংলা গড়ার যন্ত্র নিয়ে।
মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও
সঞ্চয় করে বি. এস. সি. নিশ্চিত করছে
আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি। তাই বি.এস.সি
হচ্ছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির
সোমালী চাবিকাঠি।



বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
Bangladesh Shipping Corporation

‘অগ্নিবীণা’র কবির প্রতি
আমাদের আন্তরিক প্রদাহন

মননশীল তায় জাতি
আরও ধন্য হোক

বিরাগতার বগর নাম
জীবন বীমা করপোরেশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিস্ময়ী কবির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষে আমাদের প্রদাহন



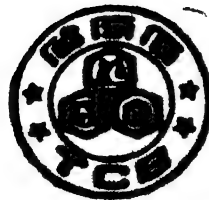
আদমজী ফুট মিলস লিমিটেড
আদমজী নগর, ঢাকা।

বল বীর —

বল উন্নত মম শির!

যে শির সকল শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল হিমালয় স্তায় অটল, সত্যের
জয়স্বৰ্ণ উড়াতে যে শির নত হয়নি কখনও মৃত্যুর হিমশীতল কোলে
তাকেও আশ্রয় নিতে হয়েছে।

চণক্যাস্ত সেই মহা বিজ্ঞানী কবি কাকী নবকল ইসলামের প্রথম
মৃত্যু-বার্ষিকীতে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।



ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

আপনার জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

পত্রিকা একাডেমী পত্রিকা/নবকল স্মারক সংখ্যা

উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নই
আমাদের কাম্য

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা

নিজ ভবন : মতিঝিল, ঢাকা।

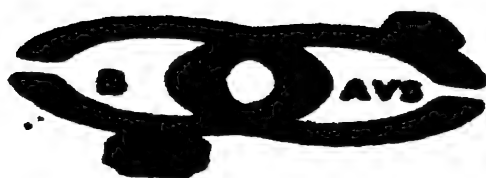
বস্ত্র প্রতিরোধ, নিকাশন ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে
অনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলাই
আমাদের সংকল্প

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পানি-১৯/ডিএ/১৭-৭৮

দলকল একাডেমী পত্রিকা/দলকল স্মারক সংখ্যা

জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি রোধ করতে
বেঙ্গল বহ্যাকরণে এগিয়ে আসুন



বাংলাদেশ এসোসিয়েশন

কর

উদ্বাচরী স্টেরিলাইজেশন

হাউস নং ১৩০, সড়ক নং ১৩/২

ধানসিঙি আবাসিক এলাকা

ঢাকা

বাংলাদেশের জাতীয় কবি

কাজী নজরুল ইসলামের

বিশ্বজনীন মানবতাবাদী কৃষিকার গ্রন্থি

স্বাধীনতার সঙ্গীত সাবায়



হাবীব ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা । ঢাকা



TIBET SNOW

Beauty Cream of the East.

makes every face look more beautiful .

Regular daily use of Tibet Snow nourishes your skin, making it soft, smooth and sleek. It is ideally suited to your requirement for a tasteful make-up.

KOHINOOR CHEMICAL CO. LTD.

সপ্তম বাড়ান



ছোট ছোট জিনিস থেকেই
সৃষ্টি হয় বৃহত্তর জিনিষের
কাজেই আপনার
সংসারলা অর্থ বা যেখানে আছে
একটিত করুন
সপ্তম বাড়ান

আর সপ্তমের সর্বোচ্চ
মাধ্যম হচ্ছে



জনতা প্রাশক

জানক ও নিরানক—অর্থ ও ব্যবহীনতা
এপিঠ ওপিঠ



—সকর করন—

সকর ব্যক্তির জীবনে আনে বহুসতা
জাতির জীবনে আনে সমৃদ্ধি
আপনার সকরের অন্ত
আপনার কাংক

রূপালী কাংক

স্বাস্থ্য কল্যাণকর একটি প্রাথমিক শিক্ষার সেবার নিয়োগিতা

সঞ্চয় করুন



সঞ্চয়ই আপনার
বিপদের বন্ধ

সঞ্চয়ের মাধ্যমেই আসে
স্বথ ও সমৃদ্ধি

অগ্রণী ব্যাংক

দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত

ডালিম হোসেন কর্তৃক নবমকম্ব একডেবী, বেলালাবাদ কলোদী, নগরবারে, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত
এবং সেরাজুল হক কর্তৃক গ্রাহকো গ্রেন, ৬/৭ আওলাত হোসেন লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত

